মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণ: উনিশ ও বিশ শতকের নির্বাচিত শিশু-কিশোর সাহিত্য অবলম্বনে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পি.এইচ.ডি. উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা – অভিসন্দর্ভ

গবেষক

শ্রীময়ী ব্যানার্জী

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শম্পা চৌধুরী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. বাসবী রায়

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

ভারত

২০২১

Certified that the Thesis entitled

"মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণ: উনিশ ও বিশ শতকের নির্বাচিত শিশু কিশোর সাহিত্য অবলম্বনে"

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Sampa Chaudhuri, Professor, Department of Bengali and Dr. Basabi Roy, Retired Professor, Department of Bengali, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor : Basabi Roy 16.01.2021

Sampa Chaudhuri 16.01.2021

Dated :

Candidate : Sreemoyee Banerjee.

Dated : 16.01.2021.

স্বীকৃতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পিএইচ.ডি স্তরের গবেষণা অভিসন্দর্ভ হিসেবে লেখা হয়েছে 'মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণ: উনিশ ও বিশ শতকের নির্বাচিত শিশু-কিশোর সাহিত্যে অবলম্বনে' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি। এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার কাজটি শুরু করি ২০১৩ সালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে জুনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে। শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রতি অদম্য আকর্ষণই গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি নির্বাচন করতে আমায় প্রণোদিত করেছিল।

বাংলা বিভাগে গবেষণার ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শম্পা চৌধুরী ও অধ্যাপক ড. বাসবী রায়। গবেষণার প্রতিটি স্তরে আমার সংশয় নিরসন করে, আমার যাবতীয় ভুলভ্রান্তি সবসময় আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করে, আমার অনুসন্ধানের গতিপ্রকৃতি যথাযথভাবে পরিচালনা করে চলেছেন তাঁরা প্রথম দিন থেকেই। তাঁদের অবাধ প্রশ্রয়ে গবেষণার কাজে সবসময় আত্মপ্রত্যয়ী থাকতে পেরেছি। তাঁদের কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ার সময় থেকেই শিশু-কিশোর সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম। সর্বপ্রথম যিনি আমার এই ছন্নছাড়া ভাবনার রূপদান করেন, তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল কাফি। তিনি এই আপাত-অনালোচিত বিষয়ের মধ্য থেকে অযুত সম্ভাবনাময় দিক তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়ে আমাকে গবেষণা করার সাহস যুগিয়েছিলেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

গবেষণা সংক্রান্ত বা গবেষণা অতিরিক্ত হাজারো আবদার যিনি সবসময় মেনে নিয়েছেন, তিনি বাংলা বিভাগেরই আরেক অধ্যাপক ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা। গবেষণার সমস্ত বিষয়েই তিনি নিরন্তর পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে আমার ভাবনার পরিধি বিস্তৃত করে দিয়ে আমায় ঋদ্ধ করেছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

গবেষণার শুরুতে আমায় সাহায্য করেছিলেন তৎকালীন ডিন, কলা অনুষদ, মাননীয়া নীলাঞ্জনা গুপ্ত এবং অধ্যক্ষ, মাননীয়া নন্দিতা ভট্টাচার্য। ওঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার সকল অধ্যাপককে শ্রদ্ধা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কর্মস্থল উদয়নারায়ণপুর মাধবীলতা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে, যিনি আমার গবেষণা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমাকে জন্য অনেক সময়ই সুযোগ দিয়েছেন।

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় নারীবাদী তত্ত্ব বিষয়ে বহুবার আলোচনায় বসেছেন অধ্যাপক ড. বল্লরী রায়চৌধুরী। গবেষণার অনেক প্রয়োজনীয় বই, তথ্য সরবরাহ করে সকল সময় পাশে থেকেছেন অধ্যাপক ড. আফরোজা খাতুন। শিশু-কিশোর সাহিত্য বিষয়ে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই লোরেটো কলেজের গ্রন্থাগার থেকে ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়ে এবং এ বিষয়ে নানান অজানা সম্ভাবনা আমার সামনে তুলে ধরেছেন ওই কলেজেরই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অমৃতা দাশগুপ্ত। এঁদের সকলের কাছে আমি কাছে চিরঋণী।

শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমার অপরিসীম জিজ্ঞাসা নিরসন করেছেন মনস্তত্ত্ববিদ ড. শাওনি ব্যানার্জী। শিশুশিক্ষা ও শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বই দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন সহকর্মী মুদাস্সর নজর বৈদ্য। গবেষণার কর্মপদ্ধতি বিষয়ে আমায় শিক্ষিত করেছেন বন্ধুপ্রতিম সুরশ্রী কুণ্ডু ও সংহিতা সান্যাল। গবেষণার শেষ লগ্নে গবেষণা পদ্ধতির যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে আমায় সচেতন করেছেন অমৃতেশ বিশ্বাস। যেখানেই আমার গবেষণা বিষয়ক কোনো লেখা দেখেছেন, তখনই সেই বিষয়ে আমায় সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছেন বন্ধু কৌশিক কর্মকার। আমি কৃতজ্ঞ ওঁদের সকলের কাছে।

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে ইন্টারনেট মাধ্যমে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে। সহায়তা পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার,

কলকাতা, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির। ধন্যবাদ জানাই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মীদের। এই গ্রন্থাগারগুলির পাশাপাশি বিশেষভাবে আমায় দেখতে হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের লাইব্রেরির শিশু-কিশোর বিভাগ। কৃতজ্ঞতা জানাই কর্তৃপক্ষকে। আমার তত্ত্বাবধায়কেরা শিশু সাহিত্য সংসদ ও দেব সাহিত্য কুটীরের বহু পুরোনো বই দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আবার শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেকশন এবং পি.এইচ.ডি সেল-এর আধিকারিক ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ সজ্জা ও আংশিক অক্ষরবিন্যাসের কাজ করেছেন শুভেন্দু কৃষ্ণ তরফদার। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে।

যে সকল বন্ধুর নিরলস উৎসাহ আমায় কাজে ব্যাপৃত রেখেছে, তাঁরা হলেন অঙ্কনা বেতাল, অপরূপা ঘোষ, অন্বেষা দত্ত, দেবকী মুখার্জী, স্নেহাশ্রী সাহা, কণাদ সিন্‌হা, শ্যামল পাণ্ডা, উত্তীয় বসু এবং অর্ণব ঘোষ। এঁদের সাহচর্য ছাড়া আমার গবেষণা সম্পূর্ণ হ’ত না।

গবেষণার ত্রুটি এবং মুদ্রণ-বানান প্রমাদ থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

সন্তোষপুর, কলকাতা — শ্রীময়ী ব্যানার্জী

সূচিপত্র

- **প্রস্তাবনা** .... ১ - ৭
- **প্রথম অধ্যায় :**
  শিশু-কিশোর সাহিত্য ও 'মেয়েবেলা'—তর্ক-বিতর্ক .... ৮ - ৩৪
- **দ্বিতীয় অধ্যায় :**
  উনিশ ও বিশ শতকে নৈতিকতার মানদণ্ডে
  বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েরা .... ৩৫ - ৮০
- **তৃতীয় অধ্যায় :**
  ছোটদের ছড়া ও মেয়েদের আখ্যান ৮১-১৩১
- **চতুর্থ অধ্যায় :**
  রূপকথায় মেয়েদের কথা ১৩২-১৮২
- **পঞ্চম অধ্যায় :**
  অভিযান কাহিনি ও অন্যান্য ধারার গল্পে মেয়েরা ১৮৩-২৩৪
- **গ্রন্থপঞ্জি** ২৩৫-২৪১

প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় শিশু-উপযোগী সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয় উনিশ শতকে। ‘সখা’ (১৮৮৩) পত্রিকা প্রকাশের আগে মূলত উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিশনারীরা অথবা কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক কিছু সংস্থা বই এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ছোটদের মধ্যে উপনিবেশের নৈতিকতা ও ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিল। অনেক সময় শিশুসাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা এগুলিকেও ‘শিশুসাহিত্যে’র অন্তর্ভুক্ত করে পড়ার কথা বলেন। যদিও ‘শিশু’র যে বহুমাত্রিক পরিচয় উপনিবেশের প্রতিগ্রহণে তৈরি হয়েছিল, তার প্রতিফলন এগুলির মধ্যে বিশেষ নেই। বরং, বাধ্যতামূলক পাঠক্রমের পাঠ্য ওই বইগুলিকে ‘ফর্মাল এডুকেশনে’র বই বলে চিহ্নিত করাই শ্রেয়। ‘স্কুল বুক সোসাইটি’ (১৮১৭), ‘ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি’ (১৮৫১) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের আগে শিশুকে অভীষ্ট করে লেখা বই প্রায় নেই। এমনকি পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যেও ‘দিগ্‌দর্শন’, ‘অবোধবন্ধু’, ‘পশ্বাবলী’ — এগুলির কোনোটিই শিশুপাঠ্য পত্রিকা ছিল না। ১৮৬০ সালে খ্রিস্টিয় ইভান্‌জেলিস্টদের আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত হয় ‘সত্যপ্রদীপ’ পত্রিকা, তার ছবি ও ভাবনায় ‘শিশু’র রোমান্টিক প্রতিগ্রহণের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। এটিও ধর্মীয় উদ্দেশ্যমূলকতার কারণে শিশুপত্রিকা হিসেবে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে, শিশুসাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে কখনো বয়স-নির্ধারিত পরিচয়ে, আবার কখনো রোমান্টিক প্রতিগ্রহণে ‘শিশু’ নামক ধারণাটিকে ঘিরে শিশুসাহিত্যের পরীক্ষামূলক আয়োজন শুরু হয়েছিল।

বিশ শতকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রকম ভাবে শিশুসাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলনের সূত্রপাত। এই সময়ের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক চলনের সঙ্গে সঙ্গে রূপ পরিবর্তন হতে থাকে শিশুসাহিত্যের। এর পাশাপাশি কিশোরপাঠ্য রচনাও ধীরে ধীরে লেখা হতে থাকে। কিন্তু

আমাদের গবেষণা শিশু কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস বা বিবর্তন বিষয়ক নয়। আমরা বস্তুত সন্ধান করতে চেয়েছি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের কথা।

শিশুসাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু যে 'শিশু', তাকে যথাযথভাবে বুঝতে গেলে 'শিশুত্বে'র ধারণা দিয়েই বুঝতে হয়। রোমান্টিক চিন্তনে 'শিশু' লিঙ্গরূপ নিরপেক্ষ একটি ধারণা। কিন্তু দেখা যায়, বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যে সামাজিক লিঙ্গভেদ অত্যন্ত প্রকট। সিমোন দ্য বোভোয়া তাঁর 'সেকেন্ড সেক্স' (১৯৪৯) গ্রন্থে বলেছিলেন 'মেয়ে হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ মেয়ে হয়ে ওঠে'। অর্থাৎ, জৈবিক ভাবে স্ত্রী-অঙ্গ নিয়ে জন্মালেও সমাজ তার নির্দিষ্ট কিছু প্রকরণের দ্বারা তাকে 'মেয়ে' করে গড়ে তোলে। এই নির্মিতিকেই বলা হয় 'সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণ'। সাহিত্যের সমস্ত সংরূপের মতো বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যেও ছেলেদের আধিক্য। এই গবেষণায় প্রাথমিকভাবে আমরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছি এর কারণ, একইসঙ্গে দেখিয়েছি ছোটদের বইয়ে মেয়েদের কথা কীভাবে বলা হয়, সেই বৃত্তান্ত।

শিশু-কিশোর সাহিত্য বিষয়টি পাশ্চাত্যে বহুদিন ধরে গবেষণার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হলেও এদেশে তার কদর খুব একটা বেশি নয়। এমনকি, উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমেও বহুদিন পর্যন্ত শিশু-কিশোরসাহিত্য বা তার ইতিহাস ছিল উপেক্ষিত। অথচ, শিশু-কিশোর সাহিত্যের বহু অনালোচিত এলাকা রয়েছে, যা বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে এই সংরূপটির সংজ্ঞা। ভিডিও গেম, দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে শিশু-কিশোর উপযোগী রচনার সম্প্রচার ইত্যাদির প্রভাবে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এর ধরন। তাই আশু প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে শিশু-কিশোর সাহিত্যকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করার, নতুন সম্ভাবনাকে তুলে ধরার।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের পরিধিটি অতি বিস্তৃত হওয়ায় গবেষণার সুবিধার জন্য তিনটি নির্বাচিত সংরূপের মধ্যে আলোচনা সীমায়িত করা হয়েছে। সেই সংরূপগুলির মধ্যে

থেকে প্রাসঙ্গিক ‘টেক্সট’ নির্বাচন করে সেগুলিতে মেয়েদের শৈশব-কৈশোর নির্মাণের প্রক্রিয়াটি লক্ষ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গেই কখনো কখনো ব্যবহার করা হয়েছে ‘মেয়েবেলা’ শব্দটি- মেয়েদের বিচিত্র যাপনচিত্র বর্ণন প্রসঙ্গে।

গবেষণা নিবন্ধে শিশু-কিশোর সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত ক) ছড়া খ) রূপকথা এবং গ) অভিযান কাহিনি ও অন্যধারার গল্প- এই তিনটি সংরূপকে ‘প্রাইমারি সোর্স’ বা প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ, সংশ্লিষ্ট সংরূপগুলি- বিশেষত প্রথম দুটি- উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকেই ‘শিশু-কিশোর’ পাঠ্য সাহিত্য হিসেবে সচেতনভাবে সংকলিত, অনূদিত ও মুদ্রিত হতে শুরু করে। বিশ শতকেও সংরূপগুলি রচনার ও মুদ্রণের সংস্কৃতি অব্যাহত থাকে। তাছাড়াও, ‘শিশু-কিশোর’দের জন্য লেখা গল্প-উপন্যাস-নাটকের তুলনায় ওই সংরূপগুলি পরিমাণগত দিক থেকে অনেক বেশি। অন্যদিকে, বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে অভিযান কাহিনি ও অন্যধারার গল্প (গোয়েন্দা গল্প, খেলাকেন্দ্রিক গল্প, ‘অ্যাডভেঞ্চারে’র গল্প)-তে মেয়েদের উপস্থিতি ছেলেদের তুলনায় কম। কিন্তু, ওই কম পরিসরেই আমরা মেয়েদেরকে প্রচলিত প্রকরণের বাইরে একটি ক্রিয়াশীল ভূমিকায় দেখতে পাই। সুতরাং, আমাদের ধারণা, বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েবেলার ক্রমিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নির্মাণ, বিবর্তন ও বিন্যাসের রূপ দর্শাতে এই তিনটি সংরূপই কার্যকরী।

বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য চর্চা ও সমালোচনার দু’টি মূল ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথমটি শিশু-কিশোর সাহিত্যের পঞ্জিকরণ ও ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা- যার বিকাশ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, আশা গঙ্গোপাধ্যায়ের বইগুলিতে ধরা রয়েছে। দ্বিতীয়টি শিশু সাহিত্যের নির্মাণকলা কেন্দ্রিক- যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নবেন্দু সেনের বইতে। এর বাইরে তৃতীয় একটি ভিন্নধারার সূত্রপাত করেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উপনিবেশবাদ ও শিশু-কিশোর সাহিত্যের সম্পর্ক, ওই সাহিত্যে মেয়েদের অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে

সংশ্লিষ্ট সাহিত্যপাঠ বা বিশ্লেষণের একটি নতুন অভিমুখ খুলে দিয়েছেন। আমাদের গবেষণা বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য সমালোচনার এই তৃতীয় ধারাটির অন্তর্গত।

এই গবেষণা নিবন্ধে মূলত অনুসন্ধান করা হয়েছে — ক) উনিশ ও বিশ শতকের শিশু-কিশোর সাহিত্যের উল্লিখিত সংরূপগুলিতে মেয়েদের শৈশব ও কৈশোরের রূপটি কেমন ছিল খ) এই স্বরূপটিকে বিশেষ কোনো প্রবণতা বা বৈলক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব কিনা গ) এই অনুসন্ধানের সূত্রেই ওই ধারার 'টেক্সট'গুলির বিকল্প পাঠ প্রচেষ্টা। নির্বাচিত বইগুলির নিবিড়পাঠ, পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহের পর গবেষণার প্রয়োজন অনুসারে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে পাঠভিত্তিক সমালোচনা এবং তুলনামূলক পদ্ধতি। তাছাড়াও, বক্তব্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে আধিপত্যের তত্ত্ব, শ্রেণিবৈষম্যের তত্ত্ব, নারীবাদী তত্ত্ব প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমেই উনিশ ও বিশ শতকের নির্বাচিত শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের আত্মসত্তা নির্মাণের যাত্রা লক্ষ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়ের নাম ও বিষয়সংক্ষেপ নীচে আলোচনা করা হল—

প্রথম অধ্যায়: শিশু-কিশোর সাহিত্য ও 'মেয়েবেলা' — তর্ক-বিতর্ক

এই অধ্যায়ে মূলত দেখানো হয়েছে —

১। শিশু-কিশোর সাহিত্য বলতে কী বোঝায়?

২। উনিশ ও বিশ শতকে বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি

৩। 'শৈশব-কৈশোর'-এর সাংস্কৃতিক-সামাজিক, দার্শনিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞা

৪। 'মেয়েবেলা' : মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গ নির্মাণ প্রসঙ্গ ও শিশুকিশোর সাহিত্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: উনিশ ও বিশ শতকে নৈতিকতার মানদণ্ডে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের মেয়েরা

এই অধ্যায়ের আলোচনা মূলত বিবর্তিত হয়েছে উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসের অগ্রগতির সূত্রে। ভাবগত দিক থেকে এখানে দু'টি পৃথক পর্ব রয়েছে।

১) উনিশ শতকে শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য প্রাথমিকভাবে শিশু সাহিত্যের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বা শিশুশিক্ষামূলক গ্রন্থ বা 'প্রাইমার'-এ এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম পর্বে পাঠিকা বা লেখিকা — কোনোভাবেই মেয়েদের কোনো অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়না। এমনকি, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা বা স্ত্রী শিক্ষার অভাবে মেয়েদের 'শৈশব' বা 'কৈশোর' কালের যাপনচিত্র অনুচ্চারিত থেকে যায় বা তা শৃঙ্খলিত হতে থাকে বিচিত্র নিয়মের নিগড়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পর্বে এভাবেই উনিশ শতকীয় শাসনের ঘেরাটোপে ছোটদের জন্য লেখালেখির মধ্যে মেয়েরা কীভাবে জায়গা করে নিতে পেরেছিল, তার একটি রূপরেখা প্রদান করতে চেয়েছি। (এই পর্বের আলোচনার জন্য আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'উনিশ শতকের স্ত্রীশিক্ষা', 'নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব', 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ', 'সুশীলার উপাখ্যান' ইত্যাদি।)

২) দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে বিশ শতকের চালচিত্র। পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় বিশ শতক রাজনৈতিক ভাবে অনেকটাই বেশি সক্রিয়। এর প্রভাব পড়েছিল শিশু কিশোর সাহিত্যেও। তাই বদল ঘটেছিল দর্শনের, বোধের, দৃষ্টিভঙ্গির। সমাজে মেয়েদের অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠা, বিয়ের ন্যূনতম বয়স নিরূপণ করে আইন পাশ, আর্থিক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বা বৃহৎ সামাজিক পরিসরে নিজেকে যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা থেকে কর্মমুখী হওয়া ইত্যাদি কারণে মেয়েদের সামগ্রিক পরিসরের পরিবর্তন ঘটে। মেয়েরা স্বাধীনচেতা হয়ে উঠতে শুরু করে, অজানা জগৎ কে জানার ইচ্ছেয় অভিযানে বেরোয়, ছেলেদের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবি জানায়। তাই এই পর্বে বিচিত্র লেখালেখি অবলম্বন করে আমরা সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করতে চেয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়: ছোটদের ছড়া ও মেয়েদের আখ্যান

এই অধ্যায়ে বাংলা লৌকিক ও মৌলিক ছড়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ধরণগুলি খুঁজে নেওয়া হয়েছে। এই বিশ্লেষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংগৃহীত 'ছেলেভুলানো ছড়া', 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ'-এর ছড়া, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অন্নদাশঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখের প্রাসঙ্গিক ছড়াসমূহ নির্বাচন করে বক্তব্য প্রস্তুত করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: 'রূপকথা'য় মেয়েদের কথা

রূপকথা সংরূপটির আলোচনা শুরু হয়েছে 'ঠাকুমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র কাহিনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে। রূপকথা কীভাবে মেয়েদের গল্প হয়ে ওঠে —তা-ই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে সংগৃহীত ও পরবর্তীকালে রচিত রূপকথার মাধ্যমে। তুলনামূলক অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য মৌলিক রূপকথা বা রূপকথাধর্মী লেখা হিসেবে আমাদের নির্বাচন হেমন্তবালা দেবী, গৌরী ধর্মপাল ও নবনীতা দেবসেন-এর লেখাসমূহ।

পঞ্চম অধ্যায়: অভিযান কাহিনি ও অন্যান্য ধারার গল্পে মেয়েরা

বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের অভিযান দুর্লভ হলেও একেবারে নেই, তা নয়। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র স্বপ্নের অভিযান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে; মেয়েরা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করেছে রহস্যভেদ প্রকল্প। 'কঙ্কাবতী', 'আলিভুলির দেশে', 'কৃষ্ণা-সিরিজ', 'গোয়েন্দা গণ্ডালু', 'মাকু', 'ববির বন্ধু' ইত্যাদি কাহিনির সূত্রে 'লক্ষ্মীমেয়ে'দের সামাজিক-পারিবারিক বিধিনিষেধ ভুলে বহির্মুখী হওয়ার গল্পগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে মতি নন্দীর খেলোয়াড় কলাবতীর কাহিনিও। এভাবেই সামগ্রিকভাবে অন্য ধারার 'মেয়েবেলা'র চরিত্র নিরূপিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

গবেষণা নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জি অংশটি — আকরগ্রন্থ ও সহায়কগ্রন্থ — এই দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পত্রপত্রিকা এবং বৈদ্যুতিন উৎসের পৃথক তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে মেয়েদের পরিচিতির যে বৈচিত্র্য শিশু-কিশোর সাহিত্যে ধরা থাকে, তারই বিচিত্র রকমফের উক্ত নির্বাচিত শিশু কিশোর সাহিত্যের মাধ্যমে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের আত্মসত্তা নির্মাণের সামগ্রিক পরিবর্তনও লক্ষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মেয়েদের জীবনের ইতিহাসের পাশাপাশি বাঙালির সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসও এখানে ধরা পড়েছে। তবে সেটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। এই আলোচনায় সেই ইঙ্গিতটুকু ধরা থাকল।

প্রথম অধ্যায়

শিশু-কিশোর সাহিত্য ও 'মেয়েবেলা' — তর্ক-বিতর্ক

শিশু-কিশোর সাহিত্য বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। এই গবেষণায় যদিও আমরা মূলত দেখিয়েছি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের অবস্থান, তবে সেই নির্দিষ্ট আলোচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে আমরা শিশু-সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করে নেব। ওই আলোচ্য বিষয়গুলিকে সূত্রের আকারে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে —

১। শিশু-কিশোর সাহিত্য : আলোচনা-পর্যালোচনা

২। পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে শিশু-কিশোর সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি

৩। 'শৈশব-কৈশোর'-এর জৈবিক, শারীরবৃত্তীয় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারণা

৪। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে 'মেয়েবেলা' উপস্থাপন বা পরিবেশনের প্রবণতা পাঠের প্রচেষ্টা

১। শিশু-কিশোর সাহিত্য: আলোচনা-পর্যালোচনা

শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী রচনাকে শিশু-কিশোর সাহিত্য হিসেবে খুব সহজে বোঝানো হয়ে থাকে। পরিভাষাগত আঙ্গিক থেকে শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞা কি, তা আলোচনার শুরুতেই দেখে নেওয়া যেতে পারে।

শিশুদের জন্য রচিত, কখনো কখনো শিশুদের দ্বারা লিখিত সাহিত্য হল শিশুসাহিত্য। বলা বাহুল্য, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কেরা শিশুদের কথা ভেবে এই সাহিত্য রচনায় উৎসাহী হ'ন, সেহেতু শিশুসাহিত্যে অধিকাংশ সময়েই শাসন-তর্জন, রীতি-নীতি, ন্যায়-অন্যায়ের পাঠ প্রদান করা হয়ে থাকে। শিশুর মনোরঞ্জনের বিষয়টি সেক্ষেত্রে সাধারণত কম গুরুত্ব পায়।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে 'যোগীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মরণী' গ্রন্থে লিখেছিলেন —

> "যাঁরা শিশুসাহিত্য রচনার ভার নেন, তাঁদের অনেকে প্রধানত দু-রকম ভুল করেন। প্রথমত, কেউ কেউ বিষয়গাম্ভীর্য সহকারে উপদেশকের মতো শিশু মহলে গিয়ে কথকতা করতে চান। দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ মনে করেন উচ্চতর রচনা পদ্ধতি বা

কলা কৌশল ছেড়ে আজেবাজে ছেলেমানুষী করলেই ছোটোরা তাঁদের লেখা পছন্দ করবে। ... তাঁরাও জানেন না, শিশুদের মধ্যে যথেষ্ট কাব্যরসগ্রাহিতা আছে এবং তারা উপদেশকে ভালোবাসে না।"[১]

লীলা মজুমদার শিশুসাহিত্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জানাচ্ছেন "ছোটরা পড়ে মজা পাওয়ার জন্য। মজা না পেলে হাজার ভালো বই হলেও পড়ে না। যা পড়ে তাই দিয়ে ওদের মন তৈরি হয়, ওদের কাজে লাগে।"[২] তিনি তাঁর 'শিশুসাহিত্য'তে জানাচ্ছেন- প্রথমত, শিশুসাহিত্যে 'প্রসাদগুণ' থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত, "যাঁরা নিজেদের ছোটবেলার কথা ভুলে গেছেন তাঁদের দিয়ে এ-কাজ হয় না। শুধু ঘটনাগুলি মনে রাখলেও চলবে না, ঘটনাকালে নিজের মনের মধ্যে কি হয়েছিল তাও মনে রাখা চাই"। তৃতীয়ত, একজন শিশুসাহিত্যিকের 'একটি কোমল সহানুভূতিশীল মন', 'তীক্ষ্ণ দৃষ্টি' এবং 'সজাগ কান' থাকা জরুরি। এক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়বোধ এবং পর্যবেক্ষণ শক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। চতুর্থত, শিশুসাহিত্যে ন'টি রসের মধ্যে ছোটদের উপভোগ্য "সাতটির তরঙ্গ ছোটে"। পঞ্চমত, শিশুসাহিত্যের ভাষা হবে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য। ষষ্ঠত, এই প্রবন্ধে তিনি উপেন্দ্রকিশোরের বক্তব্যের অনুসরণে বলেছেন যে, "ছোটদের বই হবে সব চেয়ে ভালো কাগজে ছাপা, সব চেয়ে সুন্দর ছবি দিয়ে সাজানো, সব চেয়ে ভালো লেখা দিয়ে পুষ্ট"। সপ্তমত, শিশুসাহিত্যের বিষয় হবে 'সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সরস'। তাছাড়াও তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে "শিশুসাহিত্যে ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়েও সংযত হলে ভালো হয়। সেটি হল অতিশয় হিংসা, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা। ... ছোটদের যতই না উদার শিক্ষা দেওয়া যাক, তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ বিভ্রান্ত করা উচিত নয়"। আসলে তিনি মনে করছেন যে "শিশুসাহিত্যের আরেক কাজ ছোট ছেলেমেয়েদের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া"।[৩]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে জানানো হয়েছে —

"Children's literature, the body of written works and accompanying illustrations produced in order to entertain or instruct young people. The genre encompasses a wide range of works, including acknowledged classics of world literature picture books and easy-to-

read stories written exclusively for children, and fairy tales, lullabies, fables, folk songs, and other primarily orally transmitted materials."[৪]

প্রখ্যাত তাত্ত্বিক Kimberley Reynolds শিশুসাহিত্য সম্পর্কে বলছেন,

> "..materials written to be read by children and young people, published by children's publishers and stocked and shelved in the children's sections of libraries and bookshops."[৫]

অর্থাৎ শিশু উপযোগী সাহিত্যকেই শিশু সাহিত্য বলা হয়ে থাকে। শিশু সাহিত্যের সংজ্ঞা-সংক্রান্ত বিবিধ মতবাদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য একত্র করলে শিশু সাহিত্যের এক পরিব্যাপ্ত ধারণা লাভ করা হয়তো সম্ভব।

শিশুসাহিত্যের সমালোচকদের একটি সাধারণ প্রবণতা হল, যে কোনো 'ভালো' বইকেই শিশু সাহিত্যের অন্তর্গত করে ফেলা। এই 'ভালো' অবশ্যই শিশুর মানসিক অবস্থা নির্মিতির সহায়ক এবং তার নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী। এই বিবেচনার সূত্রেই 'শিশুসাহিত্য' এই পরিভাষাতে 'শিশু' ও 'সাহিত্য' আপাত স্বতন্ত্র এই উপাদান দুটি একে অপরের পরিপূরক অবস্থান তৈরি করে। Karin Lesnik-Oberstein বলছেন,

> "..the 'children' of 'children's literature' are constitueted as specialised ideas of 'children', not necessarily related in any other way to other 'children' (for instance those within education, psychology, sociology, history, art or literature), and the 'literature' of 'children's literature' is a special idea of 'literature', not necessarily related to any other 'literature' (most particularly 'adult literature')." [৬]

শিশুসাহিত্যের কয়েকটি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করেছেন দেশ-বিদেশের শিশু সাহিত্যের তাত্ত্বিকেরা। Karin Lesnik-Oberstein এই বিষয়ে E. B Whites এর মত উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন, "Children are demanding...They accept, almost without question, anything you present them with, as long as it is presented honestly, fearlessly and clearly."[৭] অর্থাৎ শিশু সাহিত্য যথাসম্ভব স্পষ্ট, সহজবোধ্য ও সৎ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই

ধরনের সাহিত্যের যেহেতু 'ভালো' হয়ে ওঠার একটি দায় থাকে, সেহেতু লেখককে সবসময় সতর্ক থাকতে হয় তা নির্মাণের সময়— যাতে এখানে এমন কোনো উপাদানের সংযুক্তি না ঘটে, যা শিশুমনকে আঘাত করতে পারে। অন্যদিকে, তাত্ত্বিক Gillian Avery অবশ্য মনে করেন যে শিশু যা চায়, যেভাবে চায়, সাহিত্য থেকে সে ঠিক সেভাবেই তা আহরণ করতে পারে বা করে নেয়। এই বিষয়টিকে Avery শিশুর নিজস্ব 'Defence Mechanism' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন[৮]।

শিশুসাহিত্যের বিষয় বা 'content' নিয়েও তর্ক রয়েছে। প্রাথমিকভাবে শিশুর নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার জন্যই এই ধরনের লেখালেখির সূত্রপাত হয়েছিল। তাই শিশু সাহিত্যে নির্দেশমূলক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। F. J. Harvey Darton এর মতে,

> "....by 'children's books' I mean printed works produced ostensibly to give children spontaneous pleasure and not primarily to teach them, not solely to make them good, not to make them profitably quiet."[৯]

অর্থাৎ শিশুমনকে উপেক্ষা করলে শিশুসাহিত্য তার গুরুত্ব হারায় বলেই মনে করেছেন তিনি। শিশুসাহিত্যের উদ্দিষ্ট পাঠক যেহেতু মূলত শিশুরা, তাই পাঠক-শিশুদের দৃষ্টিকোণ থেকেও শিশুসাহিত্যের উপাদানকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে Charlotte Huck এর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উল্লেখ্য —

> "Good writing or effective use of language...will help the reader to experience the delight of beauty, wonder or humor...He will be challenged to dream dreams, to ponder and to ask questions to himself".[১০]

এ কারণেই অনেক তাত্ত্বিক শিশুসাহিত্যে জ্ঞানমূলক প্রবণতা বর্জন করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে V. Haviland এর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

> "We should not expect children's stories to be sermons or judicial arguments or sociological pamphlets. As independent works of art they

> must be allowed to appeal to the imagination, the mind, the heart on their own terms....If a writer cannot say what he really feels, if he cannot be serious in developing a theme....[If he has in any way to minimise] that approach to books for the young must eventually dilute their quality as mainstream literature".[১১]

কিন্তু এই মতবাদের ঠিক বিপ্রতীপেই রয়েছে John Glazer ও Gurney Williams এর বক্তব্য, যাঁরা পাঠক শিশুদের গুরুত্ব স্বীকার করে নিলেও সাহিত্যের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের অনুভূতিকে মোটেও স্বীকৃতি দিতে চাননি। তাঁদের মতে,

> "...good children's books are characterised by strong materials—good plots, rich settings, well developed characters, important themes and artistic styles...bold and imaginative language...the likes and dislikes of children do not determine the quality of literature...Books must be judged as literature on their own merits."[১২]

এই বিচিত্র তর্ক-বিতর্কের শেষে উল্লেখ করা যেতে পারে দুজন তাত্ত্বিকের বক্তব্য, যাঁরা শিশুসাহিত্য সম্পর্কে প্রায়-পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। বক্তব্য দুটি নিচে ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হ'ল—

ক। M.McDowell — "Children's books are generally shorter; they tend to favour an active rather than a passive treatment, with dialogue and incident rather than description and introspection; child protagonists are the rule; conventions are much used; the story develops within a clear-cut moral schematism which must adult fiction ignores; children's books tend to be optimistic rather than depressive; language is child-oriented; plots are of a distinctive order, probability is often disregarded; and one could go on endlessly talking of magic, and fantasy, and simplicity, and adventure."[১৩]

খ। Natalie Babbitt—"...children's books are neither necessarily less serious than adults' books, nor necessarily concerned with 'simpler' or 'different' emotions: there is, in point of fact, no such thing as an exclusively adult

emotion, and children's literature deals with them all...there are few differences in content between adult and children's literature: war, disability, poverty, cruelty, all the harshest aspects of life are present in children's literature, as is fantasy."[১৪]

এই বক্তব্য দুটিকে পরিপুষ্ট করে Maxim Gorkey-র শিশুসাহিত্য সংক্রান্ত বক্তব্যটি —

> "To successfully create fiction and educative literature for children we need the following: first, writers of talent capable of writing simply, interesting and meaningfully; then editors of culture, with sufficient political and literay training, and finally the technical facilities to guarantee timely publication and due quality, for books of children"[১৫]

উক্ত পর্বের আলোচনাটি শেষ করা যেতে পারে শিশুসাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনমূলক ধারণার কথা উল্লেখ করে। দার্শনিক জন লক ও রুশো প্রবর্তিত 'শৈশব'-এর ধারণার সূত্রে কিছু সমালোচক মনে করেছেন শিশু তথা শৈশবের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাহিত্যের চলনটিও ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থেকেছে। সেদিক থেকে দেখলে এটি একটি জায়মান প্রক্রিয়া। Karin Lensik-Oberstein এর মতে, "....children's literature is described as progressing towards an even better and more accurate inclusion of the 'child' in the book."[১৬] ।

সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, শিশুসাহিত্য একটি সতত-নির্মীয়মাণ ব্যাপ্ত ধারণা—কোনো একক ধ্রুব সংজ্ঞায় শিশুসাহিত্যকে সীমায়িত করা সম্ভব নয়।

২। পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে শিশুসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

পাশ্চাত্যে শিশুসাহিত্যের উদ্ভব হয় মৌখিক পরম্পরায় বাহিত বিচিত্র কথা ও ছড়ার সূত্রে, ফলত উদ্ভবের যথাযথ দিন-ক্ষণ বলা কখনোই সম্ভবপর নয়। ইউরোপে পঞ্চদশ শতক থেকেই ছোটদের জন্য কিছু কিছু লেখার সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি মূলত শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে বা তাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করে তোলার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ বা বিশ শতকের প্রথম পর্যায়কে পাশ্চাত্যের শিশু সাহিত্যের 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে, কারণ এই সময়েই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছোটদের উপযোগী বই লেখা হয়। নির্দেশমূলক বা ধর্মীয় বইয়ের পাশাপাশি আদি যুগে যে বইটি অবশ্য স্মরণযোগ্য, তা হল 'ঈশপের গল্প' (নীতিকথাধর্মী বই)। এছাড়া, রূপকথা, বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি, লোককথাতেও নিহিত ছিল শিশুসাহিত্যের বীজ। 'চ্যাপবুক' নামে একধরনের বই ওই সময় প্রকাশিত হত ব্রিটেনে। এই ধরনের বই সম্পর্কে আন্তর্জালিক তথ্য এইরূপ—

> "Chapbooks, pocket-sized pamphlets that were often folded instead of being stitched, were published in Britain; illustrated by woodblock printing, these inexpensive booklets reprinted popular ballads, historical re-tellings, and folk tales. Though not specifically published for children at this time, young people enjoyed the booklets as well. Johanna Bradley says, in From Chapbooks to Plum Cake, that chapbooks kept imaginative stories from being lost to readers under the strict Puritan influence of the time."[১৭]

এছাড়াও লেখা হয়েছিল 'হর্নবুক'—প্রাইমার জাতীয় একধরনের বই এবং খ্রিস্টান শিশুদের খ্রিস্টীয় রীতিনীতি পরিচয়ের জন্য বিশেষভাবে লিখিত বই — 'Catechism'। ১৬৪৬ সালে প্রকাশিত এই বইটির লেখক ছিলেন পিউরিটান জন কটন। তবে এই বইগুলি শিশুদের জন্য লেখা বলে মনে হলেও, এইসব বইয়ের পাঠক ছিলেন প্রাপ্তবয়স্করাও।

সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ছোটদের জন্য লিখিত বইয়ের ধরন কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ফ্রান্স ও ইটালিতে এই সময়ে শুরু হয় লোককথা ও রূপকথা সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়াস। ১৬৫৮ সালে প্রকাশিত হয় ছোটদের জন্য তৈরি প্রথম ছবির বই 'Orbis Pictus', লেখক ছিলেন চেক শিক্ষাবিদ John Amos।[১৮]

আঠারো শতক থেকে বিশেষভাবে ছোটদের জন্য ছড়া ও ধাঁধার বই লেখা শুরু হয়। A Little Book for Little Children (১৭১২), A Description of Three Hundred

Animals (১৭৩০) ইত্যাদি ছিল সেই জাতীয় বই।[১৯] অধ্যাপক M. O. Grebby তাঁর 'The Origins of Children's Literature' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন Mary Cooper-এর লেখা দুই খণ্ডবিশিষ্ট বই- 'Tommy Thumb's Pretty Song Book' (১৭৪৪)- এর কথা, যেটি বহুশ্রুত ইংরেজি ছড়াগুলির ধারক এবং এ ধরনের কাজে এই বইটিই ছিল পথিকৃৎ। এই প্রবন্ধেই তিনি উল্লেখ করেছেন জন লকের দার্শনিক প্রস্থানে বিশ্বাসী John Newbery-এর কথা, যাঁকে 'Father of children's literature' বলা হয়ে থাকে। তিনি বলছেন

> "Newbery has become known as the 'father of children's literature' chiefly because he was able to show that publishing children's books could be a commercial success"

M O Grebby এই John Newbery-এর প্রথম বই 'A Little Pretty Pocket-Book Intended for the Instruction and Amusement of Little Master Tommy and Pretty Miss Polly' (১৭৪৪)-এর প্রভূত জনপ্রিয়তার পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন তাঁর অন্যান্য অবদানের কথাও —

> "Newbery was a great innovator too. He produced the first children's periodical for example, called 'The Lilliputian Magazine' (1751-52), a miscellany of stories, verse, riddles and chatty editorials. And his most famous work, 'The History of Little Goody Two-Shoes' (1765) has a good claim to be called the first children's novel. It tells the story of a poor orphan, Margery, who makes a career for herself as a teacher before, like a less glamorous Cinderella (with no fairy godmother, balls to attend, or glass slipper), she marries the local landowner who she has impressed by her honesty, hard work and good sense."[২০]

লক্ষণীয়, মেয়েদের স্বাভাবিক শক্তির জোরে বলীয়ান করে তোলার গল্প Newbery কতকাল আগেই শিশুসাহিত্যে বলে গিয়েছিলেন!

আঠারো শতকের আনুষঙ্গিক শিশুসাহিত্য নির্মিতি পুরোটাই দার্শনিক চিন্তন সম্পৃক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ দার্শনিক চেতনা যখন যেভাবে শিশুর শৈশবকে নির্মাণ করেছে,

শিশুসাহিত্যকেও সেভাবে নতুন নতুন মোড়কে হাজির করা হয়েছে। এই আলোচনা আমাদের তৃতীয় সূত্রের অন্তর্গত হওয়ায় আমরা আপাতত এগিয়ে যেতে পারি উনিশ শতকের শিশুসাহিত্য ধারা আলোচনায়।

উনিশ শতকের ইউরোপে শিশুসাহিত্য অত্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। এর প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে ছাপাখানার প্রসার ও জনগণের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। এছাড়া, অষ্টাদশ শতকের পর থেকে মানুষের চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন হতে শুরু করে। শিশু সাহিত্যে 'স্কুল-স্টোরি' ঘরানা জন্ম নেয় এই সময়ে—১৮৫৭ সালে, Thomas Hughes এর 'Tom Brown's school Days' বইয়ের সূত্রে। এই সময়েই রচিত হয় Lewis Carroll এর 'Alice in Wonderland'(১৮৬৫) এবং মার্ক টোয়েন-এর 'The Adventures of Tom Sawyer' (১৮৭৬), 'The Adventures of Huckleberry Finn' (১৮৮৪), 'Tom Sawyer, abroad' (১৮৯৬), 'Tom Sawyer Detective' (১৮৯৬)। ইতালিতে ১৮৮৩ সালে Carlo Callodi কর্তৃক রচিত হয় 'The Adventures of Pinocchio', ১৮৮০ সালে Robert Louis Stevenson লেখেন 'Treasure Island' এবং 'Kidnapped', Rudyard Kipling ১৮৯৪ সালে লেখেন 'The Jungle Book', J. M. Barrie ১৯১১ সালে রচনা করেন 'Peter and Wendy'।[২১]

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপে এই বিপুল লেখালেখি খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় পর্বটি তাই শিশু কিশোর সাহিত্যের 'সুবর্ণ যুগ' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ১৮৬৫ সালের পর থেকে আমেরিকাতেও শিশু কিশোর সাহিত্যের বাঁক বদল ঘটে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই দেখা যায় শিশু কিশোর সাহিত্যের গতি প্রকৃতির বদল ঘটছে—অলৌকিক বা অবাস্তব ভূমি ছেড়ে তা সমাজ-বাস্তবতা সম্পৃক্ত হয়ে উঠছে। এই শতাব্দী তাই শিশু কিশোর সাহিত্যের পরিণত অধ্যায়ের সূচক—

> "Progress in children's literature depended partly on abandoning this mechanical, part-for-the-whole attitude. One encouraging note in realistic children's fiction of the second half of the 20th century in all advanced countries is the appearance of a more organic view."[২২]

শিশু বা শৈশব-এর ধারণা বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থান-সম্ভূত হওয়ার কারণে শিশুসাহিত্য ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে-এমনটাই দেখিয়েছেন বহু সমালোচক। Hans Heino Ewers তাঁর 'Children's Literature in Europe at the Start of the 20th Century and the Intellectual Place of Ivana Brlić-Mažuranić's Children's Story Čudnovate zggode šegrta Hlapića' প্রবন্ধে খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'Neoromanticism' বা 'Neorealism'-এর মতো মতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কারণে ছোটদের বইয়ের ধরন কীভাবে বদলে গিয়েছে ইউরোপের সর্বত্র।[২৩]

বিশ্বের শিশুসাহিত্যের এক সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটেছিল বিশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায়। আর্থিক সংকট, মূল্যবোধের অবক্ষয় শিশু সাহিত্যের ক্রম উত্থানকে ব্যাহত করে। চাহিদার হ্রাস ঘটে। মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যাও কমে আসে। তবু এই সময়েই কম মূল্যের বিনিময়ে বই সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তৈরি হয় 'পেপারব্যাক' মলাটে বই বিক্রি। এই সময় থেকেই শিশু সাহিত্যের মূল চরিত্র হিসেবে নিম্ন বর্গের শিশুদেরও অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটে। এমনকি, শিশুদের ধরন, তাদের কর্মকাণ্ড সর্বত্রই সেই 'সময়' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

ভারতবর্ষ তথা বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যও এইরকম ধাপে ধাপেই এগোচ্ছিল। উনিশ শতকে 'স্কুল বুক সোসাইটি'র উদ্যোগে মূলত শিশুশিক্ষার প্রয়োজনে যে শিশু-উপযোগী লেখালেখির আরম্ভ, বিশ শতকে যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়—পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৩। 'শৈশব-কৈশোর': জৈবিক-শারীরবৃত্তীয় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারণা

শৈশব এবং কৈশোর, মানব বিকাশের এই দুটি পর্বকে, খুব সূক্ষ্মভাবে পৃথক শ্রেণিভুক্ত করতে গেলে প্রাথমিক একটি জটিলতা তৈরি হয়। আর তা হয় 'শৈশব'কে ঘিরেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় শিশু (infant) বলতে হাঁটতে না শেখা পর্যন্ত বাচ্চাদেরই গণ্য করা হয়। তবে মানসিক উৎকর্ষের নিরিখে ভারতবর্ষে চার-পাঁচ বছরের শিশুকেও প্রসারিত 'infancy'-র মধ্যেই দেখা হয়ে থাকে।[২৪] প্রকৃত শৈশব শুরু হয় একটি শিশুর স্বাধীনতা আর উদ্যোগের বোধের সূচনা দিয়ে। সুইস মনোবিজ্ঞানী জাঁ পিয়াজে (Jean Piaget) দেখিয়েছেন যে ২-৭ বয়সের শিশুরা ধীরে ধীরে কেমন করে তাদের একটি জিজ্ঞাসু পৃথিবী তৈরি করে নেয় যেখানে তাদের স্বজ্ঞা শিশুদের মনে মনে বড় করে তুলতে সাহায্য করে। তাদের এই আত্মনিবিষ্ট কৌতূহলের পৃথিবীকে যুক্তির প্রাথমিক পর্যায় হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। পিয়াজে বিকাশের এই দশাকে বলেছেন 'Preoperational Stage'।[২৫] এই পর্যায়ে তাদের একটি স্পষ্ট কল্পনার জগৎও তৈরি হয়ে যায়। এদিকে উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞানে শৈশবকে প্রারম্ভিক শৈশব (প্রাক্-স্কুল কাল), মধ্য-শৈশব (স্কুলের কাল) এবং বয়ঃসন্ধিপর্ব, এই তিনটি পর্বে ভাগ করে দেখা হয়। তবে ভাল করে দেখলে এখানেও দেখা যাবে যে শেষ দুটি পর্ব সমাপতিত হয়ে যায় 'কৈশোর'-এ। আসলে এই কিশোর-পর্বটি শৈশবেরই পরিণত অবস্থা। এই কারণেই আইনের চোখে ১৮ বছর বয়স থেকেই সাবালকত্ব স্বীকৃত হয়ে আছে, এর আগে সকলেই নাবালক।

জৈবিক বিকাশের ভিত্তিতে শৈশব এবং কৈশোর

শৈশব হল শিশুর বিকশিত হয়ে ওঠার পর্ব। এই বিকাশ জীব-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে দেখলে শিশু-পুত্র এবং শিশু-কন্যা, দুটি ভিন্ন আঙ্গিকে পাওয়া যায়। একইরকম ভাবে কৈশোরেও আমরা পেয়ে যাই কিশোর-কিশোরীর বিকাশে ভিন্নতার ছবি।

নিতান্ত শৈশব অবস্থায়, মোটামুটি চার সপ্তাহের বয়সকাল থেকে, একটি শিশুকন্যার কিছু বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। এই সময় থেকেই তার দৃষ্টি মায়ের মুখের দিকে নিবদ্ধ হতে শুরু করে। মায়ের স্পর্শ, মায়ের আবেদন সে অনুভব করতে শেখে।[২৬] এক বছর বয়সের ৪১ জন শিশু-পুত্র এবং ২৯ জন শিশু-কন্যাকে নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্লেষণী গবেষণা থেকেও জানা গেছে যে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই 'eye contact'-এ বেশি সফল।[২৭] লিঙ্গভেদে শিশুর বিকাশগত এহেন পার্থক্যের জন্য দায়ী করা হয়েছে ভ্রূণ অবস্থায় তার মাতৃ জঠরের টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণকে। এই পরিমাণের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক ভাবে সম্পর্কিত শিশুর 'eye contact'-এর বিষয়টি।[২৮] মায়ের মুখের প্রতি শিশু-কন্যার এই বিশেষ ঝোঁক তাকে ক্রমে সামাজিক সম্পর্কের প্রতি টান তৈরি করতে সাহায্য করে।[২৯] আরও দেখা যায় যে, পুত্র-সন্তানের তুলনায় কন্যা-সন্তানের সঙ্গে এই বিকাশ পর্বে মায়ের অতিরিক্ত 'অবচেতন পরিচিতি' গড়ে ওঠে।[৩০]

কিশোর-কিশোরীর বিকাশের ক্ষেত্রে শৈশবের পার্থক্য প্রতিফলিত হতে থাকে। বড় হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় একটি কিশোরীর ভেতর 'সমানুভূতি'র বৈশিষ্ট্য গভীর হয়ে উঠেছে।[৩১] এর পাশাপাশি একটি কিশোরের ভেতর দেখা যায় জাগতিক নিয়ম মেনে চলে এমন কোন কিছু বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ছে, তেমন কোন বস্তু তৈরি করতে অথবা তার ভৌতিক নিয়মকে বিশ্লেষণ করতে তার আগ্রহ ক্রমবর্ধমান হচ্ছে। অনুভূতির তুলনায় সে যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইছে সবকিছু। মানুষের মনোজগতের এই যে 'systemizing and empathizing'-এর বিভাজন, তা কৈশোর কালেই একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের ভেতর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যায়।[৩২] তাই দেখা যায় কৈশোর পর্ব বয়ঃসন্ধির দিকে যতোই এগোয়, ততোই অন্য মানুষের আবেগ-অনুভূতি বোঝার ক্ষেত্রে একটি মেয়ে তার সহজাত কমনীয়তার ওপর দাঁড়িয়ে পরিণত হয়ে উঠছে। অন্যদিকে, নতুন কোন জায়গায় এসে বিচলিত না হয়ে পথ খোঁজার ক্ষেত্রে বা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিকে যুঝতে একটি ছেলে সমান তালে বড় হয়ে উঠছে।

শিশু অবস্থা থেকে কৈশোর পর্যন্ত জৈবিক বিকাশে যে লিঙ্গ-পার্থক্য এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হল, যা ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের ইঙ্গিতবহ, তার মূল রয়ে গেছে মাতৃ-জঠরেই, এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান আমাদের রাখতেই হবে।

'শৈশব'-'কৈশোর'-এর দার্শনিক মতবাদ

জৈবিক তত্ত্বের পাশাপাশি দেখে নেওয়া প্রয়োজন 'শৈশব' বা 'কৈশোর'-এর দার্শনিক মতবাদগুলি। এই প্রস্থানসমূহ মূলত পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের ধারণা-সঞ্জাত বিষয়। আমরা নানাবিধ মতবাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করেছি কিছু প্রাসঙ্গিক প্রস্থান। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্যের শিশু সাহিত্য এই প্রস্থান দ্বারাই মূলত প্রভাবিত হয়েছিল। তাই খুব সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যেতে পারে যে, জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরে 'শৈশব' বা 'কৈশোর' কীভাবে ব্যাখ্যাত হয়; কারণ, সাহিত্য 'সামাজিক-সাংস্কৃতিক' দর্শন দ্বারাই নির্মিত হয়ে থাকে, জৈবিক-শারীরবৃত্তীয় তত্ত্বের প্রভাব সেখানে নিতান্ত নগণ্য।

'শৈশব' বা 'কৈশোর' কাকে বলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের মত অনুযায়ী তার যে বিচিত্র রকমফের, তা Philippe Aries তাঁর 'Centuries of Childhood: A Social History of Family Life' বইতে সবিস্তারে বর্ণন ও বিশ্লেষণ করেছেন।[৩৩] শিশুকে যে শুধুই প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা 'Little Adult' বলেই ভাবা উচিত নয়, তা আমরা এখন বুঝতে শিখেছি। কিন্তু এই ধারণা তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রেও একটি ঐতিহাসিক চলন রয়েছে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোট মেয়েরা' লেখাতে বলেছেন, "১৬ শতকীয় Humanist বা মানবতাবাদী চিন্তনচর্চা থেকে ১৭ শতকের শেষার্ধ-আঠারো শতকের Enlightenment বা আলোকভাস্বর যুগ তথা ১৯ শতকের Positivist বা ধ্রুববাদী, Utilitarian বা হিতবাদী এবং রোমান্টিক ঘরানার চিন্তনচর্চার জেরে নাগাড়ে পুনর্বিবেচিত

হয়েছে শিশুশিক্ষার আঙ্গিক-রকম; শিক্ষাদর্শের পরিবর্তনের পাশাপাশি হয়েছে শিশু-মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তত্ত্বগত ঢের ওলটপালট। ইতিহাসের নানান মারপ্যাঁচে সম্ভূত হয়েছে 'শৈশবে'র কালিক মাত্রার অতিরিক্ত স্থানিক মাত্রা। পরিশেষে, 'Childhood' নামক বুর্জোয়া বিসারটি এতই তাৎপর্যঘন হয় যে প্রাগাধুনিকতা ও আধুনিকতার অন্যতম জোরালো ভেদ-চিহ্ন-ই হয়ে দাঁড়ায় (নব-নব রূপায়িত) 'শৈশব'..."।[৩৪] শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদর্শিত পথেই আমরা মূলত 'শৈশব'কে পড়ে নিতে শুরু করব, যদিও আমাদের আলোচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী আরো কয়েকজন তাত্ত্বিকের মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছে Desiderius Erasmus-এর সূত্রে। কিন্তু আমরা প্রথমে 'Aristotelian Conception of Childhood' থেকেই আলোচনা শুরু করতে পারি। 'Stanford Encyclopedia of Philosophy'-তে বলা হয়েছে,

> "According to this conception, a human child is an immature specimen of the organism type, human, which, by nature, has the potentiality to develop into a mature specimen with the structure, form, and function of a normal or standard adult".[৩৫]

অ্যারিস্টটলের বক্তব্য পরবর্তী সময়ে নানাভাবে পরিমার্জিত হয়েছে, তার একটি হল, 'ontogeny recapitulates phylogeny –that is, that the development of an individual recapitulates the history and evolutionary development of the race, or species.'[৩৬] তাত্ত্বিক জাঁ পিয়াজেঁ এবং ফ্রয়েডের ধারণায় এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

> "The other modification is the idea that development takes places in age-related stages of clearly identifiable structural change. ... Matthews (2008, 2009), argues that a Piagetian-type stage theory of development tends to support a "deficit conception" of childhood, according to which the nature of the child is understood primarily as a configuration of deficits—missing capacities that normal adults have but children lack. This conception, he argues, ignores or undervalues the fact that children are, for example, better able to learn a second language, or paint an aesthetically worthwhile picture, or conceive a

philosophically interesting question, then those same children will likely be able to do as adults. Moreover, it restricts the range and value of relationships adults think they can have with their children."[৩৭]

এবারে ফেরা যাক ইউরোপের রেনেশাঁসের পুরোধা ব্যক্তিত্ব Desiderius Erasmus-এর বক্তব্যে । ১৫২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর বই 'A Declamation on the subject of Early Liberal Education for Children'-এ তাঁর মূল বক্তব্যের সারমর্মের তর্জমা করা হয়েছে এভাবে, "তালিমি-দক্ষতা জিনিসটি শিশুর সহজাত; অতএব, অপত্যমায়ার ফেরে পুতুপুতু করা, বয়ঃসন্ধি অব্দি শিশুর শিক্ষা মুলতুবি রাখার অর্থ শিশুকে তার জন্মগত অধিকার হতে বঞ্চিত করা।"[৩৮]

এরপরেই 'শৈশব' বিষয়ে 'সামাজিক চুক্তি'র বিশিষ্ট দার্শনিক জন লক-এর বক্তব্যে আলোকপাত করেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু লকের আগে দার্শনিক কমেনিয়াস-ও (১৫৯২-১৬৭০) শিশু বিষয়ক তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন। 'শৈশব' বিষয়ে তাঁর মতবাদটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কমেনিয়াস একটি শিশুর জৈবিক বৃদ্ধির সঙ্গে মানসিক গড়নকে ওতপ্রোত সম্পর্কিত করে দেখেছেন। তিনি শিশুর জন্মাবস্থা থেকে কৈশোরকালকে চারটি পর্বে বিন্যস্ত করেছেন — 'Infancy', 'Childhood', 'Boyhood', 'Youth'।[৩৯] এর মধ্যে প্রথম অবস্থায় তিনি শিশুর 'স্কুল' হিসেবে 'মাতৃক্রোড়'কে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে শিশুর 'perpetual faculty' বিকশিত হবে। তারপর ধীরে ধীরে 'vernacular school'-এ 'faculty of memories and imagination' এর বিকাশ, 'secondary school'-এ 'logical faculty' প্রস্তুতিকরণ, পরিশেষে 'university school'-এ 'moral faculty' পরিপুষ্ট হয়ে ওঠার মাধ্যমে একটি আদর্শ শিশুর চেতনার বিস্তারকে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতবাদে 'শৈশব' ও 'প্রকৃতি'র ধারণা অঙ্গাঙ্গীসম্পর্কযুক্ত। তিনি বলতেন, "Learn as much as possible from the great book of Nature."[৪০] তিনি শিশু বা কিশোরকে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে যে নতুন পন্থা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, তা দার্শনিক পরিভাষায় 'sense-realism' নামে পরিচিত। ১৬৫৭

সালে প্রকাশিত কমেনিয়াসের 'The Great Didactic' বইটিকে অধ্যাপক মুখার্জি 'Educational Classic'[৪১] বলেই চিহ্নিত করেছেন।

কমেনিয়াসের পরে উল্লেখ করতে হয় দার্শনিক জন লকের কথা (১৬৩২-১৭০৪)। তিনিই প্রথম শিক্ষা-দর্শনের আঙিনায় 'child-study movement' কে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে শিশুমন হল 'tabula rasa' বা 'blank tablet' বা 'white sheet of paper or wax'—অর্থাৎ শিশুমনে পূর্ব থেকে কোনো ধারণা প্রোথিত থাকে না। শিশুমনকে তাই সচেতনভাবে নির্মাণ করার কথা বলেছেন লক। এই বক্তব্যের নিরিখে জন লককে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, "Locke's imagery of the tabula rasa has had an influence far beyond his times….He was in this, as in all his positions, a radical and a rationalist."[৪২] লকের দুটি বিখ্যাত বই ১৬৯০ সালে প্রকাশিত 'An essay Concerning Human Understanding' এবং ১৬৯২ সালে প্রকাশিত 'Some Thoughts Concerning Education' থেকে লকের শিক্ষাদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর মতে আদর্শ 'শৈশব' বা 'কৈশোর'-এর ত্রিমুখী শিক্ষা একান্ত জরুরি। সেগুলি হ'ল- 'Physical', 'Moral' ও 'Intellectual' 'Education'। জন লক চেয়েছিলেন খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর মনোজগতের বিকাশ ঘটাতে—তাই তাঁর হাত ধরেই 'Playway in education' ধারণা সূচিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে লকের 'শৈশব' বা 'শিশুমন' সংক্রান্ত চিন্তনে বারবার ফিরে এসেছে 'Tabula Rasa'—যদিও পরবর্তীকালে এই তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে, কিন্তু এটি যে মৌলিক ও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টিকারী, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

জন লকের পরেই যে দার্শনিকের কথা উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন 'এনলাইটেনমেন্ট ও রোমান্টিসিজমের সেতু-তুল্য' তাত্ত্বিক রুশো (Jean Jacques Rousseau) (১৭১২-১৭৭৮)। শিক্ষাবিদ রুশোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তাঁর শিক্ষাচিন্তামূলক উপন্যাস 'এমিল' (Emile) (১৭৬২)-এর মাধ্যমে। তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব 'ন্যাচারালিস্ট' ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত।

শিক্ষায় 'শিশু-কেন্দ্রিক প্রবণতা'র যে আধুনিক ঘরানা, তার জনক হলেন রুশো। একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—"The most noteworthy and permanent contribution of Rousseau is his emphasis on the psychological study of the child. The Child, according to him, is a symbol of purity and simplicity. It is innocence incarnate."[৪৩] রুশো শৈশবকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এভাবে— "Nature wills that children should be children before they are men… Childhood has ways of seeing, thinking, feeling peculiar to itself. Nothing is more absurd than to wish to substitute ours in their place."[৪৪] 'এমিল' গ্রন্থে কেন্দ্রীয় চরিত্র এমিলের বয়সের চারটি পর্যায় দেখিয়ে রুশো কমেনিয়াস-প্রবর্তিত শৈশব-কৈশোরের ভাবনাকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি এখানে এক বছর থেকে পাঁচ বছর, পাঁচ বছর থেকে বারো বছর, বারো বছর থেকে পনেরো বছর এবং পনেরো বছর থেকে কুড়ি বছর—এইভাবে এমিলের জীবন-পর্যায় বিন্যস্ত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এটি শুধু এমিলের জীবনের স্তর নয়, রুশো সামগ্রিকভাবে শৈশব-কৈশোর-বয়ঃসন্ধি-প্রাপ্তবয়স্ক—এই ভাবনাগুলিকে উক্ত ক্রম অনুসারেই বিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। 'এমিল' উপন্যাসের পঞ্চম পর্বে রয়েছে 'সোফি' নামক একটি মেয়ের কথা, যার সঙ্গে এমিলের বিয়ে হয়। এর মাধ্যমে নারীদের শিক্ষা বিষয়ে রুশোর ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে—যা রুশোর আধুনিক চিন্তার প্রতিবন্ধক। রুশোর মতে, মেয়েদের শিক্ষা কখনোই উদার হওয়া উচিত নয়; তিনি বলেছিলেন, "A woman of culture is to be avoided like a pestilence. She is the plague of her husband, her children, her servants, everybody."[৪৫] বিশ্বখ্যাত তাত্ত্বিকের এরকম পক্ষপাতদুষ্ট বোধ সম্ভবত সঞ্চারিত হতে থেকেছিল বহু বছর ধরে—শিশুসাহিত্যের এলাকাতেও তাই চোখে পড়ে এই বৈষম্য।

রুশোর শিক্ষা-চিন্তন দ্বারা পরবর্তীতে প্রভাবিত হয়েছিলেন বহু প্রথিতযশা তাত্ত্বিক—পেস্তালজি, হারবার্ট স্পেন্সার, মন্তেসরি প্রমুখ। এই অধ্যায়ে সমস্ত তাত্ত্বিকের সকল বক্তব্য পেশ করা সম্ভবপর নয় বলে আবার আমরা শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত দুজন তাত্ত্বিকের প্রসঙ্গ

এখানে উল্লেখ করে এই পর্যায়ের বক্তব্য শেষ করছি। এঁদের মধ্যে একজন হলেন জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২); যিনি তাঁর 'Panoptican' (১৭৯১-১৮২২) পুস্তিকায় শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি নিয়মের চৌহদ্দিতে শৃঙ্খলিত 'শৈশব'-এর কথাও উল্লেখ করেছিলেন।[৪৬]

অন্যজন হলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), যিনি তাঁর 'Three Essays on the Theory of Sexuality' (১৯০৫) সালে দেখিয়ে দেন যে, "শিশুযৌনতার রয়েছে বিশিষ্ট এক ব্যাকরণ।"[৪৭] এই বক্তব্যের পর 'শৈশব'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'পবিত্রতা' বা 'অপাপবিদ্ধতা'র ধারণা নিশ্চিতভাবেই আহত হয়েছিল।

উক্ত বক্তব্যসমূহের প্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, 'শৈশব' নামক 'পরিসর'টি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির ওপর সর্বাংশে নির্ভরশীল। এবং, এই 'পরিসর' যতটা 'কালিক', ততটাই 'স্থানিক'।[৪৮]

৪। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে 'মেয়েবেলা' উপস্থাপন বা পরিবেশনের প্রবণতা পাঠের প্রচেষ্টা

প্রথম অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে প্রথমেই একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহারের নিজস্ব যুক্তি বলে নেওয়া জরুরি বলে মনে হয়। শব্দটি হল 'মেয়েবেলা'। প্রকৃতপক্ষে, এই গবেষণায় আমরা দেখাতে চেয়েছি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের কথা কোথায়, কীভাবে বলা হয়েছে, তার খতিয়ান। আর সেক্ষেত্রে, 'ছেলেবেলা' শব্দটির বিপরীত শব্দ হিসেবেই উঠে এসেছে 'মেয়েবেলা' শব্দটি।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যজগতে প্রবেশ করার আগে দেখে নেওয়া যেতে পারে সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে যখন শিশু-কিশোর সাহিত্য রচিত হতে থাকল, তখনও মেয়েদের নিয়ে আদৌ কোথাও কিছু লেখা হল কিনা; মেয়েরা কি সব দেশের সব ভাষায় রচিত শিশু-কিশোর সাহিত্যেই ব্রাত্য হয়ে রইল!

অন্যান্য সাহিত্যের মত শিশু-কিশোর সাহিত্যেও মেয়েদের কথা তুলনামূলকভাবে সর্বত্রই কম বলা হয়েছে প্রথম পর্ব থেকে। ছোটদের বইয়ে যেখানে মেয়েদের কথা উঠে এসেছে, সেখানেও তারা সমাজনির্দিষ্ট ছকের বাইরে যেতে পারেনি মোটেই। শান্ত, স্থিতধী, গৃহকর্মনিপুণা, সুন্দরী, সর্বংসহা ইত্যাদি যেসমস্ত গুণাবলি একটি আদর্শ মেয়ের কাছে কাঙ্ক্ষিত, তার সূত্র ধরেই শিশু-কিশোর সাহিত্যে এসেছে মেয়েরা, এমনকি বিশ্ব সাহিত্যের দরবারেও। অন্যরকম মেয়ের কথা প্রথম পাওয়া যায় ১৮৬৩ সালে Louisa May Alcott রচিত 'Little Woman' বইতে। ১৯০০ সালে প্রকাশিত Frank L. Baum-এর 'The Wonderful Wizard of Oz' বইটিও ওই পূর্ববর্তী বইটির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। এই দুটি বইতেই প্রায় বিপ্লবী চেতনা সম্পৃক্ত আধুনিকমনস্ক মেয়েদের কথা রয়েছে, সময়ের তুলনায় যারা ছিল যথেষ্ট দুর্লভ।

প্রশ্ন ওঠে, এই লিঙ্গবৈষম্যের কারণ কি? শিশু সাহিত্যের সমালোচক ও তাত্ত্বিকেরা বিষয়টিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাত্ত্বিক অধ্যাপক Kimberley Reynolds এর সঙ্গে বাজার-অর্থনীতির যোগাযোগ সন্ধান করেছেন। ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি জানিয়েছেন, পাঠক হিসেবে মেয়েরা ছেলে ও মেয়ে উভয় চরিত্রের কাহিনি পড়তে অভ্যস্ত হলেও ছেলে-পাঠকেরা মেয়ে-কেন্দ্রিক গল্প পড়তে অনিচ্ছুক। সুতরাং, ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় 'বাজার' স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেছে এই নির্মাণকে। এরই সূত্রে সামাজিক লিঙ্গরূপের যে প্রথাসিদ্ধ চাহিদা (Gender Stereotype), তার বিপ্রতীপে গিয়ে নতুনভাবে চরিত্র সৃজনের ঝুঁকি নিতে চাননি কেউই—না লেখক, না প্রকাশক। প্রসঙ্গত একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে—

> "According to an article published in the Guardian in 2011, by Allison Flood, Looking at almost 6,000 children's books published between 1900 and 2000, the study, led by Janice McCabe, a professor of sociology at Florida State University, found that males are central characters in 57% of children's books published each year, with just 31% having female central characters. Male animals are central characters in 23% of books per year, the study found, while female animals star in only 7.5%."[৪৯]

নারীবাদী সাহিত্য-সমালোচকেরা উক্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন নারীবাদী সাহিত্যের সঙ্গে সাদৃশ্যের সূত্রে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে 'ক্ষমতা'র যে স্রোত, সেখানে মেয়েরা সাধারণভাবেই শোষিত। ফলে, সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের যে কাঠামো, সেখানে 'দুর্বল' ও 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' হিসেবেই মেয়েরা উপস্থাপিত— তা সে নারী-কেন্দ্রিক সাহিত্য হোক্ বা শিশু সাহিত্য। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাও তাঁরা পোষণ করেন, যে, নারীবাদী আন্দোলনে নারী-কেন্দ্রিক শিশু কিশোর সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেহেতু এখনো পর্যন্ত উক্ত বিষয়টির প্রায়োগিক ক্ষেত্র বেশ দুর্বল, তাই এখানে এই তত্ত্ব বিশদে আলোচনার সুযোগ সীমিত।[৫০]

বাংলা শিশুসাহিত্যের মেয়েদের নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করার ক্ষেত্রে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোট মেয়েরা' বইটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। এখানেই তিনি তুলে ধরলেন সেই অমোঘ সত্য –

> "ভুবনবিখ্যাত সব শিক্ষাবিদ ও শিশু মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, ছেলেবেলার তুলনায় মেয়েবেলার আয়ুষ্কাল বেশ কম; কৃত্রিম যত কৌশলেই বিস্তৃত, প্রলম্বিত হোক না শৈশবের পরিধি, নিদেন মতাদর্শের নিরিখে নির্ভার আমোদের সে ঠাম থেকে প্রবেশের পর পরই দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হতে হয় মেয়েদের; খোকাদের মতো রয়ে-বসে থাকার সময় আদৌ নেই খুকিদের। এক কথায়: ছেলেদের নয়, মেয়েদের বেলাতেই 'শৈশব' স্থান-পরিসরটি কাল দ্বারা অতি-নিরূপিত, over-determined" ।[৫১]

সুতরাং, যে দেশে 'মেয়েবেলা'র সীমা অতি সংকুচিত, সেখানে ছোটদের বইতে যে তাদের 'হয়ে ওঠা'র কাহিনি ধরা থাকবে না, তা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় লিখিত শিশু-কিশোর সাহিত্যেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই রয়েছে এই লিঙ্গরাজনীতি। সিমোন দ্য বোভোয়া বলেছিলেন, "নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে।"[৫২] অর্থাৎ, জৈবিকভাবে স্ত্রী-অঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে সেটি হয় তার শারীরবৃত্তীয় পরিচিতি বা 'Sexual Identity' আর, সামাজিকভাবে তাকে নানা নিয়ম-শৃঙ্খলার নিগড়ে বেঁধে 'মেয়েলি' করে তোলার যে প্রয়াস, তাতেই তার 'Gender' বা 'সামাজিক লিঙ্গরূপ' নির্ধারিত হয়ে যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চাহিদা অনুযায়ীই মূলত 'নারীত্ব' নির্মিত

হতে থাকে। মল্লিকা সেনগুপ্ত বিভিন্ন উৎস থেকে দৃষ্টান্ত প্রদান করে দেখিয়েছেন সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বত্রই দেখানো ও শেখানো হয় যে, ছেলেদের গুরুত্ব মেয়েদের তুলনায় অনেকটাই বেশি। সুতরাং, "মেয়েরা 'মানুষ' হতে থাকে ছেলেদের উল্টো লক্ষণগুলো দিয়ে, তাদের শিরায় শিরায় ঢুকে যায় এই বোধ যে পুরুষের আশ্রয়ে অনুগত থাকাই মেয়েদের আদর্শ রোল মডেল।"[৫৩] সিমোন দ্য বোভোয়া এ কারণেই মেয়েদের বলেছেন 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'। ভার্জিনিয়া উলফ্ 'A Room of One's Own' (১৯২৯) বইতে এই সামাজিকভাবে নির্মিত লিঙ্গপরিচয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তা পরিবর্তনে উদ্যোগী হতে বলেছেন।

প্রসঙ্গত বলা উচিত, মেয়েদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচিতির অন্তরায় পুরুষ নয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামো। আদিম সাম্যবাদী সমাজে পরিবার, শ্রেণিবৈষম্য, সম্পত্তি ইত্যাদির ধারণা না থাকাতে সেই সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। 'ধ্রুব মাতৃস্বত্ত্ব' অনুসারে বংশ নিরূপিত হওয়ায় নৃতাত্ত্বিকেরা সেই সমাজকে নির্দেশ করেছিলেন 'ম্যাট্রিলিনিয়াল' ও 'ম্যাট্রিলোকাল' সমাজ হিসেবে। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত লুই হেনরি মর্গ্যানের 'দি এনসিয়েন্ট সোসাইটি' বইতে এই তত্ত্ব জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫৪] ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয় এঙ্গেল্‌সের 'The Origin Of the Family, Private Property and The State'। মল্লিকা বলছেন, "প্রাক-ইতিহাস পর্বের সামাজিক সম্পর্কের পর্যায়গুলিকে এঙ্গেলস্—মাতৃতন্ত্র, অবাধ যৌনতা, গোষ্ঠী বিবাহ, কনস্যানগুইনাস পরিবার, পুনালুয়ান পরিবার, জুড়িবাঁধা ও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার—এভাবে বিন্যস্ত করেন।"[৫৫] কেট মিলেট এই পিতৃতন্ত্রী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছেন এবং এর একটি সক্রিয় অংশ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন 'ফ্যামিলি' বা 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে। ফ্যামিলি শব্দটির উৎস ল্যাটিন ফ্যামুলাস (Famulus), যার অর্থ দাস বা ভৃত্য। এটি যে পুরুষের প্রতিষ্ঠান, শব্দ থেকেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্যদিকে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুযায়ী স্ত্রী শব্দের অর্থ গর্ভ সংহত হওয়ার আধার।[৫৬] এই নামকরণের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সন্তান ধারণের মধ্যেই স্ত্রী জাতির সব থেকে বড় সার্থকতা। সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষ শিশুর সমতুল হিসেবে স্ত্রী শিশুকে যে চিহ্নিত করতে পারে না এই বিষয়টি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

ভারতের সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান কেমন ছিল সেটা দেখে নেওয়া যাক। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে রয়েছে "তুলা দণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপর দিকে স্ত্রী জাতিকে সংস্থাপন করিলে স্ত্রী জাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।"[৫৭] মহাভারতের রাজধর্ম আলোচনার সময় কাদের বাদ দিতে হবে তার তালিকা এরকম "বামন, কুব্জ, অন্ধ, খঞ্জ, ক্ষীণকায় ব্যক্তি, নপুংসক, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোক।"[৫৮] শিব পুরাণে বলা হয়েছে "মিথ্যা, সাহস, মায়া, মুর্খত্ব, অত্যন্ত লোভ, অপবিত্রতা, দয়াশূন্যতা এ সাতটি স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক দোষ"। আরও বলা হয়েছে

> "রমণীগণ যে পর্যন্ত কোন নির্জন স্থান না পায় এবং যে পর্যন্ত কোন পুরুষের সহিত বিশেষ আলাপ করিতে না পায় সে পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব থাকে। সেই হেতু ভদ্রমহিলাগণের বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক সর্বদা বিধান রক্ষা করা উচিত।"[৫৯]

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে "তাকে (নারীকে) কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে; তার স্বাতন্ত্র্য সঙ্গত নয়- "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।/রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহর্তি"(৯/৩)।[৬০] আবার ৫/১৫৫ শ্লোকে বলা হচ্ছে নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষনম্।/ পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।। "- অর্থাৎ, (পতির থেকে) স্বতন্ত্রভাবে স্ত্রীলোকের যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নেই। তিনি যে পতি সেবা করেন তাতেই স্বর্গে পূজিতা হন।"[৬১] সুতরাং এই রকম সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে থেকে যখন সাহিত্য লেখা হচ্ছে তখন মেয়েদের উন্নত/অলোকিত করে দেখানোর সুযোগ থাকছে না। বেশিরভাগ সাহিত্যেই মূল চরিত্রে আসছে ছেলেরা শিশু-কিশোর সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের কথা অনেক সময়ই উঠে এসেছে। সেই সকল রচনার নির্বাচিত কিছু সংরূপের মধ্যে দিয়ে আমরা এই গবেষণাতে দেখাতে চাই কীভাবে মেয়েবেলা নির্মিত হয়েছে।

এখানে অপর একটি বিষয় উল্লেখ্য, সেটি হল নারায়ণ সান্যাল বিরচিত ‘কিশোরী সমগ্র’-এর ভূমিকা অংশ। ভূমিকার প্রথমেই লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন ‘কিশোরী সাহিত্য’ নামক বিশেষ পরিভাষাটি তিনি কি অর্থে ব্যবহার করতে চেয়েছেন,— “আট থেকে ষোলো বছর বয়সের চঞ্চলমতি অপরিণত পাঠকদের জন্য আমরা — কথাসাহিত্যের ব্যাপারির দল — যা কিছু রচনা করি তাকে বলি: ‘কিশোর-সাহিত্য’। আমি তার স্ত্রীয়াম্-ঈপ্-এর কথা বলছি।”[৬২] শুধু তাই নয়, তিনি এর একটি শ্রেণি বিভাগও করতে চেয়েছেন — প্রথম ধারাটির নাম দিয়েছেন ‘বাল্য-সংলিপ্ত ধারা’ এবং দ্বিতীয়টির ‘তারুণ্য-সন্নিহিত ধারা’। নারায়ণ সান্যাল এই বইয়ে দেশ-বিদেশের মহীয়সী মহিলাদের জীবনী সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনিও। সম্ভবত তিনি চেয়েছিলেন বাংলা ভাষায় রচিত কিশোর-কিশোরী পাঠ্য সাহিত্যে আচ্ছাদিত থাকা মেয়েদের কথাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে। সেই সকল সাহিত্যে কিশোরীদের ‘Identification’-এর সুযোগ করে দিতে। ভূমিকায় লেখক একগুচ্ছ কিশোরীর নাম ও কাজ উল্লেখ করেছেন, যাঁরা তাঁদের কিশোরীবেলাতেই লেখিকা হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই কিশোরীদের জন্য লেখেননি। তিনি এখানে একইসঙ্গে আক্ষেপ করেছেন বাংলার সেরা শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের কাজের প্রতি, যাঁরা লেখার সময় সচেতনভাবে বা অচেতন ভাবেই কিশোরীদের কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছেন। তাই তিনি ভূমিকার শেষে বলেছেন, “আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ: নতুন করে ‘কিশোরী সাহিত্য’ রচনা কর তোমরা—নতুনযুগের উদীয়মান সাহিত্যিকের দল।”[৬৩]

ফলত আমরা দেখতে পাচ্ছি, উনিশ বা বিশ শতকের বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে চরিত্র হিসেবে প্রধান ভূমিকায় থাকা মেয়েদের সংখ্যা নগণ্য। নারী বা পুরুষ স্রষ্টা কেউই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ- নির্ধারিত ‘নারী’/ ‘মেয়ে’/ ‘কিশোরী’ -এর যে রূপকল্প, তার বাইরে গিয়ে সক্রিয় মহিলা চরিত্র নির্মাণে বিরত থেকেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে সমাজের নৈতিকতার মানদণ্ড শিশু-কিশোর সাহিত্যের মেয়ে চরিত্রের ‘হয়ে ওঠা’কেও নিয়ন্ত্রণ করছে।

তথ্যসূত্র ::

১। হীরেন চট্টোপাধ্যায়, "বাঙ্গালা শিশু ও কিশোর সাহিত্য", হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায় সম্পাদিত, 'সাহিত্য-প্রবন্ধ প্রবন্ধ-সাহিত্য', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৫৪

২। লীলা মজুমদার, "কেন ছোটদের জন্য লিখি", তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, 'লীলা মজুমদার', কলকাতা, কোরক, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৩০

৩। লীলা মজুমদার, "শিশুসাহিত্য", তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, 'লীলা মজুমদার', কলকাতা, কোরক, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৯৯-২০৫

৪। https://www.britannica.com/art/childrens-literature, on 18.12.2020 at 11.30 pm

৫। Kimberley Reynolds, *Children's Literature: A very short Introduction*, New york, Oxford University Press, 2011, p. 1

৬। Karin Lesnik-Oberstein, "Essentials: What is Children's Literature? What is Childhood?", Peter Hunt Edited, *Understanding Children's Literature*, London and New york, Routhledge, 1999, p. 16

৭। Ibid, p. 19

৮। Ibid, p. 21

৯। F. J Harvey Darton, *Children's Books in England: Five Centuries of Social Life,* Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p. 1

১০। Charlotte Huck, *Children's Literature in Elementary School*, Holt, New York, Rinehart and Winston, 1976, p. 4

১১। V Haviland, *Children and Literature: Views and Reviews*, London, Bodley Head, 1973, p. 273

১২। Karin Lesnik-Oberstein, 'Essentials: What is Children's Literature? What is Childhood?', Peter Hunt Edited, *Understanding Children's Literature*, London and New York, Routledge, 1999, p. 22

১৩। Ibid, p. 23

১৪। Natalie Babbitt, 'Happy Endings? Of course, and also joy', V Haviland Edited, *Essay in Children and Literature: Views and Reviews*, London, Bodley Head 1973 p. 24

১৫। শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, "যোগীন্দ্রনাথ সরকার", শ্রীহরি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণী', কলিকাতা, যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি, ১৯৫৪, পৃ. ৮১

১৬। Karin Lesnik-Oberstein, 'Essentials: What is Children's Literature? What is Childhood?', Peter Hunt Edited, *Understanding Children's Literature*, London and New york, Routledge, 1999, p. 24,

১৭। https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_literature#Early-modern_Europe, on 12.01.2021, at 16.19pm

১৮। https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_literature#Early-modern_Europe, on 12.01.2021, at 16.19pm

১৯। https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_literature#Early-modern_Europe, on 12.01.2021, at 16.19pm

২০। https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/the-origins-of-childrens-literature, on 10.12.2020 at 8.03 am

২১। https://www.britannica.com/art/childrens-literature/The-development-of-childrens-literature on 10.12.2020 at 11.02 am

২২। https://www.britannica.com/art/childrens-literature/Some-general-features-and-forces on 10.12.2020 at 06.35pm

২৩। *Children's Literature in Europe at the Start of the 20th Century and the Intellectual Place of Ivana Brlić-Mažuranić's Children's Story Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Hans-Heino Ewers*

২৪। Sudhir Kakar, *The Inner World*, New Delhi, Oxford University Press, 2012, p. 91

২৫। Matt Ridley, *The Agile Gene*, Great Britain, Harper Collins, 2012, 2004, p. 126

২৬। Sudhir Kakar, *The Inner World*, New Delhi, Oxford University Press, 2012, p. 63

২৭। Matt Ridley, *The Agile Gene*, Great Britain, Harper Collins, 2012, 2004, p. 59

২৮। Ibid, p. 59

২৯। Ibid, p. 60

৩০। Sudhir Kakar, *The Inner World*, New Delhi, Oxford University Press, 2012, p. 70

৩১। Matt Ridley, *The Agile Gene*, Great Britain, Harper Collins, 2012, 2004, p. 60

৩২। Ibid, p. 62

৩৩। Philippe Aries, *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life*, Robert Baldick Translated, New York, Alfred A Knopf, 1962

৩৪। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোট মেয়েরা', কলকাতা, গাংচিল, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩,

৩৫। http://plato.stanford.edu/entries/childhood/ on 15.12.2020 at 02.30pm

৩৬। http://plato.stanford.edu/entries/childhood/ on 15.12.2020 at 02.30pm

৩৭। http://plato.stanford.edu/entries/childhood/ on 15.12.2020 at 02.30pm

৩৮। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোট মেয়েরা', কলকাতা, গাংচিল, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩

৩৯। K. K Mookerjee, *Some Great Educators of the World*, Kolkata, Das Gupta and Co. Pvt. Ltd., 1972, p. 8

৪০। Ibid, p. 11

৪১। Ibid, p. 14

৪২। Ibid, p. 27

৪৩। Ibid, p. 40

৪৪। Ibid, p. 44

৪৫। Ibid, p. 55

৪৬। Philippe Aries, *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life*, Robert Baldick Translated, New York, Alfred A Knopf, 1962, p. 47

৪৭। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোট মেয়েরা', কলকাতা, গাংচিল, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৯

৪৮। তদেব, পৃ. ৭০

৪৯। https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_literature Gender roles and representation of women on 18.12.2020 at 1.10 pm

৫০। Lisa Paul, 'From Sex Role Stereotyping to Subjectivity: Feminist Criticism', Peter Hunt Edited, *Understanding Children's Literature*, London and Newyork, Routledge, 1999, p. 113

৫১। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোট মেয়েরা', কলকাতা, গাংচিল, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭১

৫২। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ১৩

৫৩। তদেব, পৃ. ১৭

৫৪। লুই হেনরী মর্গ্যান, 'এন্সিয়েন্ট সোসাইটি (প্রাচীন সমাজ, প্রথম পর্ব)', সম্পাদনা অসীম চট্টোপাধ্যায়, ভাষান্তর- অসিত চৌধুরী, অসীম চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, দীপায়ন, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২-৪০

৫৫। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ৬৭

৫৬। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড)', নতুন দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৮, পৃ. ২২৮০-২২৮১,

৫৭। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত 'মহাভারত', সারানুবাদ রাজশেখর বসু, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৬১১

৫৮। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ৭২

৫৯। তদেব, পৃ. ৭২

৬০। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা, 'মনুসংহিতা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ. ২৪৮

৬১। তদেব, পৃ. ১৬২-১৬৩

৬২। নারায়ণ সান্যাল, 'বাঙলা ভাষায় কিশোরী সাহিত্য', "কিশোরী সমগ্র", কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৯,

৬৩। তদেব, পৃ. ২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ ও বিশ শতকের নৈতিকতার মানদণ্ডে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েরা

উনিশ শতকের একেবারে শেষে, ১৮৯৯ সালে, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশিত হয়। এই বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি প্রথম এখানে 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।[১] এই উল্লেখ থেকে মনে হয় যে, এই পরিভাষা নির্মাণের পিছনে এক শতকের প্রস্তুতি কার্যকর হয়েছিল। আসলে, 'শিশুসাহিত্য' বলতে যদি ধরে নেওয়া হয় 'শিশু'দের জন্য লেখা 'সাহিত্য', তাহলে তা একটু একটু ক'রে শুরু হয়েছিল এই সময়েই। প্রাথমিকভাবে অবশ্য তা মোটেও আনন্দদান বা মনোরঞ্জনের কথা মনে রেখে শুরু হয়নি। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠন। ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। নিছক উপদেশমূলকতার সীমানা অতিক্রম করে তা হয়ে উঠেছে আধুনিক সংরূপগত অর্থে 'শিশুসাহিত্য'। এই অধ্যায়ে আমরা প্রথমে আলোকপাত করব উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ওপর। কারণ, শিশুদের জন্য যাবতীয় লেখালেখি প্রথম শুরু হয়েছিল পত্রিকার পাতাতেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যেহেতু আমাদের গবেষণার লক্ষ্য 'মেয়েবেলা' নির্মাণ, তাই উনিশ শতকের বিপুল পত্রিকার ভাণ্ডার থেকে আমরা নির্বাচন করব সেই পত্রিকাগুলিকে যেগুলি কোনো না কোনোভাবে ছোট মেয়েদের কথা তুলে ধরেছিল।

উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করার জন্য অবশ্যই দেখে নিতে হবে সেই সময়ের সমাজ-পরিস্থিতি। উনিশ শতকের বাংলার একদিকে ছিল ব্রিটিশ সরকারের শাসন-নীতি, অন্যদিকে ছিল রক্ষণশীল সমাজপতিদের দমন-নীতি। এর বিপরীতে ছিলেন একদল বিদ্রোহী, যারা এ সবের মধ্যে থেকে মানব-চেতনাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। আর, এই দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই বিভিন্ন ধারণার পাশাপাশি নির্মিত হয়েছিল মেয়েদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের ধারণা। উনিশ শতকের সমাজে সামগ্রিকভাবে মেয়েদের অবস্থান কেমন ছিল, তা না দেখে নিলে ছোটদের বইয়ে মেয়েদের কথা কীভাবে এসেছিল ও কেন সেভাবে চিত্রিত হয়েছিল- তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবেনা। সুতরাং, এই অধ্যায়ে আমরা উনিশ শতকীয় 'মেয়েবেলা'র ধারণাও আলোচনা করব সেই সময়ের প্রেক্ষিতে।

আমাদের এই আলোচনা দুটি পর্বে বিভাজিত—প্রথম পর্বে দেখানো হয়েছে উনিশ শতকীয় সমাজ-কাঠামোয় শিশুসাহিত্যে মেয়েদের অবস্থান এবং দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে বিশ শতকের চিত্র। প্রথম পর্বটি আবার দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত—প্রথম পর্যায়ে থাকবে উনিশ শতকে শিশুদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকার আলোচনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে শিশুশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থের কথা। কারণ, শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য সচেতনভাবে গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয় উনিশ শতকের একেবারে শেষ দশকে। তাই উনিশ শতকীয় শিশু-কিশোর সাহিত্যের আলোচনা মূলত পত্রিকা ও শিশুশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ—এই দুই স্তম্ভ অবলম্বন করেই আলোচিত হবে।

বাংলা সাময়িকপত্রের সূত্রপাত শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'দিগদর্শন' এর মাধ্যমে। সাল ১৮১৮। পত্রিকাটির নামপৃষ্ঠায় 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ'[২] থাকলেও এই পত্রিকায় যেসব বিষয় ছাপা হ'ত, তা থেকে মনে করা যায় যে, এটি ছিল একান্তভাবেই একটি কিশোরপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা। এমনকি, এই পত্রিকাটি পাঠ্য-পুস্তকের মতো বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিতরণ করাও হ'ত। এর পরেই 'স্কুল-বুক সোসাইটি' থেকে প্রকাশিত হয় 'পশ্বাবলী'(১৮২২), যেটি প্রথম সচিত্র 'শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র'। ১৮৩১ সালের ৩১ ডিসেম্বর কৃষ্ণধন মিত্র প্রকাশ করলেন 'জ্ঞানোদয়' নামক আর একটি পত্রিকা, যা আবার শিশুপাঠ্য হলেও এতে প্রকাশিত বিবিধ উপদেশের ধরন দেখে বোঝা যায় যে, এই পত্রিকার উদ্দিষ্ট পাঠক ছিল 'যুবা ব্যক্তিগণ'। এভাবে পুরো উনিশ শতক জুড়েই শিশু-কিশোরোপযোগী প্রচুর পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে—তার মধ্যে কয়েকটির আখ্যাপত্রে উল্লেখ রয়েছে মেয়েদের। আমরা সেই বিপুল পত্রিকার সম্ভার থেকে শুধুমাত্র সেই পত্রিকাগুলিকেই বেছে নেব।

উনিশ শতকের প্রথমভাগে প্রকাশিত কোনো শিশুপাঠ্য পত্রিকাই আলাদা ক'রে মেয়েদের কথা উল্লেখ করেনি। এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত। সেই বছর

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'অবোধবন্ধু' পত্রিকা। পরে এর স্বত্বাধিকারী হ'ন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। এই পত্রিকার 'আরম্ভ' অংশে বলা হয়েছিল,

> "...যদ্যপি বালকবালিকা কিম্বা অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের... অন্তরতম গভীরতম প্রদেশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করত দুশ্ছেদ্য ও অভেদ্য কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা বিদূরিত করে, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম ও যত্নের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে"[৩]

পত্রিকাটি শুধুমাত্র তার উদ্দিষ্ট পাঠক হিসেবেই মেয়েদের উল্লেখ করেনি, পত্রিকার নিয়মিত লেখক হিসেবে নির্বাচন করেছিল কৈলাসবাসিনী দেবী ও বামাসুন্দরী দেবীকে। এঁরা মূলত গ্রন্থ সমালোচনা করতেন 'অবোধ-বন্ধু'র পাতায়। 'বামাগণের রচনা' নামেই এখানে থাকত একটি পৃথক বিভাগ। যদিও এই পত্রিকায় প্রকাশিত গদ্য ও পদ্য সাধারণ অন্তঃপুরিকাদের পক্ষে সবসময় বোধগম্য হ'ত না, তবু ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের 'অজ্ঞানতা' দূর করার কথা ভেবে এখানে লেখা প্রকাশিত হয়েছিল বলে এই পত্রিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় 'জ্যোতিরিঙ্গন' পত্রিকা। এই পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণের নামপৃষ্ঠায় লেখা হয়, "'জ্যোতিরিঙ্গন' স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত মাসিকপত্র"। 'ভূমিকা' অংশেও এর প্রচারিত হওয়ার কারণ হিসেবে নির্দেশ করা হয়, "... বালক-বালিকা ও স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত পত্রিকাখানির প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম"[৪]। সুতরাং, এই সচিত্র পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল 'আমোদ-সহকৃত নীতিশিক্ষা' প্রদান—বালকসহ বালিকাদেরও।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ১৮৭৮ সালে সচিত্র বালকপাঠ্য পাক্ষিক পত্রিকা 'বালকবন্ধু' প্রকাশ করে। উনিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্রিকার জগতে এই পত্রিকার অবদান প্রচুর। এর সম্পাদক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। প্রায় প্রতি সংখ্যায় স্কুলের ছাত্ররা এই পত্রিকায় লিখত, কবিতা অনুবাদ করত। কিন্তু কোনো মেয়ের লেখা সেখানে প্রকাশিত হয়নি, যদিও ততদিনে

কলকাতায় মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছিল। উনিশ শতকীয় সমাজ-প্রেক্ষাপটে মেয়েদের সামগ্রিক পরিস্থিতি কীরকম ছিল, তা বিশ্লেষণ করলে এই অসাম্য কেন তৈরি হয়েছিল, সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত প্রমদাচরণের সম্পাদনায় 'সখা' প্রকাশিত হয়; কিন্তু তার অকালমৃত্যুর পর ১৮৮৬ সালের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৮৮৭ সালে এটি পরিচালনা করেন অন্নদাচরণ সেন, এবং, তারপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয় নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ওপর। ১৮৯৩ সালে ভুবনমোহন রায় প্রকাশ করলেন 'সাথী' পত্রিকা, ১৮৯৪-এ তাকে জুড়ে দিলেন 'সখা'র সঙ্গে। তাই নতুনভাবে পরের পত্রিকাটি প্রকাশিত হ'তে শুরু করল 'সখা ও সাথী' নামে। এই 'সাথী'র প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় কার্যাধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, "বালক-বালিকাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষাই সাথীর লক্ষ্য"[৭] । এর প্রথম সংখ্যায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার তার 'আবাহন' নামক ছড়ায় লিখেছিলেন, "কোথা আছ/ ভাইটি আমার কোথা আছ বোন/ আয় ছুটে /আয় শোনরে এসে সাথীর আবাহন"[৮]। 'সাথী' এককভাবে এবং যৌথভাবে, উভয়ভাবেই ছোট মেয়েদের তাদের পত্রিকা-পরিবারের অন্তর্গত করে ফেলেছিল, অন্তত পাঠক হিসেবে।

উক্ত দুটি পত্রিকার প্রকাশের অন্তর্বর্তী কালপর্বে বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮৮৩ সালে ঢাকা থেকে অক্ষয়কুমার গুপ্তের সম্পাদনায় 'বালিকা' পত্রিকা, ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়' থেকে ঐ বছরেই প্রকাশিত 'সুনীতি' পত্রিকা এবং রেভারেন্ড জে ই পেন-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বাল্যবন্ধু' পত্রিকা। এগুলির মধ্যে শেষ পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল "এতদ্দেশীয় বালক-বালিকাদের মধ্যে খ্রিষ্টতত্ত্ব প্রচার"[৯]। 'বালিকা' সম্পর্কে এরকম কিছু জানা না গেলেও এর নামটি থেকে অনুমান করা যায় যে, পত্রিকাটি বালিকা-কেন্দ্রিক ভাবনাকে অবলম্বন ক'রেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'সুনীতি'র মাত্র একটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল এবং "বালক ও যুবকবৃন্দের

হৃদয়ে আর্য্য রীতিনীতির প্রবর্তনা ও আর্য্যভাবের উদ্দীপনা" জাগানোর উদ্দেশ্যেই ছিল এর লক্ষ। বোঝা যায়, এরকম গুরুগম্ভীর বিষয়ে মেয়েদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ বলেই মনে করেছিলেন সম্পাদক।

বাংলা শিশু-কিশোর পত্রিকা জগতের প্রথম মহিলা সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ১৮৮৫ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'বালক' পত্রিকা। গ্রন্থ-সমালোচনা, নাটক, ভ্রমণসাহিত্য, দেশ-বিদেশের 'খবরাখবর' ইত্যাদির পাশাপাশি এই পত্রিকায় বালক-বালিকার রচনাও স্থান পেত। এদিক দিয়ে পত্রিকাটি ছিল অপরাপর পত্রিকার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

১৮৯৫ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রকাশ করলেন 'মুকুল' পত্রিকা। দ্বিতীয় সংখ্যার শুরুতেই তিনি লিখেছিলেন, "মুকুল সম্পূর্ণরূপে ছোট শিশুদের জন্য নহে। যাহাদের বয়স ৮/৯ হইতে ১৬/১৭র মধ্যে, ইহা প্রধানত তাহাদের জন্য"।[১০] এখানে দেখা গেল, উদ্দিষ্ট পাঠকদের একটি বয়সসীমার উল্লেখ করা হ'ল, কিন্তু সামাজিক লিঙ্গপরিচিতির বিষয়টি উহ্যই রাখা হ'ল। এদিক দিয়ে পত্রিকাটি সাবালকত্বের দাবিদার।

এর পরে, উনিশ শতকের একেবারে শেষ পর্বে, ১৮৯৮ সালে, রাজেশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় 'অঞ্জলি' নামক একটি শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্রিকাও 'বালক-বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত' করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু খগেন্দ্রনাথ মিত্র মনে করেন পত্রিকাটির রুচিগত ত্রুটির কারণে তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

অতএব, উনিশ শতকে প্রকাশিত শিশু উপযোগী পত্রিকার সামগ্রিক আলোচনা থেকে এই বিষয়টি বোঝা গেল যে, খুব অল্প সংখ্যক পত্রিকাই বালিকাদের পাঠকের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল। কয়েকটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা ছাড়া কোথাওই মেয়েদের বিষয়ে কোনো লেখা সেভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায় নি। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সখা', 'বালক', 'সাথী',ও 'মুকুল' অগ্রগণ্য। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় পর্বে এই লেখাগুলি প্রয়োজন অনুসারে বিশ্লেষণ করা হবে।

উনিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, 'বালক'দের তুলনায় 'বালিকা'রা সেখানে সবসময়েই বেশ পিছিয়ে ছিল। এবারে দেখে নেওয়া যেতে পারে যে, উনিশ শতকের শিশুদের জন্য যে সমস্ত বই লেখা হচ্ছিল, সেখানে মেয়েদের কথা আলাদা ক'রে আদৌ ভাবা হয়েছিল কিনা। শিশু-উপযোগী গ্রন্থপ্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে বিষয়গত দিক দিয়ে বইগুলিকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

১। শিশুশিক্ষামূলক গ্রন্থ বা প্রাইমার

২। নীতিকথাধর্মী বই

৩। অনুবাদধর্মী বই

৪। মৌলিক গ্রন্থ

এছাড়া, আরও ছিল ইতিহাসের বই, দেশাত্মবোধ জাগ্রতকারী বই, মহাপুরুষদের জীবনীগ্রন্থ, ভূগোল-বিজ্ঞান-গণিত-ব্যাকরণ বই, অভিধান, ধর্মমূলক গ্রন্থ, এমনকি, পাঠ্যপুস্তকের সহায়িকা গ্রন্থ! প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলিতে আলোকপাত করা যেতে পারে।

বাংলা ভূখণ্ডে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হয় উনিশ শতকের গোড়াতেই। উনিশ শতক থেকে শিশুসাহিত্য হিসেবে যেসমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তাকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা যেতে পারে — ১) স্কুল-বুক সোসাইটি যুগ খ) বিদ্যাসাগর যুগ গ) বিদ্যাসাগরোত্তর যুগ। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ সালের ৪ জুলাই 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেখান থেকেই বালক-বালিকাদের জন্য নানা গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই বইগুলির অধিকাংশই ছিল বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। এই সোসাইটির উদ্দেশ্যই ছিল— "Preparation, publication, and cheap or gratuitous supply of works useful in schools and semineries of learning"[১১]। বাংলা গদ্যে 'বিদ্যাসাগর যুগ' আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত এই সোসাইটি থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল শিশু উপযোগী গ্রন্থাবলি।

পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার আগে আমরা সংক্ষেপে দেখে নেব 'স্কুল বুক সোসাইটি' থেকে নীতিকথাধর্মী কী কী বই প্রকাশিত হয়েছিল এবং সামগ্রিকভাবে সেখানে মেয়েদের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছিল। রাধাকান্ত দেব বিরচিত 'নীতিকথা' এই সোসাইটির প্রথম উপদেশমূলক বই, যেখানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে 'বিদ্যাভ্যাস' দ্বারা বিদ্বান হয়ে ওঠার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এরপর, ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয় তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস', যার নামপৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছিল, "বালকদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান"[১২]। এই বইয়ে গল্পচ্ছলে উদারতা, অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম, অসূয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে যুবকদের প্রতি উপদেশ দেওয়া হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নীতিজ্ঞান গ্রহণ করার আধার হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে মেয়েরা ছিল ব্রাত্য।

১৮২০ সালে 'শ্রীরামপুরের নিবন্ধকর্ত্তারদের' দ্বারা পূর্ব-প্রকাশিত 'হিতোপদেশ'-এর সঙ্গে রামকমল সেন কর্তৃক সংগৃহীত 'হিতোপদেশ' সংযুক্ত অবস্থায় প্রকাশিত হয়। এর মুখবন্ধে উল্লিখিত 'লোকেরদের হিত প্রবোধের জন্যে' বাক্যাংশ প্রমাণ করে যে, বইটি 'সর্ব্বসাধারণ'-এর উদ্দেশ্যেই লিখিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটি একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। কয়েকবছরের ব্যবধানে এই সোসাইটি থেকে বেশ কিছু 'নীতিকথা' মূলক বই প্রকাশিত হয়, যেমন, 'জ্ঞানাঙ্কুর' (১৮৩৬), গোপাললাল মিত্রের 'জ্ঞানচন্দ্রিকা' (১৮৩৮), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'নীতিদর্শন' (১৮৪০), গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'জ্ঞানপ্রদীপ, ১ম খণ্ড'(১৮৪০) ইত্যাদি। এই সবক'টি বইয়েরই মূল উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক চরিত্র গঠন ও তারও উদ্দিষ্ট পাঠক ছিল 'বালক' বা 'যুবক' বৃন্দ।

উক্ত সময়পর্বের পরবর্তী পঁচিশ বছর বাংলা শিশুসাহিত্য ছিল অনুবাদমূলক। তাই সেখানে মেয়েদের কথার স্বতন্ত্র পরিসর থাকা সম্ভবপর ছিল না। 'স্কুল বুক সোসাইটি'র পরে আরম্ভ হয় 'বিদ্যাসাগরের যুগ' (১৮৪৭-১৮৯১)। বিদ্যাসাগর বাংলা শিশুসাহিত্যকে পূর্ববর্তী জড়তা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই যুগের সূচনা তাঁর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' দিয়ে। এরপর তিনি পরপর লেখেন 'কথামালা', 'জীবনচরিত', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী'। ১৮৫১ সালে

প্রকাশিত হয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'নীতিবোধ', ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'নীতিরত্ন', ১৮৫৬ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ লেখেন 'নীতিসার ১ম, ২য় ও ৩য়', ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'নবনীতিসার', ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় 'নীতিমালা' এবং ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'উপদেশমালা ১ম ও ২য়'। বলা বাহুল্য এখানে কোথাওই মেয়েদের কথা আলাদা করে আসেনি।

উক্ত পর্বে মূলত এই বইগুলিকেই আমরা পাচ্ছি নীতিকথাধর্মী বই হিসেবে। এগুলির মধ্যে 'নীতিরত্ন'-এর ভূমিকায় উল্লেখ করা হয় যে, বইটি "...বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোকাদি সকলের পাঠযোগ্য হইবে..."[১৩], 'নীতিমালা'র বিজ্ঞাপনে বলা হয়, "বালক-বালিকার সুখ বোধের জন্য পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল করিতে বিশেষ প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে"[১৪] এবং, 'উপদেশমালা' রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, "আমি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার্থ পদ্যে কতকগুলি নীতিবাক্য সংগ্রহ করিয়া উপদেশমালা নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম।"[১৫] সুতরাং বোঝা যায়, আনুপাতিক বিচারে একেবারে নগণ্য হলেও কয়েকজন বিচক্ষণ লেখক বালকদের পাশাপাশি বালিকাদেরও গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিলেন এই পর্যায়ে।

নীতিকথামূলক বই-এর পরে আলোকপাত করা যাক শিশুশিক্ষা বিষয়ক বই বা প্রাইমারগুলির দিকে। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'স্কুল বুক সোসাইটি' যে প্রাইমার প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিল, সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৮২১ সালে এই সোসাইটি থেকেই প্রকাশিত হয় 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ', লেখক রাধাকান্ত দেব। এই বইটিতে বাংলা বর্ণমালা, বানান, উচ্চারণ, প্রবন্ধ, ব্যাকরণ, ইতিহাস, গণিত ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। বইটি লেখাও হয়েছিল 'প্রাচীনকালের পাঠশালার ব্যবহার্য্য', অর্থাৎ ছোট শিশুদের জন্য। কিন্তু এর পরেও এই বইতে ঋতুবর্ণনায় স্ত্রীজাতির দৈহিক পরিবর্তনের কথা লেখা হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় আরো একটি শিশুপাঠ্য বই 'বঙ্গীয় পাঠাবলী (চতুর্থ ভাগ। বইটি প্রকাশ করেছিল ১৮৫৪ সালে স্থাপিত 'কলিকাতা খ্রিষ্টান স্কুল বুক

সোসাইটি’। এই বইটিও প্রকাশ করা হয় ‘বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত’। কিন্তু এখানেও ঋতুবর্ণনায় যৌনবিষয় সম্পর্কিত কিছু বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। উনিশ শতকের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল বলেই শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে লিখিত ‘নীতিকথা, ১ম ভাগ’-এও ব্যবহৃত হয়েছিল ‘বেশ্যা’, ‘গণিকা’, ‘কামান্তক’, ‘মদোন্মাদিনী’ ইত্যাদি শব্দ। শিশুশিক্ষার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই এই শব্দগুলির সরাসরি কোনো যোগ থাকা সম্ভব নয়।

উনিশ শতকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিজ্ঞান বিষয়ক বই লেখার একটি ধারা লক্ষ করা যায়। ১৮৫৮-৫৯ সালে প্রকাশিত হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’, সাতকড়ি দত্তের সচিত্র ‘প্রাণীবৃত্তান্ত’। ‘পশ্বাবলী’ প্রকাশিত হয়েছিল এর ৩৫ বছর আগে। প্রাণীবিজ্ঞান নিয়ে ছোটদের জন্য আর কিছুই লেখা হয়নি এই দীর্ঘ সময়ে। এই বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাই যথেষ্ট। কিন্তু এই বই-এর ভূমিকাতেও লেখা হল, “সুকুমারবুদ্ধি বালকদিগের পক্ষে সহজ হইবে এ নিমিত্ত অতি সরল ভাষায় লিখিতে অনেক প্রয়াস পাইয়াছি”[১৭] । বালিকাদের কথা কোথাও উল্লেখ করা হল না। ঐ বছরেই, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় লেখেন ‘জীবরহস্য প্রথম ভাগ’। এই বইটির ভূমিকায় দেখা গেল মেয়েদের বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গুরুত্ব পেল—“পাঠশালার বালক-বালিকাগণের ব্যবহারোপযোগী উদ্ভিজ্জ ও জীবরহস্য পুস্তক করা...(খণ্ডিত) বিশেষ... প্রয়োজন হইয়াছে”[১৮]। এরপরেই আমরা উনিশ শতকে স্ত্রী শিক্ষার আলোচনায় দেখব, মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে নির্মিত সিলেবাসে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কিনা, এ নিয়ে বিদ্বৎসমাজের বিতর্ক।

বাংলা প্রাইমারের আলোচনায় স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের পরিসর দাবি করে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা’, অক্ষয়কুমার দত্তের ‘চারুপাঠ’ এবং বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ এবং, ‘শিশুসেবধি’। কালানুক্রম লঙ্ঘন করে প্রথমে বলা যাক অক্ষয়কুমার দত্তের ‘চারুপাঠ’-এর কথা। ১৮৫২ সালে ‘চারুপাঠ ১ম ভাগ’ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ তে বেরোয় এর দ্বিতীয় ভাগ

এবং ১৮৫৮ সালে বেরোয় ‘চারুপাঠ ৩য় ভাগ’। এতে প্রকাশিত অধিকাংশ লেখাই ছিল বিজ্ঞান-বিষয়ক। সাবলীল ভাষা ও বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশের কারণে বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এর প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, “...বালকদিগের পাঠোপযোগী দুই-একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিলে, অনেক উপকার দর্শিতে পারে, এই বিবেচনায় চারুপাঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি”[১৯] এবং দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে বলা হয় “ভাষা শিক্ষা সহকারে প্রাকৃত পদার্থ ও প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করা বালকগণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক”[২০]— এই দুটি বিজ্ঞাপনেই আলোকপাত করা হয় শুধুমাত্র বালকদের ওপর। অথচ, তিনি নারীমুক্তির পক্ষেই সরব হয়েছেন বারবার। ১৮৪২ সালে প্রকাশিত ‘বিদ্যাদর্শন’ পত্রিকায় তিনি বহুবিবাহ নিবারণের পক্ষে এবং কৌলীন্য প্রথার বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে লেখা প্রকাশ করেন। শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত টেনে তিনি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে কলম ধরেন। ১৭৬৮ শকের ১ কার্তিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি বলেন,

> “এ দেশীয় স্ত্রীদিগের অজ্ঞান তাহারদিগের স্বীয় দুঃখ, স্বামির যন্ত্রণা, সন্তানের দুর্ভাগ্য প্রভৃতি প্রচুর অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। যতকাল এই ভারতবর্ষীয় অবলারা বিদ্যার আলোকপ্রাপ্ত না হইবে এবং তদ্দ্বারা সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম অধিকারিণী না হইবে, ততকাল সম্যকরূপে এদেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই”[২১]

আক্ষেপের বিষয়, অক্ষয়কুমার দত্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এতটা সচেতন হওয়ার পরেও তাঁর প্রাইমারেও মেয়েদের পরিবর্তে ছেলেরাই গুরুত্ব পেয়েছিল।

পরবর্তী আলোচ্য বই ‘শিশুসেবধি’। ১৮৩৯ সালে হিন্দু কলেজ পাঠশালা স্থাপিত হলে সেই পাঠশালার শিশুদের বর্ণশিক্ষার উদ্দেশ্যে এই নতুন প্রাইমার লিখিত হয়। এটি একটি সিরিজ। এই সিরিজের প্রাপ্ত বইগুলি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন শ্রী আশিস খাস্তগীর, ‘বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)’ নামে। এখানে, আমরা সেই বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করতে চাই, যেখানে মেয়েদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ‘দুই পদে ঊহ্যক্রিয় বাক্য’ শেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ‘শক্ত ঊরু’, ‘বন্ধ্যা ভার্য্যা’, ‘সুশ্রী কন্যা’—এই শব্দবন্ধ[২২]। ‘তিন পদে ঊহ্যক্রিয়া বাক্য’ শেখাতে এসেছে ‘সতী সাধ্বী রাণী’[২৩] শব্দবন্ধ। এই শব্দবন্ধ নিশ্চয়ই নিছক শিক্ষার্থে

ব্যবহৃত হয়নি। সুকুমারী ভট্টাচার্য 'সতী' ও 'সাধ্বী' শব্দটিকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও পৌরাণিক আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে হারীত সংহিতার সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে, সে তার, পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে"। অর্থাৎ, সে-ই হল 'সতী'। তিনি আরো বলছেন,"'সতী'র প্রতিশব্দ হল 'সাধ্বী' এবং 'সতী' শব্দের কোনো পুংলিঙ্গবাচক শব্দ নেই। 'সৎ' অর্থে ভাল। যদি কোনো নারী সারাজীবন পবিত্র এবং ভাল থেকে থাকে তবু মৃত স্বামীর জন্য আত্মহননে অস্বীকৃত হলেই সে হয়ে যায় মন্দ—অসতী, অসাধ্বী"।[২৪] অর্থাৎ, শিশুকে শব্দের সঙ্গে পরিচয় করানোর সময়েও ক্রিয়াশীল থাকছে লিঙ্গ অসাম্যের বোধ। 'বন্ধ্যা ভার্য্যা' শব্দটিও নারীর প্রান্তিক পরিচিতিই বহন করে—যার সঙ্গে শিশুর শব্দভাণ্ডারের উৎকর্ষ সাধনের কোনো যোগসূত্র নেই। শব্দের সামাজিক প্রয়োগক্ষেত্রকেও একেবারেই অস্বীকার করা যায় না[২৫]। এই প্রবণতার আরো একটু বিস্তার আমরা দেখতে পাব 'বর্ণমালা/দ্বিতীয় সঙ্খ্যা' তে। এখানে প্রাথমিক শব্দশিক্ষার সময়ে শিশুদের শেখানো হচ্ছে 'কামিনী', 'গণিকা', 'গর্বভিনী', 'ঋতুমতী' 'ভোগবতী' 'রজস্বলা' 'সর্ব্বংসহা' 'স্ত্রীধর্ম্মিনী' 'সীমন্তিনী' প্রভৃতি শব্দ। 'সকারভেদ' বোঝাতে এসেছে 'সিন্দুর' 'সংসার' 'স্বামী' শব্দসমূহ[২৬]। শিশুর শব্দভাণ্ডার গঠনের ক্ষেত্রে উক্ত শব্দসমূহের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিতভাবেই প্রশ্ন তোলে। 'Calcutta School Book Society's Press' থেকে প্রকাশিত 'বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগ' শুরু হয় শিশুকে বাক্যগঠন শেখানোর মধ্য দিয়ে। সেক্ষেত্রে নীতিমূলক বাক্যের উদাহরণই মূলত পাওয়া যায়। এই বই এর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রকরণের একটি বাক্য আমরা বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। বেশ কয়েকটি নীতিবাক্যের পর শিশুকে শেখানো হচ্ছে, "যে বালকের পিতা ধার্ম্মিক ও গুণী তাহার ভাগ্য ভাল"[২৭]। লক্ষণীয়, নীতিবাক্যের উদ্দিষ্ট শিশুটি অবশ্যই 'বালক', এবং তার 'ভাগ্য ভাল' হওয়ার পেছনে তার 'মাতা'র কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে করেননি নীতিবাক্য প্রদানকারী সমাজপতিরা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একচেটিয়া আধিপত্য সে যুগে বিস্তৃত হয়েছিল প্রাইমারের জগতেও[২৮]।

এবারে আলোচনা করা যাক 'শিশুশিক্ষা'র বিষয়ে। ১৮৪৯-৫০ সালে এই বইটির ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ প্রকাশিত হয়। বইটির আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছিল, 'এতদ্দেশীয় বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ'। ১৮৪৯ সালে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মদনমোহন তাঁর দুই শিশুকন্যাকে সেখানে পড়াতে উদ্যোগী হন এবং সেই স্কুলের ছাত্রীদের জন্যই তিনি এই বই রচনা করেন। বেথুন সাহেবকে লেখা মদনমোহনের চিঠির কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—"...প্রথমপাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথা নিয়মে স্বদেশ ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম"[২৯]। সমস্ত দিক দিয়েই এই প্রাইমার ছিল পূর্ববর্তী প্রাইমারগুলির চেয়ে আলাদা। শিশুদের প্রাথমিক বর্ণ-পরিচিতির পাঠ অতিক্রম করে যখন লেখক শিশুর শব্দভাণ্ডার তৈরির জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, তখন দেখা গেছে সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'বালিকা' শব্দটি, কিন্তু কোনো লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দ বা শিশুর ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় নয় এমন কোনো শব্দ এই পাঠে স্থান পায়নি। আদর্শ পড়ুয়ার নির্ধারিত মডেল তৈরি করা হয়েছে এখানে। 'বড় সুখে থাকা'র শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তিনটি নীতিবাক্য—"পিতার কথা শুনিবে/মাতার কথা শুনিবে/সদা পাঠ করিবে"[৩০]। শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে মাতাও গুরুত্ব পেয়েছেন, এই বিষয়টি পূর্বে প্রত্যেকেই এড়িয়ে গিয়েছিলেন, একইভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল 'বালিকা' শব্দটি। এই বইটি শেষ হয়েছে শিশুর সামাজিক শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা, তার পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতার পাঠ প্রদানের মধ্য দিয়ে। এর শেষ কবিতা প্রবাদপ্রতিম 'প্রভাত বর্ণন', যেখানে প্রথম শিশুশিক্ষার গণ্ডিতে রোমান্টিক নিসর্গ-বর্ণনা পাওয়া যায়[৩১] । সুতরাং, সামগ্রিকভাবেই মদনমোহনের এই উদ্যোগ ছিল ব্যতিক্রমী।

'শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ'-এর মুখবন্ধে মদনমোহন সংযুক্ত অক্ষর শেখানোর সময় শিশুদের 'অসুখ' ও 'বিরাগ' দূরীকরণের জন্য এক একটি উপদেশবাক্য জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি আরো চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই প্রচেষ্টা ছিল 'সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের' জন্য। এই উপদেশবাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে শেষ বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'স্ত্র'-এই সংযুক্ত বর্ণ-এর প্রয়োগবাক্যটি ছিল 'স্ত্রী লোকের বিদ্যাশিক্ষা করা আবশ্যক'[৩২]। এই বাক্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্ত্রীশিক্ষা তৎকালীন সমাজে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল এবং এই প্রাইমারে বালিকা-শিক্ষা পৃথক গুরুত্ব পেয়েছিল।

'শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ'-এ '...অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল'—এই কথা জানাচ্ছেন মদনমোহন, মুখবন্ধে। এই 'ঋজুপাঠ'-এ প্রথম থেকেই নানা 'সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান'-এর মাধ্যমে যথার্থ আদর্শ শিশু কেমন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে পাঠ দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। 'শিশুশিক্ষা-৩' –এর প্রথম সংস্করণের (১৮৫০) প্রথম 'ঋজুপাঠে'র শিরোনাম 'সুশীল শিশুকে সকলে ভাল বাসে' আর, পঞ্চম 'ঋজুপাঠে'র শিরোনাম 'সুশীল বালক বালিকা সকলকে সমান ভাল বাসে'। এইরকম নামকরণই প্রমাণ করে যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই শিশুর 'সুশীল' হয়ে ওঠার মান্যায়ন (standardization) তৈরি করে চলেছিল বিদ্যোৎসাহী সমাজ। এই প্রসঙ্গেই লেখক এনেছেন 'ঘোষালদের বাড়ির সামা বামার' কথা। এরা দুজনে রূপবতী ও গুণবতী। একে অপরের প্রতি বা অন্যের প্রতি কোনো বিরূপ ভাব পোষণ করে না, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সম্পর্কে তারা আবদ্ধ। স্বাস্থ্যবিধিবিজ্ঞানে তারা সচেতন ও সতর্ক। সৌজন্যের প্রতিমূর্তি এরা ভাষাব্যবহারে অত্যন্ত পরিশীলিত ও মার্জিত। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে, "এরা ভদ্র ঘরের সন্তান—'ভদ্রঘরে'র মানানসই 'ভদ্রতা' এদের বাকআয়ত্ত বলেই এরা আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল"[৩৩]। এই প্রথমবার কোনো একটি প্রাইমারে আদর্শ হিসেবে নির্মাণ করা হ'ল মেয়েদের—নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অবাক লাগে এই বইটির পঞ্চদশ সংস্করণটি দেখে। ১৮৬০ সালের এই সংস্করণে সামা-বামা

অন্তর্হিত হয়ে রাম-শ্যাম হয়ে যায় এবং তাদের আচরণসমূহেরও পরিবর্তন ঘটে লিঙ্গ বৈষম্যজনিত কারণে। যেহেতু এই বইটি 'বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে' রচিত হয়েছিল, সেহেতু এহেন 'লিঙ্গগত সংবদল'-এ বিস্ময় জাগে, কিন্তু এই বদলের কারণ অজ্ঞাত বলে তা আর বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়না।

পরবর্তী আলোচ্য বই অবশ্যই হওয়া উচিত ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৮)। স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রভূত অবদান থাকলেও 'বর্ণপরিচয়' বালিকা-ভূমিকা বর্জিত প্রাইমার। তাই এক্ষেত্রে 'বর্ণপরিচয়' বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল না।

উনিশ শতকের প্রাইমারে চরিত্র হিসেবে যাদের চিত্রিত করা হয়েছিল বা যাদের জন্য মূলত প্রাইমার লেখা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল বালকদের প্রাধান্য। 'শিশু' ছিল বালকের নামান্তর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু প্রাইমার সেই সময় লিখিত হয়েছিল, যেখানে নামকরণ থেকে শুরু করে উদ্দিষ্ট পাঠক সবক্ষেত্রেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল বালিকাদের। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত 'বালিকা বান্ধব' বইটির বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, (লেখক অজ্ঞাত), "ইতিমধ্যেই বালকগণের প্রথম পাঠোপযোগী অনেক পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু বালিকাগণের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না।... যাহাতে সুকুমারমতি বালিকাগণের চিত্তক্ষেত্রে প্রথমাবস্থা হইতেই ধর্ম্মের বীজ রোপিত, পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপিত এবং তাহাদের চিরপরিচিত কুসংস্কারসকল নিরাকৃত হয় তাহাও ইহার এক প্রধান লক্ষ্য"[৩৪] । ১৮৭৪ সালে ঢাকার গিরিশ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় 'বালাবোধ-১', ১৮৭৯ সালে দ্বারকানাথ বসুর লেখা 'বালিকাশিক্ষা-১' প্রকাশিত হয় কলকাতার বাল্মীকি প্রেস থেকে। এই বইটি লিখিত হয় স্ত্রী শিক্ষার জন্য। এছাড়া বালিকাদের জন্যই লেখা হয় 'বালাবোধিনী-১' (১৮৮৯), লেখক যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লেখেন 'বালিকাশিক্ষা-১/২' (১৮৯৪), তারাকুমার কবিরত্ন লেখেন 'হিন্দু বালিকা শিক্ষা' (১৮৯৬), বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী লেখেন 'বালিকারঞ্জন-১'। এই সমস্ত বইয়ের প্রকাশিত কপির সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায় স্ত্রীশিক্ষার

প্রসার ঘটতে শুরু করেছে ততদিনে এবং মেয়েদের কথাও ভাবতে শুরু করেছে চিন্তাশীল বিদ্বৎসমাজ।

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের কলমেও উনিশ শতকীয় প্রাইমারে মেয়েদের কথা উঠে এসেছিল। বালিকাদের জন্য প্রথম প্রাইমার লেখেন কামিনীসুন্দরী দেবী। ১৮৬৮ সালে তাঁর 'বালাবোধিকা' প্রকাশিত হয়। তিনি ছিলেন একাধারে প্রথম মহিলা নাট্যকার ও মহিলা প্রাইমার লেখিকা। তাঁর বইয়ের পাঁচটি অধ্যায়ে গল্পের মাধ্যমে বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষা ও সুনীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। বইটির বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছিলেন, "এক্ষণে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।...কিন্তু আমিও এই বালাবোধিকা সামান্য গ্রন্থ খানি লিখিলাম ইহা পাঠ করিলে বালিকাগণের অবশ্যই বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ জন্মিবে... কেন না ইহাতে বালিকাদের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে"[৩৫] । এই কাজে উৎসাহ দিতে ১৮৭৭ সালে এগিয়ে আসেন প্রতুলকুমারী দাসী, লেখেন 'বালিকা বোধিকা-১'। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (জুন,১৮৮৪) এই বইটি সম্পর্কে লিখেছিল যে, "বইখানিতে গুণপনা আছে এবং ইহা বালিকাদিগের শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে"[৩৬]। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয় সরোজিনী দেবীর 'বালিকা শিক্ষাসোপান ১,২'। ব্রহ্মময়ী রায়ের 'বর্ণবোধ-১' (১৮৮৪), চারুবালা দেবীর 'টুকটুকে বই'(১৯০০) এবং একমাত্র মুসলমান লেখিকা হলিমন্নেষা খাতুনের 'সরল আদিশিক্ষা'(১৮৯৫) ছিল ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্যই লিখিত বই।

উক্ত বইগুলির মধ্যে কামিনীসুন্দরী দেবীর 'বালাবোধিকা প্রথম ভাগ' সবথেকে উল্লেখযোগ্য। এই বইতে লেখিকা উল্লেখ করেছেন ঘোষেদের বাড়ির বরদা ও ঘোষালদের বাড়ির সারদার। বরদা 'সুশীলা ও সুবোধ' আর সারদা 'মন্দ-মনা মুখরা'। বরদা সুশিক্ষিতা, পরোপকারিণী, সুভাষিণী ও বিনয়ী। এর বিপরীতে সারদা কটুভাষিণী ও অমার্জিত। বোঝা যায়, এর আগে গোপাল ও রাখাল — এই দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের যে archetype তৈরি হয়েছিল, বরদা ও সারদার মধ্যে তারই feminine প্রতিরূপ তৈরি করা হয়। আদর্শ বালিকা

কেমন হওয়া উচিত, কোন আচরণ আদপে পরিত্যজ্য, তা বোঝানোর জন্য বরদা চরিত্র নির্মাণ এবং তার বিপরীত দর্পণে সারদা চরিত্রের সৃষ্টি — 'সারদা কিছুই পাইল না' -- এই বাক্য অমোঘ নির্দেশের মত কাজ করেছে শিশুমনে।

'বালাবোধিকা'র দ্বিতীয় পাঠে লেখিকা প্রথম পাঠের বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত 'বালিকাদিগের স্বভাব' বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা স্পষ্ট করেছেন। 'বাডুয্যেদের রাজলক্ষ্মীর মা' এই পাঠের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তাঁর অনুভব তুলে ধরেন লেখিকা — স্বামী সোহাগিনী হওয়া আর মুখের কথা নয়; ইংরেজিতে শিক্ষিত 'পণ্ডিত' 'সভ্য' ছেলেদের 'মনে ধরিবে' সেই বউ, যে শুধু 'সুশীলা' নয়, 'শিক্ষিত'ও। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় 'বালাবোধিকা' দ্বিতীয় পাঠের মূল বক্তব্যটিকে সরলীকৃত করেছেন এইভাবে — "সিদ্ধান্ত অতএব: জ্ঞানবান স্বামীর বাক-অভয়া অথচ নম্র-কম্রতায় গুণবতী স্ত্রী হতেই মেয়েদের বসতে হবে 'সর্ব্বদা সভয়' শিক্ষার তপশ্চর্যায়"[৩৭]।

কামিনীসুন্দরী দেবী 'বালাবোধিকা' তৃতীয় পাঠে পরিষ্কার জানিয়ে দেন আদর্শ মেয়ের প্রতিচ্ছবি—

> "দেখ যে বালিকা সর্ব্বদা লেখাপড়া করে সে অতি ধীর হয়। অবোধ বালিকাকে বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ছেলে কখনই বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। যে যেমন তার বরও তেমনি উপযুক্ত হয়"। সমাপ্তিবাক্যে লেখিকা নির্দেশ দেন — "অতএব সকল বালিকারই বরদার মত হওয়া উচিত সারদার মত হওয়া উচিত নয়"[৩৮]

'বর্ণপরিচয়'-এর ১৩ বছর পরে প্রকাশিত হলেও বোঝা যায় এই বাক্যটি 'সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত' এবং 'কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়' — এই বাক্যদুটির প্রভাবে লিখিত; কিন্তু, লক্ষণীয়, গোপাল বা রাখালের চরিত্রের আদর্শায়নের প্রশ্নে 'বিবাহ' কোনো আলোচ্যক্ষেত্র (issue) হয়ে ওঠেনি, অথচ, বরদা বা সারদার চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে 'শিক্ষা' এসেছে 'বিবাহে'র দোসর হিসেবে।

এই পর্যন্ত আলোচনার পর আমরা দেখতে পেয়েছি যে, উনিশ শতকে প্রাথমিকভাবে বালিকাদের মনোরঞ্জনার্থে কিছুই লেখা হয়নি। নির্বাচিত কিছু পত্র-পত্রিকা পাঠক হিসেবে বালিকাদের গুরুত্ব দিয়েছিল, যদিও সেই সংখ্যাটি বালকদের তুলনায় ছিল নিতান্ত স্বল্প। সেই সময় 'শিশু' বলতে বোঝানো হত বালকদের। শিশুদের জন্য আর যা কিছু লেখা হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে শিশুশিক্ষামূলক বই লক্ষ করে দেখা গেছে সেখানে কোথাও মেয়েদের উপেক্ষা করা হয়েছে, কোথাও এমন কিছু শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে যা একান্ত মেয়েলি, কোথাও আদর্শ মেয়ের প্রতিরূপ নির্মাণের পরও তা মিটিয়ে ফেলা হয়েছে, কোথাও আবার মেয়েদের পুরুষের উপযোগী হিসেবে গড়ে উঠবার পাঠ দেওয়া হয়েছে। বালকদের বিপরীতে বালিকাদের এই বিচিত্র অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য উনিশ শতকের সমাজে মেয়েদের সামগ্রিক অবস্থান এবং স্ত্রীশিক্ষার সামূহিক পরিসরটি বিশ্লেষণ করা আবশ্যিক।

উনিশ শতকে বাংলায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ঘটতে প্রায় অর্ধশতক অতিক্রান্ত হয়ে গেছিল। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার প্রথম প্রকাশ্য মেয়েদের স্কুল— 'Calcutta Female School'। কিন্তু এর আগে বা এর সমকালেও সামগ্রিকভাবে মেয়েদের কীভাবে দেখত সমাজ, সে বিষয়ে আলোচনা জরুরি। ১৮১৯ সালে প্রকাশিত সতীদাহ সম্পর্কিত দ্বিতীয় পুস্তিকায় রামমোহন রায় বলেন, একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হয় না।[৩৯] তিনি পুরুষশাসিত সমাজের তীব্র নিন্দা করে একথাও বলেন যে, এই সমাজই মহিলাদের 'প্রকৃতিদত্ত প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলিকে অস্বীকার করেছে'[৪০] । এই সূত্রেই তিনি মহিলাদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে স্বীয় মর্যাদা প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অনুভব করতে শুরু করেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের পুস্তিকার ওপর ভিত্তি করে লেখেন 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' (১৮২২)। এটিই ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক উনিশ শতকে লিখিত প্রথম বই।[৪১]

১৮২০ সালের শেষ দিকে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর ছাত্রদল, যারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা ছিলেন নতুন এক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, পাশ্চাত্য আদর্শে দীক্ষিত। এঁরা মহিলাদের সমমর্যাদার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। এর পূর্বে পুরুষেরা তাঁদের 'অশিক্ষিত' স্ত্রীদের নিয়ে মোটেও ভাবিত ছিলেন না। কিন্তু এই ইংরেজি-শিক্ষিত যুবসমাজ স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং এর মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল স্ত্রীমানসে শিক্ষার অনুপ্রবেশ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, রামমোহন রায় থেকেই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এক উদ্বিগ্নতার সূচনা হয় পণ্ডিত-মানসে। সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষার বিষয়েও আলোচনা শুরু হয়। ১৮২০ এর দশক থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশের কারণে মহিলাদের প্রতি পুরুষদের মনোভাবে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং এই সূত্রেই স্ত্রীশিক্ষা গুরুত্ব পেতে শুরু করে ধীরে ধীরে। এই সচেতনতারই প্রতিফলন ১৮৩৮ সালের ৩ মার্চ-এর 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত 'কোনো এক ব্রাহ্মণের পত্র', যেখানে পত্রলেখক স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, "যদ্যপি পুরুষেরদের সঙ্গে২ স্ত্রীরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে দেশের সৌষ্ঠব হওনের অতি বিলম্ব হইবে"[৪২]। এই সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়টি নিয়ে বাদানুবাদ তৈরি হয়।[৪৩]

বিদ্বজ্জন পরিমণ্ডলে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে সচেতনতা প্রকাশ পেতেই সেই যুগের বেশ কিছু পত্রিকা এই বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেখানে বিরুদ্ধমতও প্রকাশিত হতে দেখা গেছে; এমনকি, বহু আধুনিক মনস্ক মানুষও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে চাননি সেই সময়। কিন্তু 'বিদ্যাদর্শন', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'সর্বশুভকরী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ইত্যাদি পত্রিকায় অনেকেই লিখেছিলেন মেয়েদের শিক্ষার কথা, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার দাবি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম।

বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে প্রথম সাংগঠনিক ভূমিকা নিয়েছিলেন রবার্ট মে নামক এক ইংরেজ মিশনারি। ১৮১৮ সালে চুঁচুড়ায় তিনি প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮১৯ সালে কলকাতার ব্যাপটিস্ট সোসাইটি এবং ১৮২৩ সালে চার্চ মিশনারি সোসাইটি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে প্রভূত উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। ১৮২৩ সাল থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে প্রায় ৩০ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যেগুলি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মিস মেরি অ্যান কুক। কিন্তু দেশীয় নেতৃবর্গের সহযোগিতার পাশাপাশি সমকালীন হিন্দু উচ্চবর্গীয় মানুষের অনেকাংশই ছিলেন এর বিরোধী। তাই প্রাথমিক বালিকা শিক্ষার উদ্যোগ সীমিত হয়ে থাকে বাগদী, ব্যাধ, বৈরাগী প্রভৃতি নিম্নবর্গের বালিকাদের মধ্যে। এরা অনেক সময় অর্থ পুরস্কারের লোভেও বিদ্যালয়ে যেত। ফলত বালিকা শিক্ষা তখনও সার্বিক স্বীকৃতি পায়নি দেখা গেল।

১৮৩০ পরবর্তী সময়ে মুষ্টিমেয় কিছু উদ্যোগী হিন্দু বাড়িতে খ্রিস্টান মিশনারি বা বৈষ্ণবীদের সহায়তায় বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া চালাতে চেয়েছিলেন; যেমন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। কিন্তু গোলাম মুরশিদ দেখিয়েছেন এই ব্যক্তিগত প্রয়াস মূলত সীমাবদ্ধ ছিল ব্রাহ্ম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে, নিম্নবর্গের পক্ষে গৃহশিক্ষক রাখার সামর্থ্য ছিল না, মহিলা শিক্ষক ছিলেন খুব কম, রক্ষণশীল সমাজ ছিল এই বিষয়ে অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাই "স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং ভদ্রলোক কর্তৃক তার দায়িত্ব গ্রহণ আবশ্যক ছিলো"।[৪৪]

উক্ত 'ভদ্রলোক' বলতে সম্ভবত গোলাম মুরশিদ বোঝাতে চেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীকৃষ্ণ দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, মদনমোহন তর্কালংকার প্রমুখকে, যারা এর কিছুকালের মধ্যেই যুক্ত হবেন বেথুন সাহেবের মহতী উদ্যোগ 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' স্থাপনের সঙ্গে (১৮৪৯)। প্রথমে এই স্কুল শুরু হয় ১১ জন ছাত্রী নিয়ে, পরে তার সংখ্যা কমে হয় ৭, ১৫ বছরের মধ্যে তার সংখ্যা হয় ৬৪। তৎকালীন শিক্ষার রিপোর্ট থেকে এও জানা যায় যে, এই স্কুলের মেয়েদের লেখাপড়ার মান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। তবে, এর মাধ্যমেই স্ত্রীশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছিল, এমনকি 'ভদ্রলোকে'রাও এগিয়ে এসেছিলেন যাবতীয় সামাজিক অস্বস্তি দূর করে। এর ব্যতিক্রম যদিও ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

"আগে মেয়েগুলো ছিলো ভালো, ব্রত-ধর্ম কর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে, কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে।"[৪৫]

বেথুন-পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুপ্রেরণায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় একটি, কিশোরীচাদ মিত্র রাজশাহিতে দুটি, এবং, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারি অর্থ সহায়তায় ১৮৫৭-১৮৫৮ সালের মধ্যে বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৪৬]

উক্ত উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় হলেও সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করলে এই স্কুলগুলিও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ১৮৫০-১৮৬০ এর দশকে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতায় বিশ্বাসী হিন্দুরাও হঠাৎ করে বিরোধিতা শুরু করেন। স্কুলে পুরুষ শিক্ষকের কাছে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর বিষয়টি তাদের আপত্তির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় স্ত্রীশিক্ষায় বিশ্বাসী অথচ রক্ষণশীল হিন্দুরা মেয়েদের বাড়ির ভেতরে রেখেই শিক্ষিত করে তুলতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ফলত এই সময়ে মেয়েদের অনেকেই অন্তঃপুর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত হতে শুরু করেছিলেন। ব্রাহ্মরা এবং ব্রাহ্ম প্রভাবিত শিক্ষিত হিন্দুরা অবশ্য স্ত্রীশিক্ষাকে এই সময় প্রথাগত পদ্ধতিতেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই সময় থেকে বেশ কিছু পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল, যেগুলি সচেতনভাবে মহিলাদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি ও মহিলাদের সুশিক্ষিত করে তোলার প্রসঙ্গ জনসমক্ষে উত্থাপিত করেছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'মাসিক পত্রিকা'(১৮৫৪), 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩), 'অবলাবান্ধব'(১৮৬৯) ইত্যাদি। এই সময় বেশ কয়েকজন লেখিকাও এগিয়ে এসেছিলেন; যেমন, কৈলাসবাসিনী দেবী, কৃষ্ণকামিনী দাসী, কামিনীসুন্দরী, সৌদামিনী দেবী, তাহেরন নেসা প্রমুখ।

এবারে কয়েকটি তথ্য প্রমাণের সাহায্যে উনিশ শতকের স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি বুঝে নেওয়া যেতে পারে—

১৮৬০ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয় সংখ্যা ও ছাত্রী সংখ্যার বৃদ্ধির হার প্রথমে দেখে নেওয়া যাক [৪৭] —

বছর	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৮৬৩	৯৫	২,৪৮৬
১৮৭১	৩৪৪	৬,৭১৭
১৮৮১	১,০৪২	৪৪,০৯৬
১৮৯০	২,২৩৮	৭৮,৮৬৫

উপরের তালিকা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মেয়েদের স্কুল সংখ্যা ও স্কুলমুখী মেয়েদের ধীরে ধীরে বাড়ছিল। কিন্তু মেয়েদের ঠিক কী ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত, ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রম আলাদা হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা, এই দ্বিধা দীর্ঘদিন অবধি ক্রিয়াশীল ছিল। ১৮৬০ এর দশকে মেয়েদের স্কুলে "গৃহরক্ষণ, রন্ধন, সূচিকর্ম এবং শিশুপালনের মতো বিষয়ই শেখানো উচিত"[৪৮] বলে মনে করতেন স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তকেরা। এছাড়া শেখানো হত অঙ্কন, দেখা হত হাতের লেখা। এই বিশেষ ধরনের শিক্ষা পরিচিত ছিল 'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা' নামে, উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের 'সুগৃহিণী' ও 'সুমাতা' করে গড়ে তোলা[৪৯]। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুলে মেয়েদের পাঠক্রম প্রায় এক রেখে যুক্ত করা হয় ইংরেজি ও দুটি বই— কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব' ও 'The Landmarks of Indian History'. বস্তুত, এই পাঠক্রম দেখলে বোঝা যায় সমাজ মেয়েদের শৈশবকে ঠিক কোন আঙ্গিক থেকে নির্মাণ করতে চাইছিল। এমনকি, মেয়েদের 'মেয়েলি' বিষয় পড়িয়ে সুগৃহিণী ও সুমাতা তৈরি

করা হবে, নাকি মেয়েদের ‘পুরুষালি’ বিষয়ে শিক্ষিত করে পুরুষের সমকক্ষ নারী তৈরি করা হবে, এই দুই নির্মাণপ্রকল্পের দ্বন্দ্ব ক্রমশ হয়ে উঠছিল সেই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীচের তালিকায় দেখে নেওয়া যাক মেয়েদের তৎকালীন পাঠক্রম[৫০] :

শ্রেণি	পাঠ্য বিষয়	
	বালিকা বিদ্যালয়	স্ত্রী-নরমাল স্কুল (কেশব সেন-স্থাপিত)
প্রথম	বোধোদয়, গণিত	চরিতাবলী, গণিত, First Book of Reading
দ্বিতীয়	আখ্যানমঞ্জরী, পদ্যপাঠ (দ্বিতীয় ভাগ), ব্যাকরণ,ভূগোলসূত্র, গণিত	আখ্যানমঞ্জরী, পদ্যপাঠ (দ্বিতীয় ভাগ), ভূগোল, মৌল পদার্থবিদ্যা: বস্তুবিচার, First Book of Reading, Arithmetic
তৃতীয়	চারুপাঠ, পদ্যপাঠ (তৃতীয় ভাগ), ব্যাকরণ, ভূগোলসূত্র, বাঙ্গালার ইতিহাস, বস্তুসার, গণিত	চারুপাঠ (তৃতীয় ভাগ), পদ্যপাঠ (তৃতীয় ভাগ), বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম ভাগ),ভূগোল, First Book of Reading, গণিত
চতুর্থ	টেলিমেকাস, সদ্ভাবশতক, ব্যাকরণ, ভূগোল, স্বাস্থ্যরক্ষা, গণিত	রচনাবলী, মেঘনাদবধকাব্য, Rudiments of Knowledge, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, মৌল পদার্থবিজ্ঞান, গণিত
পঞ্চম	রঘুবংশ (অনুবাদ), মেঘনাদবধকাব্য, ব্যাকরণ, প্রাকৃত ভূগোল, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান, গণিত	মেঘনাদবধকাব্য, নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব, ইংরেজি ব্যাকরণ, McCullock’s Course of Reading, The Landmark of Ancient History, ভূগোল, মনস্তত্ত্ব, গণিত

উক্ত তালিকা এই বিষয়টিকেই প্রতিষ্ঠা করে যে, কেশবচন্দ্র সেন ‘প্রগতিশীল’ হলেও মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর ‘রক্ষণশীল’ মনোভাবই গুরুত্ব পেয়েছিল। মেয়েদের জ্যামিতি, দর্শন ইত্যাদি ‘পুরুষালি’ বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা অনাবশ্যক বলে মনে করায় তাঁর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, যাঁরা মেয়েদের সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভের বিষয়টি প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এ বিরোধ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে ১৮৭৩ সালে, মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ বাঙালি

বন্ধুর সহায়তায় অ্যানেট অ্যাক্রয়েড কর্তৃক ‘হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়’ স্থাপিত হওয়ার পর। এই বিদ্যালয়টি হয়ে উঠেছিল সেই যুগে মেয়েদের ‘উচ্চশিক্ষা’র একমাত্র বিদ্যালয়। ইতিমধ্যেই শুরু হয় ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ বাদানুবাদ, কেন্দ্রে ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও তার প্রচলনপদ্ধতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী নিয়েও তর্ক শুরু হয়, সোচ্চার হয়ে ওঠে এডুকেশন গেজেট, সমাচার চন্দ্রিকা, পরিচারিকা ইত্যাদি পত্রিকা।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে এই বিষয়টি ধীরে ধীরে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উনিশ শতকের প্রারম্ভে স্ত্রীশিক্ষা সমাজ অননুমোদিত হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরেই তা বিস্তার লাভ করতে থাকে। ১৮২০ সাল নাগাদ শুরু হয় অন্তঃপুরে শিক্ষা বা জেনানা শিক্ষা।[৫১] ১৮৩০ এর দশক থেকে এই ভাবনারও সূত্রপাত ঘটে যে, “মেয়েরা যাতে উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারেন এবং যথার্থভাবে সন্তান লালন-পালন করতে পারেন, তার জন্য তাঁদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন”[৫২] । রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ থেকে মেয়েদের শিক্ষিত হলে বৈধব্যযন্ত্রণা, সংসারের অকল্যাণ, চরিত্রহীনতা বা সন্তানের ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ের ভয় দেখানোর পরেও মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকে; এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামীরাই স্ত্রীদের শিক্ষিত করে তুলতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা প্রদানে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন অ্যানেট আক্রয়েড ১৮৭০ সালে, তারপর বেথুন স্কুল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—এই প্রতিষ্ঠান থেকে মেয়েরা পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার পায়। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে শুরু করেন মেয়েরা। ‘স্ত্রীস্বাধীনতা’র প্রাথমিক পরিসর তৈরি হয়[৫৩] ।

১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের ‘নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব’। বহু মতবাদের দ্বন্দ্ব নিরসন করে তিনি গ্রন্থের একেবারে শেষে লেখেন, “নারীজাতি মানবসমাজে যথার্থ সম্মান লাভ করিতে পাইলে, সকল স্থলে এবং সকল বিষয়েই মনুষ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইলে, ...জনসমাজ কত উন্নতি লাভ করিবে...তাহা কল্পনা করিতেও হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে”[৫৪]। কালীপ্রসন্ন মেয়েদের অবমাননা কাপুরুষোচিত মনে করলেন ঠিকই, কিন্তু পুরুষের

বুদ্ধির সঙ্গে নারীর 'হৃদয়'কে, পুরুষের 'ন্যায়ধর্ম্ম'এর সঙ্গে নারীর 'নয়নবারি'কে , পিতার তত্ত্ব-উপদেশের সঙ্গে মাতার 'স্নেহ'কে যুক্ত করলেন 'সমাজ শোধনা'র্থে। প্রাপ্তবয়স্কা নারীর এই পরিচিতিই বালিকার শৈশব সংগঠনের ভিত্তি। উনিশ শতকীয় সমাজ ছোট মেয়েদের বাল্যবিবাহ দিয়ে অথবা সহমরণে পাঠিয়ে অথবা তাকে লেখাপড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তার শৈশব-কৈশোর কাল ধ্বংস করে রেখেছিল। তাই শিশুসেব্য সব লেখাতেই মেয়েরা উপেক্ষিতাই ছিল। বিশ শতকে এসে এই সামগ্রিক চিত্রের পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ ভাগেই, ১৮৫৯ সালে, 'ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি' থেকে প্রকাশিত হয় মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'সুশীলার উপাখ্যান'। এটি শিশুকিশোর সাহিত্য পদবাচ্য নয় ঠিকই, কিন্তু এই প্রথম কোনো বই বেরোল, যার আখ্যাপত্রে লেখা ছিল, 'বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাদিগের ব্যবহারার্থ'। বইটির তিনটি ভাগ—প্রথম ভাগটি বালিকাদের জন্য, দ্বিতীয় ভাগটি যুবতীদের জন্য, এবং তৃতীয় ভাগটি গৃহিণীদের জন্য লেখা হয়েছিল। এমনকি, দ্বিতীয় ভাগের আখ্যাপত্রে তারকাচিহ্ন দিয়ে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল 'পাঠশালাস্থ বালকদিগের জন্য নহে'[৫৫]। এই বইটির প্রথম ভাগ অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষায় চতুর্থ বর্ষের এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ পঞ্চম বর্ষের ছাত্রীদের পড়ানো হত বলে জানাচ্ছে 'সোমপ্রকাশ'। স্পষ্টই বোঝা যায়, শিক্ষিত ভদ্রলোকের উপযুক্ত নারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিশু বয়স থেকেই 'সুশীলা' হয়ে ওঠার পাঠ দেওয়া হত এই বইয়ে। পরিণত সুশীলা (নামচরিত্র) শ্বশুরগৃহে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাযত্ন করেছে, উপযুক্ত স্নেহ-শাসনে সন্তান পরিচর্যা ও পালন করেছে, পুত্র-কন্যাকে সমান শিক্ষাদানে সকলকে উৎসাহী করেছে, বইপড়া, গৃহসজ্জায় মনোনিবেশ করেছে, অপরকে কুসংস্কারের বশবর্তী হতে বারণ করেছে, সংসারের খরচের যথাযথ হিসেব করেছে, বিপথগামী স্বামীকে 'বশ' করার, আপদকালীন চিকিৎসা করার ও সকলকে সাহায্য করার পরামর্শ দিয়েছে প্রতিবেশীদের[৫৬]। তবেই সে হতে পেরেছে 'সুমাতা' তথা 'সুগৃহিণী' — যা ছিল উনিশ শতকের 'ভদ্রলোকে'র উপযোগী 'ভদ্রমহিলা' নির্মাণ-প্রকল্পের মূল সুর। এর সূচনা কিন্তু শৈশবেই, যেখানে সুশীলা

"প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, পাঠশালায় যে সকল নূতন২ পাঠ পাইত তাহা অভাস করিত", "পাকের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া মাতাকে সাহায্য করিত" বা "পরিবারের চাদর বা আংরাখাগুলি সেলাই করিত", এমনকি, "অসদাচারিণী বালিকাগণের ন্যায় ধর্ম্মকথাতে সে কোন প্রকার উপহাস করিত না"[৫৭] । এই যে জীবনাচরণ, সেখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নৈতিকতার পাঠ।

উনিশ শতকের মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপ তাই অনুশাসনের নিগড়ে বাঁধা পড়েছিল এভাবে শৈশব অবস্থা থেকেই। প্রথমে সমাজ থেকে বিযুক্তি এবং পরে সুকুমার বৃত্তির বিনষ্টিসাধন করে আদর্শ-নারী-নির্মাণ-প্রকল্পে সামিল করার মাধ্যমে সমাজে জোর করে অন্তর্ভুক্তি — এই দুভাবে তৎকালীন 'মেয়েবেলা'কে বিভক্ত করা যায়। এইরূপ পরিস্থিতিতে মেয়েদের মনের কথা যে সহজেই ছোটদের বইতে প্রকাশিত হবে না, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

উক্ত গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পর্বে আলোচনা করা হয়েছে উনিশ শতকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শিশু-উপযোগী রচনা ও শিশুশিক্ষা বিষয়ক বইগুলিতে মেয়েদের শৈশব কীভাবে ধরা পড়েছিল। এই আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছিল মেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গ। উনিশ শতকীয় সামাজিক লিঙ্গনির্মিতি-পর্ব বেশ বিশদেই আলোচনা করা হয়েছে সেখানে। উক্ত আলোচনার সূত্রেই আমরা প্রবেশ করব এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে—যেখানে আমরা দেখাতে চাইব বিশ শতকে নৈতিকতার মানদণ্ডে ঠিক কতটা পরিবর্তন সূচিত হয়, তার সূত্রে ছোটদের বইয়ে কতটা বদল ঘটে এবং অবশ্যই, শিশুসাহিত্যে মেয়েদের সামগ্রিক অবস্থানের আদৌ কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় কিনা।

উনিশ শতকে নানা বাদানুবাদ অতিক্রম করে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। সমাজ বিভিন্ন কারণেই শিক্ষিত রমণী নির্মাণে আগ্রহী হয়ে উঠছিল। মেয়েদের পত্রিকার এক আলাদা জগৎ তৈরি হয়েছিল, যেখানে মেয়েদের নিজেদের বিষয়ে কথা বলার পরিসর গড়ে উঠেছিল। যদিও তখনও মেয়েদের স্বাধিকার প্রকাশের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ মসৃণ হয়নি, মেয়েদের

বিবাহের বয়স-বিষয়ক কোনো আইন পাশ হয়নি, তবু মেয়েরা তাদের লড়াই করে চলেছিল। উনিশ শতকের প্রথম পর্ব ছিল মেয়েদের অত্যাচারিত হওয়ার পর্ব। 'সতীদাহ প্রথা', 'বাল্যবিবাহ' ও 'বহুবিবাহ' ইত্যাদি মেয়েদের 'শৈশব' তৈরি হওয়ার পক্ষে সমূহ বাধা সৃষ্টি করেছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষার এক মুক্ত জগতের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন তৎকালীন শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সংস্কারকেরা।

উনিশ শতকীয় স্ত্রীশিক্ষার ধারাকে মূলত দুটি ভাগে তাই ভাগ করা যেতে পারে — ক) উপযোগবাদী ধারা ও খ) ব্রাহ্ম ধারা। প্রথম ধারণায় পুরুষের মনোগ্রাহী স্ত্রী তৈরি করার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করে ছোট মেয়েদের 'সুশীলা' তৈরির পাঠ দেওয়া হচ্ছিল এবং, দ্বিতীয় ধারণায় দাম্পত্যকে বন্ধুত্বের সমগোত্রীয় ভেবে স্ত্রীশিক্ষাকে অহৈতুকী আনন্দের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছিল। এই উপযোগবাদী দর্শনের বিপরীতে অবস্থিত বাহ্ম দর্শন এভাবে একটি রোমান্টিক আবহ তৈরি করেছিল শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে, এমনকি, শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও। প্রয়োজনীয়তার গণ্ডি ভেঙে এক কল্পলোক নির্মাণে সমর্থ হয়েছিলেন এই শাখার সেবাব্রতীরা। 'মেট্রোপলিটান মন'-এর এই কল্পলোক সফরকেই 'রোম্যান্টিকতা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পার্থিব উপযোগের বাইরে, বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বাইরে একটি 'space' তৈরি করতে চেয়েছিলেন এই ধারায় বিশ্বাসী তাত্ত্বিকেরা। তথাকথিত নিয়ম-শৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে আনন্দ বা মুক্তির ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল (যদিও এইরকম উদার ভাবনার শরিক হতে পেরেছিলেন খুব সীমিত সংখ্যক মানুষ)। এই ধারণায় তাই মেয়েদের পুরুষের যথার্থ সঙ্গী হিসেবেই দেখা হল না শুধু, মূল্যবোধ (Ethics) ও নান্দনিক চেতনাসমৃদ্ধ (Aesthetics) ভাবনার আধার হিসেবেও চিহ্নিত করা হল। মেয়েদের কাঙ্ক্ষিত শৈশবের নবনির্মাণ শুরু হ'ল সমাজে ও সাহিত্যে। এই ধরনের ভাবনার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত 'সখা' ও শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকার পাতায়। (এর মধ্যে 'সখা'-য় প্রকাশিত লেখা বিষয়ে আগের পর্বেই আলোচনা করা হয়েছে)।

উনিশ শতকের শেষ দিকে, ১২৯২ বঙ্গাব্দে, ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে 'বালক' পত্রিকা, প্রথমে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায়। সর্বান্তঃকরণে মৌলিক এই পত্রিকাটি যুগের তুলনায় ছিল অত্যন্ত আধুনিক। মাত্র একবছর এর আয়ুষ্কাল হলেও সেই ক'টি সংখ্যায় বিচিত্র বিষয়ে বিভিন্ন গুণীজন এই পত্রিকায় লিখেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী নিজে বালক-বালিকাদের সাহিত্যচর্চার অনুকূল প্রতিবেশ রচনায় আগ্রহী ছিলেন, 'বালক' তাঁর সেই আগ্রহের ফসল। এখানে বালিকাদের রচনা ছাপা হ'ত [৫৮]। তৎকালীন সংকট (দুর্ভিক্ষ) বিষয়ে বালিকার লেখা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া পাঠকদের সঙ্গে পত্র মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে আলোচনার নানা বিষয় উঠে আসত। এমনকি পাঠিকারাও নিয়মিত চিঠি পাঠাতেন। নিতান্ত ঘরোয়া বিষয় বাদ দিয়ে বালিকা এখানে প্রশ্ন রেখেছিল 'সূর্য্যকিরণের ঢেউ' বিষয়ে। সে ও কিন্তু যথাসময়েই চিঠির উত্তর পায়। এছাড়া 'বালক'-এ প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায়, মূলত ছড়ায় মেয়েদের প্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে, তাই সেগুলি 'ছড়া'র অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে প্রসঙ্গসূত্রে।

উক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়াও বিশ শতকে প্রকাশিত হয় অজস্র শিশু কিশোর পত্রিকা। 'রামধনু' 'রংমশাল' 'মৌচাক' 'সন্দেশ' ইত্যাদি শিশু মনস্তত্ত্বকে যথাযথভাবে হাজির করেছিল। নিশ্চয়ই সেখানে মেয়েদের কথা অন্য আঙ্গিক থেকেই চিত্রিত হয়েছিল; কিন্তু আমাদের আলোচনা পত্র-পত্রিকা সংক্রান্ত না হওয়ায় আপাততঃ শুধু পত্রিকাগুলিগুলির নামটুকুই উল্লেখ করা হ'ল ।

উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের সমাজে সামগ্রিকভাবে মেয়েদের অবস্থানের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, একথা সর্বতোভাবেই স্বীকার্য। যদিও এই অবস্থানের বদল ঘটে চলেছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে, তবু তার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছিল সবক্ষেত্রে, ছোটদের জন্য লেখালেখিতেও। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে ভারত তথা বাংলার রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতিতে অনেকগুলি বদল চোখে পড়ে। মেয়েদের অবস্থান সেই প্রেক্ষিতেও ছিল যথেষ্ট

গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকে মেয়েদের 'শৈশব' গড়ে না উঠতে পারার অন্যতম কারণ ছিল তাদের অতি দ্রুত বিবাহ-উপযোগী করে তোলার চাহিদা। ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে মেয়েদের 'age of consent' ছিল ১০। ১৮৯১ সালে তা হয় ১২, ১৯২৫ সালে ১৪ এবং ১৯৪০ সালে ১৬। ১৯২৯ সালে মেয়েদের বিবাহ সংক্রান্ত একটি যুগান্তকারী বিল পাশ হয়, যেখানে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয় ১৪। এই বিল ইতিহাসে 'সারদা বিল' নামে বিখ্যাত। পরে অবশ্য এই বয়সসীমা বর্ধিত করে ১৮ করা হয়। নিঃসন্দেহে মেয়েরা স্বাধীনতার দিকে এক পা এগোয় এই বিলের হাত ধরে। এই সময়ের আরো একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হ'ল মহিলাদের ভোটাধিকার সংক্রান্ত আন্দোলন। এই দুটি দাবিই মেয়েদের পায়ের তলার মাটি ধীরে ধীরে শক্ত করে তুলছিল। মেয়েরা স্বাতন্ত্র্যে সঞ্জীবিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করার সাহস পেতে শুরু করে এই সময় থেকেই।[৫৯]

যদিও এই পর্বের আলোচনা বিশ শতক-সংক্রান্ত, তবু আলোচনার প্রসঙ্গে আমাদের পিছিয়ে যেতে হয় অনেকটা। কারণ, মেয়েরা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম বিশ শতকেই সংগ্রাম করতে শুরু করে, তা নয়, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল বহুকাল আগে থেকেই। ১৭৯২ সালে জুডিথ সার্জেন্ট মারের 'অন দি ইকোয়ালিটি অফ সেক্সেস' এবং ঐ বছরেই মেরি উইলস্টোনক্রাফট্-এর 'এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস্ অফ উইমেন' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে আলোড়ন তৈরি হয়। এরপর একের পর এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৪৮ সালে 'দি কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো', ১৮৬৭ সালে মার্কসের 'ক্যাপিটাল', ১৮৬৯ সালে জন স্টুয়ার্ট মিল ও হ্যারিয়ট টেলরের 'দি সাবজুগেশন অফ উইমেন, এবং ১৮৮৪ সালে এঙ্গেলস্-এর 'দি অরিজিন অফ দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দি স্টেট' প্রকাশিত হয়। এই বইগুলিতে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের পাশাপাশি নারীমুক্তির বিষয়টি সমানভাবে গুরুত্ব দাবি করে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, "১৯১৮ সালে, তিরিশোর্ধ্ব ব্রিটিশ মেয়েরা ভোটাধিকার পেল, ১৯২০ সালে মার্কিন মেয়েরা"[৬০]। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত

ভার্জিনিয়া উলফ্-এর ‘এ রুম অফ ওয়ানস্ ওন’-এ লেখিকা প্রথম ঘোষণা করেন , “লিঙ্গপরিচয় জন্মগত নয়, সামাজিকভাবে নির্মিত এক অভ্যেস, যাকে চ্যালেঞ্জ জানানো যায়, যার পরিবর্তন সম্ভব”[৬১]। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় আরো একটি যুগান্তকারী বই, ‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’, লেখিকা—সিমোন দ্য বোভোয়া। এই বইতে বোভোয়া জেহাদ ঘোষণা করেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ‘কর্তা-পুরুষের’ প্রতি এবং কর্তার ইচ্ছেবস্তু হয়ে থাকা দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ নারীজাতির সামগ্রিক অবস্থানের প্রতি। এর আরো অনেক পরে, কেট মিলেট-এর ‘সেক্সুয়াল পলিটিক্স’ (১৯৭০) -এ উঠে আসে মেয়েদের অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ও সেই প্রাচীনপন্থী ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার কথা। সুতরাং, বোঝা যায়, ‘লিঙ্গ-অসাম্য’কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে থেকেই। ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়ার পরেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতবর্ষ উনিশ শতকে এইরকম কোনো আন্দোলনে নিজেকে সামিল করতে পারেনি। বিশ শতক থেকে শুরু হয় ভারত তথা বাংলার মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

উনিশ শতক পর্যন্ত মেয়েদের কয়েকটি feminine বা ‘মেয়েলি’ বৈশিষ্ট্যের সমাহার হিসেবেই দেখা হত। তাই মেয়েদের যোগ্য বিশেষণ হত ‘লজ্জাবতী’, ‘ঘরোয়া’ বা নেতিবাচক অর্থে ‘হিংসুটি’। সমাজ ‘দস্যিপনা’কে মেয়েদের ক্ষেত্রে অশোভন বলে স্থির করে দেওয়ার কারণে মেয়েদের বারেবারে বিভিন্ন লেখায় ‘গৃহলক্ষ্মী’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা লক্ষ করি আমরা। শিক্ষিত মা তাঁর মেয়েকে শিক্ষিত করতে চেয়েছেন পুরুষের উপযোগী স্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। সর্বত্রই চলছিল মেয়েদের ‘সুশীলা’ হিসেবে গড়ে তোলার পাঠ। এর পাশাপাশি আমরা পাই মেয়েদের ‘মাতৃরূপকল্পে’ বা ‘Mother Archetype’-এ দেখার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। মেয়েদের বাল্য, শৈশব, কৈশোর নেই—আছে শুধু মাতৃসত্তা। এই প্রেক্ষণবিন্দু মিশেছিল জাতীয়তাবাদী চেতনায়। এই ভাবনার সমান্তরালে আবার চলছিল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ঘরানা—যেখানে জাতীয়তাবাদী ধারণার মিথ ভেঙে সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতার (feudal ethics) দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করে নবতর স্ত্রীলিঙ্গ-নির্মাণ-প্রকল্প চালু হয়ে গিয়েছিল। ‘বঙ্গলক্ষ্মীর

ব্রতকথা'য় এর প্রমাণ মেলে। এই সমস্ত ভাবনার সূত্রে একথা বেশ স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম পর্বে কন্যাশিশুরা বা কিশোরীরা রাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল না, তারা ছিল শুধুই সংখ্যাবিশেষ। রাষ্ট্রের participatory part-এ ভূমিকা ছিল শুধুই ছেলেদের।

উক্ত সময়েই সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)। এই যুদ্ধ ও তার ফলশ্রুতি বিপুল সমাজ পরিবর্তনের সূচক হয়ে দাঁড়ায়। মূল্যবোধ, অর্থনীতি, সমাজনীতিতে ভাঙন ধরে। মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্পর্ক, যৌনতা সমস্ত ক্ষেত্র আন্দোলিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই শিশু তথা মেয়ে শিশুর অবস্থান টলে যায়। পারিবারিক প্রয়োজনেই এই সময় থেকে তথাকথিত অন্তঃপুরবাসিনীরা গৃহকোণ ছেড়ে বহির্মুখী হতে শুরু করেন। চাকরি ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। বোঝা যায়, 'ঘর' ও 'বাহির' এই দুই ধারণার 'binary' ক্রমশ দূর হচ্ছে। মেয়েদের এই পরিচিত পারিবারিক 'space' ছেড়ে বেরিয়ে আসা বা বেরোতে চাওয়ার সূত্রেই মেয়েদের মধ্যেও অ্যাডভেঞ্চার-এর নেশা জাগে, মেয়েরাও দস্যিপনা করতে সাহস পায়। স্বাভাবিকভাবেই বালিকা বা কিশোরীদের এতকাল পর্যন্ত সমাজ বা পরিবার যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিল, তার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। বিশ শতকের ছোটদের বইগুলিতেও এর প্রভাব পড়ে। মেয়েরাও রোমান্টিক কল্পলোকে বিচরণ করার সাহস পায়, গোয়েন্দাগিরি করতে শুরু করে, এমনকি, খেলার মাঠে নেমে পড়তেও পিছপা হয় না। 'সুশীলা'র সংজ্ঞাও বদলাতে থাকে। 'সাবেকি গার্হস্থ্য' ও 'বইপড়া' একে অপরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। তৈরি হয় 'নারীত্বের আদর্শের দ্বিমুখিনতা'[৬২]।

উল্লিখিত কারণে উনিশ শতকের তুলনায় বিশ শতকের শিশু-কিশোর সাহিত্য আমূল বদলে যেতে শুরু করে। এই সময়ের বিভিন্ন লেখায় আমরা বিচিত্র সম্পর্কের গল্প পাই। ভাই-বোনের চিরাচরিত সম্পর্কের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়, অসমবয়সী বা অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্বের গল্প তৈরি হয়, জীবনের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গল্প তৈরি হতে থাকে। পুরোনো

সামাজিক ধারণাকে উৎপাটিত করে নতুন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব তৈরি হয় মেয়েদের তথা বালিকা-কিশোরী-তরুণীর। মেয়েরা স্বপ্ন দেখে, অপরকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়, অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, আবার অপরাধীকে ধরে ফেলে, অপরাপর মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখে, একইসঙ্গে অপরের কাছে নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, নকশাল আন্দোলন, মুক্ত অর্থনীতি—এই সমস্ত বিষয় তৎকালীন মেয়েদের তথা সেই সময়ের ছোটদের বইয়ের 'মেয়েবেলা'-কে সম্পূর্ণ পৃথক আঙ্গিকে গড়ে তোলে। বিশ শতকের নির্বাচিত বেশ কিছু সংকলন গ্রন্থের লেখালেখির নিরিখে এই নবনির্মিত 'মেয়েবেলা'র একটি রূপরেখা এই পর্যায়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'মুকুল', 'সখা', 'বালক' ইত্যাদি পত্রিকা। এই পত্রিকাটিতে এমন কিছু লেখা প্রকাশিত হয় যা সমাজে মেয়েদের অবস্থানকে প্রচলিত আঙ্গিকের বাইরে থেকে নির্মাণ করেছিল। 'সখা'-র দৃষ্টান্ত এই অধ্যায়ের শুরুতেই প্রদান করা হয়েছে। 'বালক'-এ প্রকাশিত লেখা নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে, তাই এখানে 'মুকুল'-এর নির্বাচিত লেখা বিশ্লেষণ করা হল। এই লেখাগুলিকে উনিশ ও বিশ শতকের যোগসূত্র বলা যেতে পারে।

১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৮৯৬ খ্রিঃ) শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'মুকুল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের শেষভাগে 'মুকুল'-এর সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পত্রিকার আখ্যাপত্রে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, "যাহাদের বয়স ৮/৯ হইতে ১৭/১৮-র মধ্যে ইহা প্রধানতঃ তাহাদের জন্য। আমরা লিখিবার সময় এই বয়সের বালকবালিকাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখি"[৬৩]। শিবনাথ শাস্ত্রী কিন্তু বালকদের থেকে কোথাওই বালিকাদের পৃথক দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি, অথচ উনিশ শতকের শিশু-কিশোর পত্র-পত্রিকায় সেই রীতিটিই ছিল দস্তুর। আমরা এবারে 'মুকুল'-এর নির্বাচিত কিছু লেখা অবলম্বনে দেখে নেব সেখানে মেয়েদের কীভাবে চিত্রিত করা হয়েছিল।

'মুকুল'-এর উপকথা/রূপকথা শ্রেণিভুক্ত লেখাগুলি দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে। বিদেশি রূপকথা প্রায়শই 'মুকুল'-এ অনুবাদ করে প্রকাশ করা হত। এগুলির মধ্যে অন্যতম 'হংসরূপী রাজপুত্র' কাহিনিটি—এটি ডেনমার্ক-এর রূপকথা, অনুবাদক শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং। এই গল্পে আশ্চর্যজনকভাবে রাজকন্যার উদ্ধারকল্পে রাজপুত্রের অভিযান নেই, রাজকন্যার রূপবর্ণনা নেই, রাজকন্যাকে 'সম্পত্তি' হিসেবে চিহ্নিত করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা, তাও নেই। বরং রাজকন্যাই এই কাহিনিতে মুখ্য চরিত্র—যে নির্ভীক, কর্মনিষ্ঠ, শাপগ্রস্ত এগারো ভাইয়ের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অসাধ্য সাধনে ব্রতী। এই গল্পের শেষে নিতান্ত লৌকিক উপায়ে শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তার ও দার্ঢ্যের সূত্রে সব বাধা বিপত্তি দূর করার মাধ্যমে রাজকন্যার বিজয় সূচিত হয়। উপকথাটির মূল কাহিনি এরকমই ছিল কিনা, তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে, শিবনাথ শাস্ত্রীর ধারণায় 'মেয়েবেলা'র নির্মিতি ছিল এমনটাই ।

'মুকুল' এর পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারী দাশের লেখা বিখ্যাত কবিতা 'আদর্শ ছেলে'। লক্ষণীয়, 'আদর্শ মেয়ে' কেমন হওয়া উচিত, এই নিয়ে গঠনমূলক কোনো ভাবনা দীর্ঘদিন তৈরি হয়নি, কারণ, বাঙালি মেয়েদের 'আদর্শ' হয়ে ওঠার জন্য 'স্বামী-পুত্র-সংসার'ই ছিল একমাত্র ক্ষেত্র। কিন্তু 'মুকুল'-এ প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় বারবার সেই চিরাচরিত ছক ভেঙ্গে মেয়েদের অন্যভাবে দেখার প্রবণতা দেখা গেল। হয়তো লেখকের অজান্তেই মেয়েদের মান্যায়ন ঘটতে শুরু করেছিল অন্যখাতে। কয়েকটি লেখার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

উপকথা শাখাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'নাসাবতী রাজকন্যা'র কথা। এ গল্পে রাজার আট বছরের মেয়ে ফুলকুমারী রূপের দেমাকে অন্ধ, মুখে তার 'পাকা পাকা কথা'। অপরের চেহারার যেকোনো অসঙ্গতি তার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়। বহুবার তার 'স্বভাব চরিত্র' শুধরে নেওয়ার পরেও যখন তার অহং চূর্ণ হয় না, তখন কোনো এক অজানা কারণে তার নাক লম্বা হতে থাকে ও সে 'নাসাবতী রাজকন্যা'তে পরিণত হয়। পরে সকল দুঃখী, অসুস্থ

মানুষদের নিঃস্বার্থ সেবা দানের মাধ্যমে সে পূর্বাবস্থা লাভ করে। 'রূপ' নয়, কোনো মেয়ের 'গুণ'-ই যে তাকে 'আদর্শ' বলে চিহ্নিত করতে পারে, এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একইভাবে কোনো এক 'জার্মান দেশীয় রূপকথা'য় জগদীশ গুপ্ত দুই বোনের চারিত্রিক বৈপরীত্য তৈরি করে 'সর্বংসহা', 'স্থিতধী'—এই গুণাবলী প্রয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত মেয়েটিকে নির্মাণ করেন। আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বিনয়বতীর উপাখ্যান'-এর বিষয়বস্তুও প্রায় এক। এখানে, কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামকরণে লেখকের অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুদিত 'হাত কাটা মেয়ে' গল্পে মেয়ের চরিত্রে যুক্ত হয় আধ্যাত্মিকতার মাত্রা আর 'কাঠুরে মেয়ে' উপকথায় অজিতা নামক মেয়েটির নির্লোভ আচরণের সঙ্গে যুক্ত হয় যেকোনো অন্যায়ের সৎ স্বীকারোক্তি করতে পারার বিরল ক্ষমতার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই পর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি হল জীবেন্দ্রকুমার গুপ্তের 'শ্লোকের মূল্য'। এখানে ব্রাহ্মণকন্যা কমলার লেখা শ্লোকের দ্বারা আপাতভাবে যুবরাজ সুজন সিংহের ভাগ্য পরীক্ষা হলেও আসলে কমলার বক্তব্যে প্রকাশিত হয় জগৎ সংসারের শাশ্বত সত্য। তাই ব্রাহ্মণ অর্থচিন্তায় নিমগ্ন হলে কমলা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার বাবাকে রাজার কাছে যেতে বলে ও নিজের লেখা বিষয়ে সে নির্দ্বিধায় বলতে পারে , "আমার এই ছয় পংক্তি শ্লোকের মূল্য ষাট লক্ষ টাকা, তিনি (রাজা) অবশ্য এই টাকা দিবেন"[৬৪]। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, মেয়ে চরিত্রের আদর্শায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল 'মুকুল' -এর লেখকগোষ্ঠীর কাছে। এর পাশাপাশি 'মুকুল' এ নিয়মিত প্রকাশিত হত দেশ বিদেশের মহীয়সী রমণীদের কাহিনি—সম্ভবত পাঠিকাদের উজ্জীবিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সংযোজন করা হয়েছিল।

বিশ শতকে শিশু কিশোরদের জন্য বিস্তর লেখালেখি হতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই লেখার প্যাটার্নও পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রায় সমস্ত সংরূপেই নানা ভাবে উঠে আসতে থাকে মেয়েদের কথা। আমরা পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে তিনটি পৃথক সংরূপ অনুযায়ী আলোচনা করব। তাই এই পর্বে 'Random Sampling'-এর মত বিভিন্ন লেখা বেছে নিয়ে তা

বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকের তুলনায় বিশ শতকের পরিবর্তিত চালচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব। এর জন্য আমরা নির্বাচন করেছি বিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বেশ কিছু সংকলন গ্রন্থ, যেখানে বহু লেখকের বহুবিধ লেখার সমাহার ঘটেছিল। এই লেখাগুলির মধ্যে থেকেও অবশ্য কয়েকটি প্যাটার্ন লক্ষ করা যায়। সেগুলিকে সূত্রাকারে সাজানো যেতে পারে—

ক) ভাই-বোনের সম্পর্কসূচক গল্প-‘Siblings Relationship’-এর কথা

খ) বাৎসল্যের গল্প

গ) সাহসী মেয়েবেলা — ‘Superhero’দের গল্প

ঘ) বিচিত্র সম্পর্কের গল্প

উনিশ শতকে সমাজে ভাই-বোনের অস্তিত্ব ছিল না, তা মোটেও নয়। কিন্তু মেয়েদের ‘শৈশব’ এত দ্রুত অতিক্রান্ত হয়ে যেত, যে, সেই সম্পর্ক যাপনের জন্য আলাদা করে সময় তারা কেউই পেত না। তাই উনিশ শতকীয় লেখায় এই পারিবারিক সম্পর্কের কোনো গল্প আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে না। কিন্তু বিশ শতকে ছবিটি বদলে যায়। ভাই বোনেরা গল্পের পুরোভাগে চলে আসে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, নতুন শতকেও বোনেরা ভাইদের সমতুল হয়ে উঠতে আদৌ পারল কি? কীভাবে গড়ে উঠল তাদের সম্পর্কের বুনোট? দেখে নেওয়া যাক্।

‘সব সেরা ছুটির গল্প’-এ রতনতনু ঘাটি লিখেছিলেন ‘ঝাঙ্গুরলতা’ গল্পটি। কাঁকন ও সায়নের গল্প। এই গল্পে বাড়ি বা পাড়া-প্রতিবেশী, সকলের চোখে বোন কাঁকনের ‘বোকামি’ চোখে পড়ে, অন্যদিকে দাদা সায়নের ’বুদ্ধিমত্তা’র প্রতি সকলেরই তৈরি হয় অগাধ আস্থা। গল্পের কাহিনিবৃত্তে যে গল্পই থাকুক না কেন, এর বয়ানেই ধরা থাকে ভাই-বোন সম্পর্কের সামাজিক বৈপরীত্যমূলক দৃষ্টিকোণ। প্রায় একইরকম ধারণা ধরা পড়েছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘বুমবাইয়ের অমল জেঠু’ গল্পে। গল্পটি সংকলিত হয় ‘খুশির খেয়া’ সংকলনে। কল্পনাপ্রবণ বুমবাইয়ের বোন নুলির ‘পাকামি’তে বাড়ি অস্থির। বুমবাইয়ের ‘কল্পবিশ্ব’ নুলির কাছে ‘পরীতে পাওয়া’-এর সামিল। এহেন বুমবাইকে নিয়ে বাড়ির সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়লে নুলি স্নেহ-বঞ্চিত হতে থাকে—লেখক এঁকে চলেন নুলির অভিমানচিত্র—ঠিক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'মিনুর বাহাদুরি' গল্পে মিনুর মত। মিনুর দাদা 'ছেলে' হওয়ায় তার সামাজিক-পারিবারিক গুরুত্ব অনেকটাই যে বেশি, তা মিনু ক্রমশ বুঝতে পারে। গল্পের সূচনাবাক্যেই তার ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে—"দাদার কাছে পদে পদে এই হার আর মিনু কিছুতেই সইতে পারছে না"[৬৫]। এই হার-জিতের পাশে রয়েছে মায়ের বিধ্বংসী বক্তব্য-"ও ছেলে, ও বড়ো হয়ে কতো পয়সা রোজগার করে আনবে! তোরা মেয়েরা তো খালি শুষে নিস—তোদের জন্য যা খরচ, সে তো জলে ফেলা"। একজন মহিলার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় দীর্ঘদিনের লালিত পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসন। অভিমানী মিনু কিছুতেই বুঝতে পারেনা যে, কেন বড়ো হয়ে সে "এরোপ্লেন চড়ে বিলেত" যেতে পারবে না; কেনই বা সে "বাড়িতে বসে উনুন ফোঁয়াবে, বার্লি জ্বাল দেবে, কাঁথা সেলাই করবে"[৬৬]। শেষ পর্যন্ত মা বাবাকে মিনু বুঝিয়ে দিতে চায় যে, "মেয়ে হয়েছে বলে নিতান্ত ফ্যালনা নয়" এবং তাই সে দাদার পোশাক পরে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। হারিয়ে গেলে তার 'দাম' যে এক লহমায় 'ছেলের সমান' হয়ে যাবে, তা সেই একরত্তির মনেও গেঁথে দিয়েছে সমাজ। গল্পের শেষে মিনুকে যদিও খুঁজে পাওয়া যায়, লেখকও বলেন—"সে আরো বড় হবার স্বপ্ন দেখুক", তবু প্রশ্ন রয়ে যায়, 'Siblings Relationship'-এ 'Hierarchical Element'-এর কি 'Symmetrical Element'-এ আদৌ রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়?[৬৭]

আশাপূর্ণা দেবীর 'যেমন না বাড়ি' গল্পেও দেখা যায় প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দাদা ফুটবলের আত্মত্যাগের মহিমাময় সংকল্পে সামিল হতে চায় বোন মিচকি। কিন্তু ফুটবল তাতে ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলে, "তোর আবার কি? তুই তো মেয়ে"। মিচকির সপাট জবাব, " 'মেয়ে' 'মেয়ে' করবি না দাদা। মেয়েরা বুঝি কিছু পারেনা?" মিচকি পিতৃতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের উদ্দেশ্যেও 'নালিশ' জানায়, "মেয়েদের কেউ সঙ্গে নেয়? নিলে দেখিয়ে দিতো"[৬৮]। বিশ শতকের ভাই বোনেদের এই অসম সম্পর্কে বিন্যস্ত গল্পগুলি সনাতন বোধকে আঘাত করে; কিন্তু লক্ষণীয়, নতুন সময়ের শিশু-কিশোর সাহিত্য রূঢ় বাস্তবের এই অভিঘাত এড়িয়ে যেতে পারে না।

অর্থনৈতিক অভিঘাতে বিঘ্নিত হয়েছে বিশ শতকের শৈশব-কৈশোর—এ কথা আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছিল। প্রবোধকুমার সান্যালের 'অভিমান' গল্পে চোদ্দ বছরের বড় দিদির অনুর কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছিল ছোট বোন মনু। বিপুল দারিদ্র্য বা বড় দাদা দিলীপের বদমেজাজ—সব কিছু থেকেই মনুকে আগলে রেখেছিল মাতৃপ্রতিম অনু। কিন্তু দিদির বিয়ের পরেই পট পরিবর্তিত হয়ে যায়। বালিকা মনু হঠাৎ-ই পরিণত কিশোরী হয়ে ওঠে—দাদাকে রেঁধে খাওয়াতে শিখে যায় সে, আর্থিক অসংগতির কারণে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়—অনুর স্নেহচ্ছায়া ও অনুশাসনের অভাবে তার 'এলোমেলো দিন কাটে'—পাড়াবেড়ানির পরিচিতি ক্রমশ তার অস্তিত্বকে খাটো করতে শুরু করে। বিয়ের এক বছর পরে দামি সাজ-পোশাকে সজ্জিত তুলনায় উচ্চতর বিত্তের বাসিন্দা অনু পিত্রালয়ে এসে গৃহসজ্জা বা মনুর আচরণ--সমস্ত বিষয়কেই 'নোংরা' বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে। এমনকি, কানের দুল না পেলে 'লোভী' মনুকে 'চোর' অপবাদ দিতেও সে কুণ্ঠা বোধ করেনা। দুই সহোদরার সম্পর্ক আরো জটিল আকার ধারণ করে, যখন প্রকাশিত হয় এই সত্য যে, হঠাৎ-বড়লোক দিদিকে গ্রহণ করতে না পেরে মনু সত্যিই দুল লুকিয়ে রেখেছিল নিজের কাছে। বিত্ত তাদের দুজনের সম্পর্কের প্রতিবন্ধক বলেই সে দুল দুটো আস্তাকুঁড়েতে ছুঁড়ে ফেলে—দিদির বৈভবের প্রতীকী বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে সে লাভ করতে চায় 'অসীম মুক্তি'। ছোটদের জন্য এ ধরনের গল্প লেখা হলেও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এই সময়ের গল্পে অন্যতম উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।

বিশ শতকের সহোদর-সহোদরাদের সম্পর্কের গল্প সবসময়েই যে এমন বিষাদময়, নেতিবাচক, এমন কথা মোটেও ঠিক নয়। এর উল্টোপিঠেও রয়েছে অসংখ্য উদাহরণ—যেখানে 'Egalitarian Relationship' বা মিথোজীবী সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। এই ধরনের গল্পে যেহেতু মোচড় কম, অনেকটাই সরলরৈখিক, 'predictable' এবং তারা বিশেষ সময়চিহ্ন ধারণ করে থাকে না, তাই সেই সমস্ত গল্প এখানে সচেতনভাবেই আলোচনায় আনা হয়নি।

সময়ের একটি বিরাট পর্ব জুড়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কন্যাসন্তান আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। এখনও সেই রোগ পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। তাই কন্যাসন্তানকে কেন্দ্র করে বাৎসল্য রসাশ্রিত গল্প বহুল পরিমাণে রচিত হতে দেখা যায়নি। ‘সব সেরা ছুটির গল্প’-এ মঞ্জিল সেন লেখেন ‘কালু সর্দার’ ও উজ্জ্বলকুমার দাস লেখেন ‘রহিম মিঞার মুখে ডাকাতের গল্প’। দুটোই ডাকাত-কাহিনি। দুটি ক্ষেত্রেই ডাকাতের মন পরিবর্তনের ইঙ্গিত এবং সেখানে চালিকাশক্তি হল বাৎসল্য। কালু সর্দার ‘ডাকাত’ হয়ে উঠেছিল মা হারা মেয়ে রাধার দারিদ্র্যের কারণে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর পরে প্রতিশোধস্পৃহায়। আবার, মহাজনের নাতনী ঝুমার প্রতি অহৈতুকী স্নেহ তাকে চালনা করেছিল সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রত্যাবর্তনে। একইভাবে, দুর্ধর্ষ ডাকাত রহিমের মন নরম হয়ে যায় কিশোরী বাঁশরীর সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে। দশ বছর আগে মৃত মেয়ে মিনুর স্মৃতি চিত্তপটে ভেসে ওঠায় সে ঐ পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পটি। ‘কাবুলিওয়ালা’ ছোটদের জন্য লেখা গল্প বা ডাকাতের গল্প নয়। তবু সেখানে সামাজিকভাবে ভিন্ন স্তরে অবস্থিত দুটি চরিত্রের সমাপতন ঘটেছিল ছোট্ট মেয়ে ‘মিনি’র সূত্রে। বাৎসল্যে একীকৃত হয়ে গিয়েছিল দুই পিতৃসত্তা। উক্ত গল্পগুলিতে পিতৃহৃদয়ে কাঙ্ক্ষিত সেই স্থানটি খুঁজে পেয়েছে মেয়েরা।

মেয়েদের দীর্ঘকাল ধরে শেখানো হয়েছে যে, তারা কোমলপ্রাণ, ধীর-স্থির-শান্ত, অন্দরমহলই তার বিচরণক্ষেত্র—বহির্মুখী হওয়া তার নিতান্ত অপরাধ। কিন্তু বিশ শতকের কিশোরসাহিত্যে কোথাও কোথাও এই সামাজিক নিয়মে ‘মেয়েলি’ প্রবণতায় মেয়েদের চিহ্নিত করা থেকে বিরত হতে দেখা যায়। মেয়েরা কখনো বুদ্ধিবলে, কখনো বা বাহুবলে রহস্যের জট খোলে, অপরাধীকে আটক করে। মেয়েদের ‘Superhero’ ভাবার অভ্যেস বাঙালি সমাজ বা বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতা রপ্ত করতে পারেনি আজও। তবু তারই মধ্যে ব্যতিক্রম থাকে, কিছু কিছু গল্পে ধরা পড়ে এই সাহসিনীদের ক্রিয়াকলাপ—যা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক

সমাজের অনুমোদন না থাকায় এই ধরনের গল্প খুব একটা বিকাশ লাভ করতে পারেনা। সেই রকম কয়েকটি গল্পের নমুনা তুলে ধরা হল এখানে।

বহুলপঠিত গল্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বামা’। ডাকাত পরিবারের কিশোরী পুত্রবধূ শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তার জোরে একটি নিরপরাধের প্রাণ বাঁচায়। অকুতোভয় কিশোরীর এই পরিত্রাতা রূপ তাকে চানা ছকের বাইরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। শৈল চক্রবর্তীর ‘চোর হওয়া সহজ নয়’ গল্পটিতে মূল চরিত্রে রয়েছে ‘ডাকাবুকো’, ‘বুদ্ধিমতী’, ‘জিমন্যাস্ট’ পুপু। এই গল্পটি সংকলিত হয়েছিল ‘আরাধনা’ সংকলনে। রাত জেগে কৌশলে চোর ধরে পুপু তার বাড়িকে অঘটনের হাত থেকে উদ্ধার করে। লেখক পুপু চরিত্রে তথাকথিত ‘মেয়েলি’ ও ‘পুরুষালি’ উভয় বৈশিষ্ট্যেরই সমাবেশ ঘটিয়েছেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ‘ইস্পাতের ছোরা’ গল্পে দেখিয়েছেন নৃত্যগীতে পারদর্শী কিশোরী নন্দিনী কীভাবে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাবাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনে; আবার বাবার সামাজিক সম্মান রক্ষার্থে বাবার নির্দেশেই গৃহত্যাগী হয় হাসিমুখে। শুধুমাত্র দৈহিক লড়াইয়ে নয়, মানসিক লড়াইয়েও মেয়েদের ‘Superhero’ হিসেবে নির্মাণ করা হতে থাকে এই সময়ে। ইন্দিরা দেবী বিরচিত ‘ডাইনী’ গল্পটিও এইক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। বাবার সঙ্গী, মায়ের সহচরী এক কিশোরী চরিত্র এই গল্পে নির্মাণ করা হয়, যে বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যার পরিত্রাতা। এই মেয়েটি সেবাপরায়ণা, প্রত্যুৎপন্নমতি, দৃঢ়চেতা। তাই সমাজ যাকে ‘ডাইনী’ বলে চিহ্নিত করে, এই মেয়েটি নির্দ্বিধায় তার পাশে দাঁড়ায়। তাকে সাহায্য করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে। এই আলোচনার প্রথম দিকে আমরা মেয়ে চরিত্রের ‘আদর্শায়ন’ বিষয়ে কথা বলেছি। বিশ শতকের শিশু কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের চরিত্রে এই সমস্ত গুণাবলির সন্নিবেশ সেই প্রসঙ্গকেই পরিপুষ্ট করে।

আমরা বিশ শতকের ছোটদের বইয়ে আর একটি ধরন লক্ষ করি— তা হল, এই সময়ে বিচিত্র সম্পর্কের বিন্যাস নিয়ে নানাধরনের গল্প রচিত হতে শুরু করে। কিশোর-কিশোরীর সম্পর্কের সমীকরণ এই পর্বের অনেক গল্পেই সরলরৈখিক থাকেনা। আলোকপাত

করা যাক নির্বাচিত কিছু বিচিত্রগন্ধী গল্পে। ‘আরাধনা’য় সংকলিত তিনটি গল্প এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। চিত্তরঞ্জন মাইতির লেখা গল্প ‘কুশলের ঘোড়া’য় ঘোড়াচালক কোমলস্বভাবের পাহাড়ি কুশলের সঙ্গে ‘ডাকাবুকো’ ‘আধুনিকা’ আদ্যন্ত শহুরে মেয়ে রুমকীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ক্ষণিক সময়যাপনে তৈরি হওয়া অসমস্তরীয় বন্ধুত্বের কোনো পরিণতি লেখক দেখাননা, শুধু একটি নাম-না-জানা ‘সম্ভাবনা’য় লেখাটি শেষ হয়ে যায়। নটরাজনের লেখা ‘ডুবুরি’ গল্পে দেখানো হয় অভিজাত পরিবারের বালিকা কমলার সঙ্গে গরীব বাড়ির ছেলে জেকবের বন্ধুত্বকে। কমলার বিবাহের (অপরিণত কিশোরীর বিবাহ অবশ্যই) পর এই বন্ধুত্বে ধীরে ধীরে চিড় ধরে। গল্পের শেষে লেখক এই সম্পর্ককে অবলীলায় ‘ভ্রাতার প্রতি’ ‘ভগ্নীর স্নেহ’ বলে আপাত সরল ছাঁচে ঢেলে দেন। প্রশ্ন জাগে, বিবাহোত্তর কালে কমলার হৃদয়ে জেকবের উপস্থিতি কি বালিকা-কমলা ও বধূ-কমলার মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি করেছিল? ‘নির্মল বন্ধুত্বে’ কি ‘প্রেম’ নামক কোনো অনুভূতির মালিন্য স্পর্শ করতে শুরু করেছিল প্রাকৃতিক নিয়মে? আর সেই কারণেই কি সমাজের চাপে বদলে দেওয়া হল সম্পর্কের রসায়ন? দেখে নেব অমিতাভ চৌধুরির লেখা ‘রাজকুমারী ও কবিয়াল’ গল্পটি। এই গল্পটি মোটেও রূপকথাধর্মী গল্প নয়। বাস্তবের ভূমিতে এক রাজকুমারীর রোমান্টিসিজম তথা ফ্যান্টাসির গল্প। এই রাজকুমারীর সঙ্গে পরিচয় হয় এক কবিয়ালের। রাজপুত্রের বাহুবল রাজকুমারীকে আর আকর্ষণ করে না; সে জানায় পুরুষের পৌরুষ নিহিত থাকে তার বুদ্ধিমত্তায় ও সংবেদনশীলতায়। রাজকুমারীকে এ-ও বলতে শোনা যায় যে, “তুমি তো আমার কবিয়াল”[৬৯]। কিশোরীরা এই শতকে নিজের অধিকারবোধ দৃপ্তকণ্ঠে জানাতে আর ভয় পায় না। এই বয়ানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ‘Female Gaze’। এইভাবে বিশ শতকের ছোটদের জন্যে লেখা বইগুলিতেও মানব মনের অবচেতনে নিহিত অন্তর্লীন অনুভূতি প্রকাশ পেতে থাকে অনাম্নী বিচিত্র সম্পর্কের আখ্যানে। এই প্রবণতার কারণ হিসেবে নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে পরিবর্তিত সময়চিহ্নকে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের প্রেক্ষাপটে লেখা একটি শিশু-কিশোর উপন্যাসের উল্লেখ এই আলোচনায় করা যেতে পারে। উপন্যাসটির নাম ‘তুলো ফুড়কি ফুরুৎ’, লেখিকা পূর্ণশশী মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর বিচ্ছিন্ন আন্দোলন শিশুচিত্তকেও কীভাবে মথিত করেছিল, তা-ই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, অসম ও বাংলা—এই হল উপন্যাসটির ভৌগোলিক সীমানা। এই গল্পের মূল চরিত্র পুনুর বয়স বছর দশেক। রাঁচীতে তার পিসির বাড়ি থেকে বড়দির বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষ দেখতে এলে পিসেমশাই যখন বড়দি সম্পর্কে বলেন যে কমলা (বড়দি) “গৃহকর্মনিপুণা, রন্ধনপটিয়সী, সঙ্গীতজ্ঞা, সেবাময়ী, শিশু-পরিচর্যানিপুণা এবং দীর্ঘকেশী, স্বল্পাহারী, সুলক্ষণা”[৭০], তখন পুনু বিস্মিত হয়ে যায়। ‘ভালো মেয়ে’ হয়ে ওঠার এতো শর্ত তার জানা ছিল না। কিন্তু দেখা যায়, পুনু দিদির মতো এই ললিত গুণের লালন করতে মোটেও তৎপর নয়, বরং বাবা-কাকাদের ‘বিপ্লবী আন্দোলন’ এর আভাস তাকে আকৃষ্ট করে। অহিংস আন্দোলনরত এক কর্মীকে চোখের সামনে ব্রিটিশদের পদাঘাতে মৃত্যু বরণ করতে দেখে সে বিচলিত হয়, বাড়িতে বসে সে লিখে ফেলে— “মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গুজরাটেতে থাকেন/ অহিংসা আর অসহযোগের কথা তিনি বলেন/সে কথাটা শুনছে যারা মরছে লাঠি খেয়ে/ যারা শুনছে না দূর থেকে দেখছে তারা চেয়ে”[৭১]। সুকুমার মনে স্বাধীনতা আন্দোলন এভাবে ক্রিয়াশীল হতে থাকে—নিজেকে সে কখনো শিবাজী, কখনো বা ঝাঁসির রাণি লক্ষ্মীবাঈ মনে করতে শুরু করে। এমনকি, একদিন সে এই ঘোষণাও করে যে, দিদির মত সে মোটেও বিয়ে করবে না, কারণ সে ‘যুদ্ধ’ করবে। “মনে মনে ভাবে ও সহিংস বিপ্লবী হবে—অহিংস বিপ্লবী হয়ে সাহেবের বুটের লাথি খেয়ে মরতে হবে না। এবার ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে”[৭২]। এই গল্পেও দেখানো হয় যে মেয়েদের স্কুলে স্কুলে সেই সময় (১৯২২ সাল নাগাদ) ছোরাখেলা, লাঠিখেলা, যুযুৎসু ইত্যাদি শেখানো হচ্ছে। এই তথ্য এবং পুনুর প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করে যে স্বাধীনতা আন্দোলন সমাজের পূর্বনির্ধারিত ‘মেয়েবেলা’র সমান্তরালে এক বিকল্প ‘মেয়েবেলা’র পটভূমিও তৈরি করে দিয়েছিল।

আর একটি গল্পের উল্লেখ করে বিশ শতকের শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণের বিচিত্র 'পরিসর' বিশ্লেষণ শেষ করব। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'তা সে যতই কালো হোক' গল্পটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ এ প্রসঙ্গে। কোনো এক গল্প লেখককে মিনতি নামের এক কিশোরী চিঠি দেয় 'মেয়েদের গল্প' লেখার দাবি জানিয়ে। এর সঙ্গে সে এই কথাও বলে দেয়, যে ছোট মেয়েদের কথা লিখতে হলে তাদের 'জানা' ও 'বোঝা' জরুরি— শুধুই 'উপদেশ'-এ যেন ভারাক্রান্ত না হয়ে পড়ে সে গল্প। এখানে খুব সন্তর্পণে শিশু কিশোর সাহিত্য রচনার মূল সূত্রটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়। ছোটদের বইয়ে ছেলে চরিত্রের পাশাপাশি মেয়ে চরিত্রের কথা ও তাদের 'শৈশব-কৈশোর' কাহিনিও যে গুরুত্বের দাবিদার—এই সত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। লেখক-ও লিখতে শুরু করেন বয়ঃসন্ধির চৌকাঠে থাকা কালো মেয়ে সন্ধ্যা ও তার বিপ্রতীপে অবস্থিত পিসতুতো বোন চন্দনার গল্প। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার কথা মনে পড়ে এই সূত্রে। কিন্তু শৈলজানন্দ রূপ বনাম গুণের চিরাচরিত দ্বন্দ্ব দিয়ে গল্প শেষ করেন না — রূপ-গুণের ঊর্ধ্বে শিশুকিশোরের ব্যক্তিসত্তা জাগরণের মাধ্যমে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এভাবেই শিশু কিশোর সাহিত্য উনিশ শতকের তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে বিশ শতকে। উনিশ শতকের মেয়েদের তুলনায় বিশ শতকের মেয়েরা সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন দ্বারা অনেক বেশি পরিমাণে প্রভাবিত হয়— তার ছাপ পড়ে শিশু-কিশোর সাহিত্যেও। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দাঁড়িয়েও মেয়েদের স্বর অনুরণিত হয় এই সময়ের লেখায়। নৈতিকতার মানদণ্ডে পরিবর্তন সূচিত হওয়ার ফলে মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গপরিচিতির চিহ্নেরও বদল ঘটে। সংখ্যায় কম হলেও বিশ শতকে এই ধরনের ব্যতিক্রমী লেখা নেহাৎ সামান্য নয়। সংগৃহীত সমস্ত কাহিনি একটি লেখায় সীমায়িত করা অসম্ভব। অন্যত্র সেই বিষয়ে আরও বিশদে আলোচনা করা যেতে পারে। এই সময়ে লেখা 'ভূতের গল্প' বা 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প'-এ মেয়েদের শৈশব বা কৈশোর খুব একটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত নয় বলে সংরূপগতভাবে ওই দুই ধারা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্তর্গত হলেও তা নিয়ে কোনো আলোচনা এখানে করা হয়নি।

তথ্যসূত্র ::

১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, "খুকুমণির ছড়ার ভূমিকা", প্রবীর সেন সম্পাদিত, 'পাতাবাহার: বাংলা শিশুসাহিত্য ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার' সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৬, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ৯৬

২। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, পৃ.৩

৩। তদেব, পৃ. ১০ (নিম্নরেখ গবেষককৃত)

৪। তদেব, পৃ. ১৩ (নিম্নরেখ গবেষককৃত)

৫। প্রমদাচরণ সেন, "প্রস্তাবনা", অরুণা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'সখা, সখা ও সাথী-১', কলকাতা, কল্লোল, ২০০২, পৃ. ১৫

৬। তদেব, পৃ. ১৫

এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে, 'সখা'য় বিশেষভাবে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ থাকত 'বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা'। ১৮৮৩ সালের জুন মাসে তাতে প্রমদাচরণ সেন লিখেছিলেন বালিকাদের 'পোষাক' এবং 'চন্দ্রপুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম'-এর মত প্রবন্ধ। ঐ বছরেরই জানুয়ারি মাসে তিনি লিখেছিলেন 'মেয়েরা আমাদের কে?' নামের একটি প্রবন্ধ, যেখানে তিনি মেয়েদের 'সুশিক্ষিতা' হওয়ার পাঠ দিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধ সমূহ হয়তো বিতর্কের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে, তবে 'সখা'র সম্পাদক ও লেখকগোষ্ঠী বালিকা-সংক্রান্ত রচনা সৃষ্টিতে যে উদবুদ্ধ হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

এছাড়া, 'শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষা' সিরিজে প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ে বালক-বালিকাপাঠ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ('উপদেশ') লিখেছিলেন। এর শেষ অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করা যাক— "বাঙ্গালী পরিবারের যত অকালমৃত্যু, শোক, দারিদ্র্য, রোগ, দেশের যত অভাব সকলই এই বাল্য বিবাহ জনিত। অতএব সাবধান! এই রাক্ষসকে সমূলে বিনষ্ট কর"।

এই ধরনের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে শিশুপাঠ্য পত্রিকা হিসেবে 'সখা' বা 'সখা ও সাথী' হয়ে উঠেছিল ব্যতিক্রমী।

৭। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য', কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, পৃ. ২০ (নিম্নরেখ গবেষককৃত)

৮। তদেব, পৃ. ২১ (নিম্নরেখ গবেষককৃত)

৯। তদেব, পৃ. ১৮ (নিম্নরেখ গবেষককৃত)

১০। শিবনাথ শাস্ত্রী, "মুকুল কাহাদের জন্য", অসিতাভ দাশ সম্পাদিত, 'সেরা মুকুল (সংকলন)', কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ.

১১। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫

১২। তদেব, পৃ. ৩৮

১৩। তদেব, পৃ. ৭৩

১৪। তদেব, পৃ. ১১৪

১৫। তদেব, পৃ. ৮৫

১৬। তদেব, পৃ. ৯৭

১৭। তদেব, পৃ. ৮৮

১৮। তদেব, পৃ. ৯০

১৯। স্বপন বসু সম্পাদিত, 'অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ: ১ম খণ্ড', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮, পৃ. ৩১৯

২০। তদেব, পৃ. ৩১৯

২১। তদেব, পৃ. ১৯-২০

২২। আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত, 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬, পৃ. ১১৪

২৩। তদেব, পৃ. ১১৫

২৪। সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'প্রবন্ধ সংগ্রহ-১', কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৪, পৃ. ১৭৬-১৭৮

২৫। 'বিষ্ণু ধর্মসূত্রে' বলা হয়েছে, "পতিপুত্রহীন রমণীর রন্ধিত এবং পরিবেশিত অন্ন খেলে একশ বছর তপ্ত লৌহকুণ্ডে বাস করতে হয়"। অর্থাৎ, স্বামীপুত্রহীন নারীর সামাজিক স্থানটি নির্ধারিত হয়েছিল অমানবিক স্তরে। সূত্র—কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ধর্ম সংস্কার ও কুসংস্কার', কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭, পৃ. ৪৩

২৬। আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত, 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬, পৃ. ১২৭-১২৮,

২৭। তদেব, পৃ. ১৫৭

২৮। উক্ত বক্তব্যের বিপরীতে একটি মনুসংহিতার একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে-- "স্ত্রিয়াস্ত রোচমানায়াং সর্বং তদ্রোচতে কুলম্"—স্ত্রীলোক দীপ্তিময়ী হলে সেই সমগ্র কুল কান্তিমান্ হয়। প্রশ্ন জাগে, মনুসংহিতার পাঠ যখন তৎকালীন সমাজপতিরা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্রহণ করছিলেন, তখন এই 'দীপ্তি'র প্রসঙ্গ শিশুশিক্ষার পরিসর থেকে লুপ্ত হয়ে গেল কীভাবে?

২৯। আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত, 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬, পৃ. ১৯৬

৩০। তদেব, পৃ. ২০৫

৩১। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে কমেনিয়াসের 'সেন্স-রিয়ালিজম্' বা "Learn as much as possible from the great book of Nature" এর ধারণাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৩২। আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত, 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬, পৃ. ২১৯

৩৩। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আবার শিশুশিক্ষা', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০০৫, পৃ. ৪৭

৩৪। আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত, 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬, পৃ. ২১ (নিম্নরেখ গবেষককৃত)

৩৫। আশিস খাস্তগীর, "উনিশ শতকে বঙ্গনারীর বই", স্বপন বসু ও গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, 'পুরোনো বাংলা বই', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৬, পৃ. ৪৩ (নিম্নরেখ গবেষককৃত)

৩৬। তদেব, পৃ. ৪৩

৩৭। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আবার শিশুশিক্ষা', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০০৫, পৃ. ৭৮

৩৮। তদেব, পৃ. ৭৯

৩৯। গোলাম মুরশিদ, 'নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী', কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০১, পৃ. ১৯

৪০। তদেব, পৃ. ২২

৪১। উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষার সম্পর্কে যে বইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তার একটি তালিকা প্রদান করেছেন স্বপন বসু তাঁর 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা' বইতে। বিশদে জানতে হলে- স্বপন বসু সম্পাদিত, 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ- এই বইটির ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

৪২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা-২', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৯

৪৩। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ১৮৩১ সালে জনৈক ব্যক্তি লেখেন, "শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই"। ১৮৩৪ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় এর বিপরীতমুখী বক্তব্য উঠে আসে 'কস্যচিৎ হিন্দোঃ'র কলমে, "শাস্ত্রের কোনো স্থানেই স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষাতে নিষেধ নাই"। উপরের উদ্ধৃতিদুটি দৃষ্টান্তমাত্র। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা-২', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ – বইটিতে।

৪৪। গোলাম মুরশিদ, 'নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী', কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০১, পৃ. ২৮

৪৫। ঈশ্বরগুচন্দ্র গুপ্ত, "দুর্ভিক্ষ", বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'কবিতা সংগ্রহ: প্রথম খণ্ড', কলিকাতা, ১৮৮৫, পৃ-১২১-২২

৪৬। বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, পৃ. ২২৩

৪৭। গোলাম মুরশিদ, 'নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী', কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০১, পৃ. ৩৬

৪৮। তদেব, পৃ. ৩৮

৪৯। স্বপন বসু সম্পাদিত, 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮

৫০। গোলাম মুরশিদ, 'নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী', কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০১, পৃ. ৩৯

৫১। ১৮২০ সাল নাগাদ অভিজাত ঘরের মেয়েরা খ্রিস্টান মিশনারিদের স্কুলে যাওয়ার অধিকার পেত না। তাই বাড়িতে মেম সাহেবদের সাহায্যে লেখাপড়া হত। শিবসুন্দর রায়ের কন্যা হরসুন্দরী, ঈশানচন্দ্র মুস্তাফি তাঁর কন্যা শিবসুন্দরী দেবী, কলকাতার বাইরে ফয়জুন্নেসা এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছিলেন।

৫২। গোলাম মুরশিদ, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', ঢাকা, অবসর, ২০০৬, পৃ. ২৪১

৫৩। ১৮৪২ সালে একজন মহিলা সম্ভবত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় 'স্বাধীন মনে' কলকাতায় আসার কথা লিখেছিলেন বলে জানাচ্ছেন গোলাম মুরশিদ। ১৮৬০-এর দশকে এটি সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে জনপ্রিয়

হয়। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা থেকেই 'স্ত্রীস্বাধীনতা' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সূত্র: গোলাম মুরশিদ, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', ঢাকা, অবসর, ২০০৬, পৃ. ২৫০

৫৪। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব', অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৫

৫৫। সুবিমল মিশ্র সম্পাদিত, 'মধুসূদন মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-দ্বিতীয় খণ্ড', কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২০১২, পৃ. দুই-ভূমিকা

৫৬। তদেব, পৃ. তিন-চার-ভূমিকা

৫৭। তদেব, পৃ. ৯-১৩

৫৮। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত, 'বালক' গ্রন্থাকারে একত্র দে'জ সংকলন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৭, পৃ-৭৯

৫৯। যশোধরা বাগচী, 'নারী ও নারীর সমস্যা', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১২, পৃ. ৭৯-৮৬

৬০। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ৩৯

৬১। তদেব, পৃ. ৪০

৬২। যশোধরা বাগচী, 'নারী ও নারীর সমস্যা', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১২, পৃ. ৩২

৬৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, "মুকুল কাহাদের জন্য", অসিতাভ দাশ সম্পাদিত, 'সেরা মুকুল (সংকলন)', কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, ১৯৯৯

৬৪। তদেব, পৃ. ২১১

৬৫। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত, 'শতাব্দীর সেরা শিশুসাহিত্য (২য় খন্ড, গল্প সমগ্র)', কলকাতা, পুনশ্চ, পৃ. ৬৭

৬৬। তদেব, পৃ. ৬৮

৬৭। তাত্ত্বিক ডেভিড লেভি ১৯৪১ সালে 'Siblings Rivalry' পরিভাষাটি প্রয়োগ করেছিলেন সহোদর-সহোদরার পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস বোঝাতে। এই সম্পর্কের 'Hierarchical' বা 'Egalitarian'—উভয় সম্ভাবনার কথাই বলেছেন তিনি। মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড বা আডলার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। বিশদে জানার জন্য দ্রষ্টব্য:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sibling_rivalry, on 01.03.2018 at 8pm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956653, on 01.03.2018 at 9.46pm

৬৮। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোট মেয়েরা', কলকাতা, গাংচিল, পৃ. ১২৯

৬৯। 'আরাধনা', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৮৪, পৃ. ৩০৫

৭০। পূর্ণশশী মুখোপাধ্যায়, 'তুলো ফুড়কি ফুরুৎ', কলকাতা, মাইন্ডস্কেপ, ২০০৮, পৃ. ১৪

৭১। তদেব, পৃ. ২৪

৭২। তদেব, পৃ. ২৮

তৃতীয় অধ্যায়

ছোটদের ছড়া ও মেয়েদের আখ্যান

বাংলা সাহিত্যে ‘ছড়া’ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সংরূপ। ছড়ার প্রাথমিক পরিচিতি লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসেবে। পরে অবশ্য যখন সচেতনভাবে ছড়া লিখিত হতে শুরু করে, তখন থেকে তা অভিজাত সাহিত্যের অন্তর্গত হয়। তবে আমাদের আলোচনা ছড়ার এই প্রচলিত পরিচিতির বাইরে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত একটি শ্রেণি হিসেবে।

বাংলার প্রান্তিক জনজীবনে ছড়া বহুকাল ধরে প্রচলিত। তার উৎস, রচয়িতা, রচনাকাল প্রায় সবটাই অজানা, অনুমাননির্ভর। কিন্তু মৌখিক পরম্পরায় বাহিত এই ছড়াগুলি যেহেতু সামাজিক ও ঐতিহাসিক দলিল, সেহেতু উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে ছড়া সংগ্রহ ও সংকলনের বিশেষ উৎসাহ লক্ষ করা যায় পণ্ডিত মহলে। ছড়ার মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণের উদ্যোগে এক ধরনের জাতীয়তাবাদী মানসিকতার উন্মেষ ঘটে। এই সময়ের অন্যতম প্রধান ছড়া সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০১ বঙ্গাব্দে লিখিত ‘লোকসাহিত্য’ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘ছেলেভুলানো ছড়া’ প্রবন্ধ দুটিতে মোট ৮১ টি ছড়ার উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব তাঁরই সংগৃহীত ছড়াগুলি অবলম্বন ক’রে, তাঁরই কথার সূত্র ধরে। কারণ, তিনিই আমাদের সর্বপ্রথম ভাবতে শেখান যে, বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছড়াগুলি শুধুই লোকসাহিত্য নয়, তার মূল আবেদন হৃদয়ের কাছে, শিশুমনের কাছে; অতএব, এগুলি নিঃসন্দেহে শিশুসাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলির ভিতরে একধরনের ‘চিরত্ব’ বা চিরকালিনতার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। বলেছেন, “এই স্বাভাবিক চিরত্ব-গুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।”[১] তাঁর মতে, ‘শিশু’ এই ধারণাটিও ‘অপরিবর্তনীয় পুরাতন’। ‘নবীন চিরত্বের’ এই সমীকরণ অনুযায়ী তাঁর আবার মনে হয়েছে ‘ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য’। ছড়ার উদ্ভবের পিছনে যত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদানই ক্রিয়াশীল থাকুক না কেন, আমরা সকলেই স্বীকার করি যে এগুলির প্রয়োগ করা হত শিশুর মন ভোলাতে। যে কোনো শিশুর ‘শৈশব’ নির্মাণের সঙ্গে ছড়ার ওতপ্রোত সংযোগ। প্রাপ্তবয়স্কের ছড়া বিশ্লেষণের

সময় তাই বারবার উত্থাপিত হয় রোমান্টিকতা ও স্মৃতিমেদুরতা-প্রসঙ্গ। ছড়া বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-ও একাধিকবার অতীতচারণা করেছেন এ-কারণেই। শুধু লোকসাহিত্য হিসেবে ছড়া মানবমনের এই গভীর তল স্পর্শ করতে পারতো না। শিশুসাহিত্য বলেই এত সুদূরপ্রসারী হ'তে পেরেছে ছড়াগুলি।

লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য—ছড়ার এই দ্বান্দ্বিক অবস্থান নিয়ে আলোচনার পরেই আমরা প্রবেশ করবো আমাদের আলোচনার মূল পর্বে। ছড়াগুলিতে মেয়েদের কথা কীভাবে বিধৃত হয়েছে, আমরা তা দেখতে চাইব এই অধ্যায়ে। মৌখিক পরম্পরায় স্থানান্তরে এবং কালান্তরে বাহিত এই ছোটদের ছড়াগুলিতে মেয়েদের অবস্থান দুরকম—কথক হিসেবে ও চরিত্র হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন সেই চিরকালীন 'স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ'-এর, যা থেকে এই ছড়াগুলি ধ্বনিত হ'ত। কখনো কখনো এই পল্লিরমণীরাই হতেন ছড়ার রচয়িতা—যা লেখকের মতো 'মর্যাদাভীরু গম্ভীরস্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী' থেকে 'ক্ষরিত' হওয়া অসম্ভব বলেই মনে করেছেন তিনি।[২] সুতরাং লেখক শিশুমন ও প্রাপ্তবয়স্কমন উভয়ক্ষেত্রেই ছড়ার এই চিরকালীন আবেদনটি গড়ে ওঠার পেছনে কথক ও কখনো রচয়িতা হিসেবে সরল পল্লিবালাদের যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি, এই কারণেই ছড়াগুলি অভিহিত হয়েছে 'মেয়েলি ছড়া' হিসেবে; কোনো নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ছড়ায় মেয়েদের গুরুত্ব স্বীকারার্থে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়াগুলিতে অনুভব করেছিলেন 'স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন' 'সৌকুমার্য' — যাকে তিনি বলেছেন 'বাল্যরস';[৩] এবং এ-ও বলেছিলেন যে, "ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য-বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।"[৪] এই বক্তব্য নিশ্চিতরূপেই গ্রহণীয়, কিন্তু, যখনই এই ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন পড়ে, তখনই এমন কিছু অন্যরকম প্রসঙ্গ আসে, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল

ছড়াতে চরিত্রের পরিমাণগত ও গুণগত দিক দিয়ে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে অসাম্য। শিশু মনোরঞ্জনই যে সংরূপের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে চরিত্র হিসেবে মেয়েদের একপ্রকার ব্রাত্য করেই রাখা হ'ল, যেন শিশু হিসেবেও তারা পুরুষ শিশুদের তুলনায় কিঞ্চিৎ পৃথক। আবার, যে সংরূপের চালিকা তথা বাহিকাশক্তি মহিলারা, সেই সংরূপে মেয়েরা যে চরিত্র হিসেবে ছেলেদের সমান গুরুত্ব পেল না কেন, এ বেশ বিস্ময়কর— এগুলিই বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া: ২'-এ মোট ৮১ টি ছড়া সংকলন করেছেন। তার আগের প্রবন্ধে তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন আরো বেশ কিছু ছড়ার। আপাতত আমরা সেই ছড়াগুলির সূত্র ধরেই এগোব। এছাড়া প্রয়োজনে নির্দেশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক ছড়াসমূহ। 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামকরণটির দিকে প্রথমে নজর দেওয়া যাক। 'ছেলে' অর্থে লিঙ্গ-নির্বিশেষে সন্তান—ব্যাপ্তি বোঝাতে প্রয়োগ এই শব্দের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও এই প্রচলিত নামকরণ থেকে বেরোলেন না, 'মেয়ে' শব্দটিকে 'লিঙ্গ-নির্বিশেষ সন্তান'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করলেন না--আমরা 'মেয়েভুলানো ছড়া' পেলাম না!

উক্ত 'ছেলেভুলানো মেয়েলি ছড়া'য় মেয়েদের ছবি যেভাবে বারবার উঠে এসেছে, তাকে কয়েকটি আঙ্গিক থেকে দেখা যেতে পারে—

১। বিবাহ-উদ্যোগ প্রসঙ্গ

২। বিবাহিত জীবনচিত্র

৩। সামাজিক চাহিদা ও মেয়েদের পরিচিতি, ইত্যাদি।

আপাতত আমরা উক্ত কয়েকটি প্রসঙ্গের নিরিখে ছড়ায় চর্চিত মেয়েদের কাহিনি লক্ষ করব।

মেয়েদের কথা পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে ছেলেদের তুলনায় নিতান্ত সামান্য, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। গুণগত/আচরণগত দিক দিয়েও সমবয়সী ছেলে ও মেয়েদের প্রতি ছড়াকার বা সমগ্র সমাজেরই ছিল বৈষম্যমূলক দৃষ্টি — ছড়াগুলি এই ভাবনাই প্রকাশ করে।

বাংলার সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল ‘গৌরীদান প্রথা’—আট বছরের মধ্যে কন্যাকে পাত্রস্থ করে নিজেদের কৌলীন্য ও বংশ মর্যাদা রক্ষার পাশবিক চাহিদা। সেই ছবি অবিকৃতভাবে উঠে এসেছে ছড়াগুলিতে। “যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।/যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে”[৫] বা “আজ দুর্গার অধিবাস,কাল দুর্গার বিয়ে।/দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদায়ে”[৬]— এই ছড়াগুলিতে কন্যার বিবাহযাত্রার উদ্যোগপর্বটি ধরা পড়েছে। দ্বিতীয় ছড়াতে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে সমগ্র পরিবারের বিরহবিধুর অবস্থার। আমাদের অতি পরিচিত একটি ছড়া—“দোল দোল দুলুনি।/ রাঙা মাথায় চিরুনি।।/বর আসবে এখনি।/নিয়ে যাবে তখনি।।/ কেঁদে কেন মর।/আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর কর”—এখানে “আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কত দিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে”[৭] বলে মনে করেছেন লেখক। আমাদের বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে বিস্ময় জাগে, যে দোলনায় দুলুনিরত একটি শিশুকন্যাও মায়ের মনে সেই সময় বিবাহ-সংক্রান্ত বিচ্ছেদভাবনাকেই একমাত্র জাগিয়ে তুলতো এবং কন্যাসন্তান যে নিজগৃহেও পরবাসী— এই কথা মা নিজের অজান্তেই শিশুমনে প্রবেশ করাতে শুরু করে দিতেন। কন্যার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাধ-আহ্লাদ—এই সবকিছুর ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বিবাহের মানদণ্ডেই মেয়েদের দেখা হয়ে এসেছে দীর্ঘকাল ধরে। তাই পিতা-মাতার কন্যা-কেন্দ্রিক যাবতীয় আকাঙ্ক্ষাও আবৃত্ত হয়েছে বিবাহ-প্রসঙ্গে। মেয়েকে ভালোবেসে বলতে শোনা গিয়েছে—“পুঁটুমণি গো মেয়ে/ বর দিব চেয়ে।।/ কোন গাঁয়ের বর।/ নিমাই সরকারের বেটা পালকি বের কর।।/ বের করেছি বের করেছি ফুলের ঝারা দিয়ে।/ পুঁটুমণিকে নিয়ে যাব বকুলতলা দিয়ে।”[৮] একই ধরনের আরো একটি ছড়ার উল্লেখ করে মেয়েদের বিবাহ-যাত্রা প্রসঙ্গটি শেষ করা যাক। “দোল দোল দোলানি।/ কানে দেব চৌদানি।।/ কোমরে দেব ভেড়ার টোপ।/ ফেটে মরবে পাড়ার লোক।।/ মেয়ে নয়কো সাত বেটা--/ গড়িয়ে দেব কোমরপাটা।।/ দেখ্ শত্তুর চেয়ে--/ আমার কত সাধের মেয়ে”—এই ছড়াটিও কন্যার বিবাহ-সজ্জা বা উদ্যোগকে কেন্দ্র করে পিতা-মাতার

আহ্লাদ প্রকাশ করে। কিন্তু ছড়ার শেষ বাক্যটিকে প্রশমিত করে যে ভাবনাটি এখানে এসে যায়, তা হ'ল পারিবারিক প্রতিপত্তির উলঙ্গ প্রকাশ—যেখানে মেয়ের বিয়ের আড়ম্বর পরিণত হয় এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতার স্মারক হিসেবে।

বাংলার যে হতভাগিনীদের অতি অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত একটা সময়ে, তখন কেমন কাটতো তাদের সেই জীবন, সেই মর্মন্তুদ কাহিনিও ধরা পড়েছে ছড়াগুলির বয়ানে। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান/ শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।/এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।/এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান"[৯] -- বহু পরিচিত এই ছড়াটিতে খুব স্পষ্ট বলা রয়েছে কুলীন স্বামীর বহুবিবাহ প্রসঙ্গ ও সতীনদের সঙ্গে সংসার করার যন্ত্রণার কথা। পাঁচ স্তবকে বিন্যস্ত প্রেমিকার মন-ভোলানিয়া একটি ছড়াকে লেখক দেখতে চেয়েছেন নারীজাতির স্তবগানের 'সহজ সরল চিত্র' হিসেবে। সেখানে প্রেমিকপ্রবরটিকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, পৃথিবীর চারটি 'তিতো' বস্তুর একটি নিঃসন্দেহে 'বোন-সতীনের ঘর'।[১০] বোঝা যায়, তৎকালীন সমাজে বহুবিবাহ ছিল এক ব্যাধি-স্বরূপ। কন্যার শ্বশুরবাড়ি বিষয়ে মেয়ের পিতৃকুলের তটস্থ হয়ে থাকা ছিল অতি স্বাভাবিক বিষয়। তাই, পুঁটুর শ্বশুরবাড়ি প্রয়াণের সময় সঙ্গী হিসেবে 'কুনো বেড়াল', খাবার হিসেবে 'সরু ধানের চিঁড়ে', বাহন হিসেবে চার কাহারের বয়ে-নেওয়া পা কি, সেবিকা হিসেবে 'চার দাসী'র পাশাপাশি 'উড়কি ধানের মুড়কি'ও দেওয়া হয় 'শাশুড়ি ভুলাতে'। কন্যাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা পিতামাতাকে যেন আজীবন বহন করে চলতে হয়। কৌলীন্য বজায় রাখতে গিয়ে কখনো কন্যাকে উৎসর্গ করতে হ'ত অপাত্রে — কন্যার পক্ষে অসম্ভব হ'ত সেই সম্পর্ক ছেদ করে আসা। ছড়া হয়ে উঠত সেই নিরুপায় মেয়েদের ভাষ্য—"চোখ খাও গো বাপ-মা,চোখ খাও গো খুড়ো/এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাকখেকো বুড়ো।।/বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে।/নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।"[১১] তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির আদরের কন্যারত্নটি পরের বাড়িতে তিরস্কৃত হ'ত, আবার 'দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা' বা 'ঘরের বধূ-শাসন'-এর দায়িত্ব

পালন করত আত্মীয়পরিজনেরা—এই ছবিও ধরা পড়েছে ছড়ায়—মেয়েরা সেই সময় পরিণত হয়েছিল হাতের পুতুলে। যেমন, “আয়ী গো চিনতে পার?/গোটাদুই অন্ন বাড়ো।।/অন্নপূর্ণা দুধের সর।/কাল যাব গো পরের ঘর।।/পরের বেটা মারলে চড়।/কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর।/খুড়ো দিলে বুড়ো বর।।/হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।/থুয়ে আয়গা মায়ের বাড়ি।।/মায়ে দিল সরু শাঁখা বাপে দিল শাড়ি।/ভাই দিল হুড়কো ঠেঙা চল শ্বশুরবাড়ি”[১২]— এই ছড়াটি থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গার্হস্থ্য হিংসার ছবি পরিস্ফুট হয়। যদিও এর বিপরীত দৃশ্যও চোখে পড়ে ক্বচিৎ কদাচিৎ—“ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্/এ পারেতে লংকা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।/গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।।/এ মাসটা থাক্ দিদি, কেঁদে ককিয়ে।/ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে।।/ হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।/আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।”[১৩] এখানে ‘ভাই’ তার দিদির প্রতি সদয়; কিন্তু তার সমবেদনার ঊর্ধ্বে যে বিষয়টি ফিরে আসে,তা হল কোনো এক হতভাগিনীর দুর্বিষহ দিনযাপন-যন্ত্রণা। ছড়াগুলির উদ্ভব যদিও শিশুর মন ভোলাতে তবুও সেগুলিতে পুনরাবৃত্ত মোটিফ হিসেবে ধরা দিয়েছিল মেয়েদের সামূহিক করুণ পরিস্থিতি। সমগ্র বাংলার অন্তর্বেদনার প্রকাশস্থল হিসেবে যেন ছড়ার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল!

মেয়েদের বিবাহ-প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে ছড়ায় তাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু ও কীভাবে, তা এবার দেখে নেব রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ছড়ার তালিকা এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। মেয়েদের একটি ছবি ছড়ার পাতায় খুব পরিচিত, তা হ’ল পুকুরের জলে স্নান করতে নেমে নানা মেয়েলি ক্রিয়াকলাপের। যেমন—“ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে।/ ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে”[১৪], আবার, “দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে।/মোটা মোটা চুলগুলি গো পেতে বসেছে।/চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে নেগেছে।/গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে।/পরণে তাদের ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে”[১৫], অথবা, “পুঁটু নাচে কোন্‌খানে।/ শতদলের মাঝখানে।/সেখানে পুঁটু কী করে।/চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে।/ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে।”[১৬]

এই সবকটি ছবিতেই মেয়েদের পুকুর পাড়ে স্নানের বর্ণনা। আসলে সে যুগে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ছাড়া মেয়েরা শুধুমাত্র পুকুরপাড়ে যাওয়ারই সম্মতি পেত, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে। ছড়ায় খোকা যেখানে 'লাল জুতুয়া' পায়ে বেড়াতে বেরোয়, ক্ষীর নদীর কূলে সাগরেদ সহ মাছ ধরতে যায়, দোলায় চেপে সদলবলে 'ছ পণ কড়ি' গুণতে গুণতে আয়েস ক'রে চলে, অন্য কারোর নৌকোয় চ'ড়ে ঘুরে আসে, সেখানে মেয়েদের দৌড় ঐ পুকুর পাড় অবধি। এই ঘটনা মেয়েদের চলাফেরার যে গণ্ডি, তার সীমিতি প্রকাশ করে। ছড়ায় অবশ্য ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে লেখাপড়ার কোনো উল্লেখ নেই, যদিও 'দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে' — অতি পরিচিত এই পংক্তিটি পুরুষের শিক্ষা বা হিসেব-নিকেশ সংক্রান্ত কোনো কাজে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টির আভাস দেয়; যেখানে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ হয় শুধুই অন্দরমহলের কাজ—"বর আসছে বাঘ্‌নাপাড়া।/বড়ো বউ গো রান্না চড়া।।/ছোটো বউ লো জল্‌কে যা"[১৭]—যদিও রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্যটিকে ব্যাখ্যা করেছেন "জামাতৃসমাগমপ্রত্যাশিনী পল্লীরমণীগণের ঔৎসুক্য"[১৮] বলে, তবু এর বাইরে অন্যরকম কোনো কাজে মেয়েদের কোনো ভূমিকা আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। আরো একটি পরিচিত খেলার ছড়া দেখা যাক—"এলাটিং বেলাটিং সই লো/কিসের খবর আইলো/রাজা মশাই একটি বালিকা চাইলো/কোন্‌ বালিকা চাইল?" এবং এর পরে জনৈক বালিকার নাম উল্লেখ করে তাকে রাজামশাই এর কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই আপাত নিরীহ ছড়ার মধ্যে দিয়ে 'রাজা' নামক ক্ষমতাতন্ত্রের কাছে মেয়েটি বা মেয়েগুলি ইতিমধ্যেই পণ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এইরকম নিষ্ঠুর ঘটনা কিন্তু কখনোই ছেলে শিশুটির সঙ্গে ঘটেনা। শিশুপুত্রটি জানে, বেড়িয়ে আসার পর তার জন্য তৈরি থাকবে 'দুধের বাটি তপ্ত', ভাতের সঙ্গে থাকবে "নদীর কূলে চিংড়িমাছ বাড়ির বেগুন দিয়ে"[১৯] "সয়দাবাদের ময়দা, কাশিম-বাজারের ঘি"[২০] দিয়ে ভাজা হবে লুচি — কারণ, "খোকা যাবে নায়ে, রোদ লাগবে গায়ে--/লক্ষ টাকার মল্‌মলি থান সোনার চাদর গায়ে" — এত আয়োজনের কারণ সে হ'ল 'খোকা'—বংশের ধারক-বাহক, পুরুষতন্ত্রের

খুদে সদস্য। এই পর্বের শেষ উদাহরণে আসি—কান্নাকাটি সকল শিশুর আদিম প্রবৃত্তি। শিশুপুত্র কাঁদলে চারিদিকে তাই হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়—“কিসের লাগি কাঁদ খোকো কিসের লাগি কাঁদ।/কিবা নেই আমার ঘরে।/আমি সোনার বাঁশি বাঁধিয়ে দেব--/মুক্তা থরে থরে”;[২১] অন্যদিকে শিশুকন্যা কাঁদলে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ছবি—‘আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা শাঁটুল/শ্যামলা গেলো হাটে/ শ্যামলাদের মেয়েগুলি পথে বসে কাঁদে।/আর কেঁদো না, আর কেঁদো না/ছোলাভাজা দেব/আবার যদি কাঁদ তবে/তুলে আছাড় দেব’। মেয়ের কান্না ভোলানোর জন্য ‘সোনার বাঁশি’ কবির কল্পনাতেও উদয় হয় না, তাদের ভাগ্যে জোটে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ‘ছোলাভাজা’র প্রলোভন আর তারপরেও কান্না না থামলে প্রায় হুমকি দেওয়া হয়—“আবার যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দেব” –এই বৈষম্যমূলক বক্তব্য এমন চূড়ান্ত বৈপরীত্যের প্রতীক, যেখানে শিশুপুত্রের অভিভাবকদের সাধ্যাতিরিক্ত সকল রকম আকাঙ্ক্ষা উস্‌কে দেয় আর শিশুকন্যার জন্য বরাদ্দ করে দেয় তার চরম পরিণতি, যা একটি শিশুর কাছে যেন মৃত্যুর নামান্তর!

এইভাবে আমরা দেখতে পাই, খুব আলগোছে ‘ছেলেভুলানো ছড়া’ রচিত ও বাহিত হয়ে এলেও তাকে স্পর্শ করে থেকেছে ‘সময়’; সামাজিক চাহিদা আর ‘সামূহিক নির্জ্ঞান’ তার বক্তব্যকে ধারণ করে রেখেছে এবং তারই ফলস্বরূপ ছড়াগুলিতে পরিস্ফুট হয়েছে শিশুপুত্র ও শিশুকন্যার বিপ্রতীপ অবস্থান (Binary)।

‘ছেলেভুলানো ছড়া’র বলয় থেকে বেরিয়ে আমরা এবার সরাসরি দেখবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটদের বিষয়ে লেখা নানা কবিতার অংশ। ‘শিশু’(১৯০৭), ‘শিশু ভোলানাথ’ (১৯২২) ‘খাপছাড়া’ (১৯৩৭), ‘ছড়ার ছবি’(১৯৩৭) ,‘ছড়া’(১৯৪১), চিত্রবিচিত্র’ (১৯৫৭) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে ছোটদের জন্য তাঁর বিশেষ লেখালেখি রয়েছে। অনেক সমালোচকই মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্য কখনোই লেখেননি। আবার নবেন্দু সেন মনে করেন, “রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া এক পরম গভীর শ্রদ্ধাবোধ থেকেই শিশুমন নিয়ে ভেবেছেন... ... রবীন্দ্রনাথের

শিশুবিষয়ক রচনা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক) পাঠ্য পুস্তকাদি, দুই) শিশুসাহিত্য বলে চিহ্নিত রচনা, তিন) মূলত বয়স্করচনা, কিন্তু, শিশুরাও তার অংশবিশেষের রসাস্বাদনে সক্ষম।"[২২] এই তিন ধারাতেই তিনি 'শৈশবসাধনা' করেছেন আজীবন। সাহিত্যের সবকটি সংরূপেই তিনি শিশুসাহিত্য রচনা করেছিলেন। যেহেতু আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল ক্ষেত্র শিশু বিষয়ক 'ছড়া', সেহেতু আমরা দ্বিতীয় শাখা নির্ভর করেই আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব। আমরা কিছুক্ষণ আগেই তাঁর লেখা বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি। কিন্তু তাঁর প্রধান যে দুটি বই শিশুসাহিত্যের আকর গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত, সেই 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ'-এর একাধিক কবিতায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ পেয়েছে এবং সেই অনুভূতি এক পৃথক তাৎপর্য তৈরি করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই যে উপরের আলোচিত রচনাগুলির প্রায় সবকটিই কবিতা, ছড়া নয়। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের শিশু-বিষয়ক ভাবনা এগুইর মধ্যে ধরা রয়েছে, সে কারণে গবেষণাপত্রে এগুলি বিশ্লেষণ করা হল।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। সেই সময় তাঁর মানসলোক জুড়ে শোকের আবহ—১৯০২ সালে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়, ১৯০৩-তে মারা যান কন্যা রেণুকা, ১৯০৭ এ মারা যান তাঁর ছোট পুত্র শমীন্দ্রনাথ, ১৯০৮-এ মৃত্যু হয় মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-এর। মৃত্যুর এই গভীর অভিঘাত তাঁকে চালিত করেছিল শিশুদের কবিতাতেও বিচ্ছেদ, মাঝি, নৌযাত্রা, বিয়োগ ইত্যাদি শব্দ বারবার ব্যবহার করতে। ফলত, এই কাব্যের কবিতা বা ছড়াগুলিতে কবির বিয়োগব্যথা মূর্ত হয়ে ওঠে এবং রচনাগুলি 'দার্শনিক মৃত্যুচেতনায়' সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।[২৩] এই কারণে উক্ত দুই কাব্যগ্রন্থ গুরুগম্ভীর ভাবসম্পন্ন, শিশুসুলভ চাপল্য এতে আশা করা উচিত নয়। যেহেতু আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে মেয়েদের ছোটবেলা, তাই প্রথমে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' অবলম্বনে বিষয়টি দেখা যেতে পারে।

'বিজ্ঞ' কবিতাটি দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক্। কবিতাটির কেন্দ্রে রয়েছে এক 'খুকি'র ছেলেমানুষি এবং এর কথক তার 'বিজ্ঞ' দাদা! খুকির নুড়ি পাথরকে ভাত ভেবে মুখে

পুরে দেওয়ার ঘটনা, দাদাকে ‘জুজুবুড়ি’ কল্পনা, ‘গুরুমশাই’ দাদাকে স্রেফ পাত্তা না দেওয়ার অভিমান ইত্যাদি সবই খুদে দাদার জবানিতে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা সাধারণত ছড়াগুলিতে ছেলে-মেয়ের দ্বন্দ্ব লক্ষ করেছিলাম; রবীন্দ্রনাথ তাকে বদলে দিলেন সুন্দর ভাই-বোনের সম্পর্কে। এই কবিতাটির বিষয়গত গুরুত্ব খুকি ও তার দাদা—উভয়ের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়েছে। মেয়েদের ছোটবেলার ছবি খুঁজতে গিয়ে সচরাচর এতোটা শৈশবচিত্র আমাদের গোচরে আসেনা—সেদিক দিয়ে এই লেখাটি প্রায় ব্যতিক্রম। “তোমার খুকি কিচ্ছু বোঝে না মা,/ তোমার খুকি ভারি ছেলেমানুষ”[২৪]---- এই পংক্তিটি খুকির অবুঝ ক্রিয়াকলাপ ও জ্ঞানী দাদার ‘দাদাগিরি’-- একইসঙ্গে দুই শিশুরই শৈশবসুলভ সারল্য প্রকাশ করে।

এরপরেই আসা যাক্ ‘হাসিরাশি’ কবিতা পাঠে। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘বালক’ পত্রিকার ১২৯২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায়। “নাম রেখেছি বাব্‌লারাণী/একরত্তি মেয়ে।/হাসিখুশি চাঁদের আলো/মুখটি আছে ছেয়ে”[২৫]- প্রথম পংক্তিটি থেকেই মেয়েটিকে তুলনা করা হয়েছে ‘চাঁদ’-এর সঙ্গে। কবিতাটির প্রথম পর্যায়ে একটি শিশুর প্রথম পদক্ষেপ ও তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের নানাবিধ প্রচেষ্টার কাব্যিক বর্ণনা রয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাগটি পুরোটা জুড়ে রয়েছে শিশুকে আকাশের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করার অতি পরিচিত ছবি; শেষে চাঁদের চেয়েও শিশুকে উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা—“চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল/তার মুখেতে চেয়ে,/ চাঁদ ভাবে কোত্থেকে এল/ চাঁদের মতো মেয়ে”। স্নেহের আচরণ যে যুক্তিহীন,তা বহুকাল ধরেই ছড়াতে প্রকাশ পেয়ে এসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত ছড়ার উপমেয়টি বদলে দিয়েছেন—‘খোকা’র পরিবর্তে এনেছেন ‘খুকু’ কে, তাকে কেন্দ্র করেই তৈরি করেছেন এক সুন্দর শৈশব-চিত্র। মেয়েদের ছোটবেলা সন্ধান করতে গিয়ে সাধারণত কিশোরী মেয়েদের কথাই ছড়াতে এসেছে বহুবার। কিন্তু ‘শিশু’ এমন এক ব্যতিক্রমী বই, যেখানে একটি মেয়ের জীবনের একেবারে আদিপর্বের সুনিপুণ বর্ণনা পাওয়া যায়। উল্লিখিত লেখাদুটিই তার প্রমাণ।

‘পরিচয়’ কবিতাটি এবারে দ্রষ্টব্য। “একটি মেয়ে আছে জানি,/ পল্লীটি তার দখলে,/সবাই তারি পুজো যোগায়/ লক্ষ্মী বলে সকলে”[২৬]- যদিও কবি মেয়েটির দস্যিপনার জন্য তাকে ‘লক্ষ্মী’ বলতে নারাজ! ভোরবেলা থেকে চেঁচিয়ে সকলকে জাগিয়ে দিতে বা কবিকে ‘বাহন’ ভেবে ‘মোটা মোটা নরম নরম ঘুষিতে’ আঘাত করতে সে সিদ্ধহস্ত। লক্ষণীয়, মেয়ে= ‘গৃহলক্ষ্মী’—এই যে ধারণা জন্মানো ইস্তক প্রতিটি বাঙালি মেয়ের সুকুমার মননে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, সেই ধারণা অবলীলায় ভেঙেছেন কবি। তিনি নির্দ্বিধায় মেয়েটির দস্যিপনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন—সমাজের ‘শিষ্ট আচার’-এর যে সে বা তার অভিভাবক বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করেন না, সেকথাও স্পষ্টত বলেছেন। মেয়ে যে পণ্য নয়, হৃদয়ের অংশবিশেষ, তা কবি উল্লেখ করেছেন তৃতীয় স্তবকে—“একটি দণ্ড ঘরে আমার/না যদি রয় দুরন্ত/ কোনোমতে হয় না তবে/বুকের শূন্য পূরণ তো”; ব্যক্তিগত শূন্যতার স্তরেই থেমে থাকেননি কবি, তিনি মনে করেছেন “সে না থাকলে সকালবেলায়/ এত কুসুম ফুটবে কি।/ সে না হলে সন্ধেবেলায়/ সন্ধেতারা উঠবে কি”—পার্থিব স্তরেও এক চূড়ান্ত রিক্ততা অনুভব করেছেন কবি মেয়েটির বিহনে। শেষ পর্যন্ত কোনো একটি নামের আড়ালে মেয়েটির পরিচিতিকে সীমায়িত করতে চাননি কবি—তার অস্তিত্বকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন সকলের অনুভবে। আর এখানেই, কবিতাটি বিশেষ থেকে নির্বিশেষের দিকে যাত্রা করেছে।

‘বিচ্ছেদ’ কবিতাটি অন্য আরেক মেয়ের গল্প বলে। মেয়েটি হয়তো বা কিশোরী--যে কবি-কল্পনায় আপাতত প্রবাসী। এই সাময়িক বিচ্ছেদ-বেদনা কবির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি, পোষা পাখি, বইপত্র, এমনকি গৃহের আসবাব পর্যন্ত এই বিরহে যেন ম্রিয়মান! কবিও উদ্‌ভ্রান্ত—মেয়েটির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে খুঁজে ফেরেন বাড়ির আনাচে-কানাচে। কবির অনুভূতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—“একটুখানি মেয়ে আমার/ কত যুগের পুণ্য যে,/ একটুখানি সরে গেছে/ কতখানিই শূন্য যে”— মেয়েদের সমাজ যেভাবে ‘অযাচিত’ ভেবে এসেছিল অনন্ত কাল ধরে, এই সহজ কথার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবনায় সজোরে আঘাত করলেন।

‘পুণ্য’ শব্দে উপেক্ষিতার কালিমা যেন মুছে গেল! পিতা তথা পুরুষতন্ত্রের সর্বশক্তিমান স্তম্ভের অস্তিত্ব যে কন্যাসন্তানের বিরহে শূন্যতায় পর্যবসিত হতে পারে, এই বিরল ভাবনাও ধরা পড়ল। পুং-শাসিত সমাজের ‘Male Ego’ কে হারিয়ে জয়ী হল চিরন্তন পিতৃহৃদয়ের আর্তি।

উক্ত ভাবনাগুলির সমন্বয় বলা যেতে পারে ‘মা-লক্ষ্মী’ কবিতাটিকে। পুণ্যকর্মফলে কবির কন্যাসন্তান প্রাপ্তি, বা প্রকৃতির সঙ্গে কন্যাহৃদয়ের অন্বয়ের বিষয়গুলি পুনরাবৃত্ত। কিন্তু এই কবিতায় কন্যাকে কেন্দ্র করে পিতৃহৃদয়ের এক আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি জানেন সকলের জীবনই ক্ষণস্থায়ী। তবু—“ও যে আমার শিশিরকণা,/ ও যে আমার সাঁঝের তারা--/কবে এল কবে যাবে/ এই ভয়েতে হই রে সারা।”[২৭] মৃত্যুচেতনা ও প্রেমচেতনার যে পুরাতন দ্বন্দ্ব, তাকেই রূপায়িত করেছেন লেখক এই কবিতার মধ্যে। মেয়েটি সম্ভবত মৃত্যুশয্যায় অথবা সে মৃত—“খেলতে খেলতে মায়ের আমার/ আর বুঝি হল না খেলা/ ফুলের গুচ্ছ কোলে পড়ে--/কেন মা, এ হেলাফেলা”— এই নিষ্ঠুর ছবি তৈরি করার সময় কবি নির্বাচন করলেন পিতা-কন্যার মধুর সম্পর্ককে, যে সম্পর্ক কন্যার প্রতি সকলের কোমল ব্যবহার প্রার্থনা করে, বহির্বিশ্ব যে সম্পর্কের কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হয়। এই লেখাটি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত ‘বালক’ পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। শিশুর ‘আদর্শ’ মূর্তি তৈরি হয়েছে এই ছড়াতে, যে মূর্তির অবলম্বন একটি কন্যাশিশু। লক্ষণীয়, এই সংখ্যায় একটি কন্যাশিশুর ছবিও ছাপা হয়েছিল ‘বালক’-এর পাতায়—গোলগাল, অলংকারে ভূষিত আদুরে চেহারার একটি ছবি। মেয়ে যে সংসারে অনাকাঙ্ক্ষিত নয়, সেই ভাবনার আভাস মেলে এই ছবিতে। তবে, কন্যাকেন্দ্রিক এই লেখাটি নিঃসন্দেহে করুণ রস-নির্ভর, যা রবীন্দ্রনাথের আগে ছড়ার ক্ষেত্রে মোটেও দেখা যায় না।

তাত্ত্বিক আবহের বাইরে অন্যরকম এক সামাজিক পরিসরে মেয়েদের ছোটবেলা কীভাবে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার সন্ধান পাওয়া যায় ‘চিত্রবিচিত্র’-কাব্যগ্রন্থের একটি ছড়ায়। ‘চিত্রবিচিত্র’ –এ ‘এক ছিল বাঘ’ ছড়াটি অন্যভাবে একটি কিশোরীর কথা বলে। কেঁদো বাঘ

আয়নায় নিজের মুখে কালো দাগ দেখতে পেয়ে ভীষণ রেগে গিয়ে পুঁটুর কাছে ‘গ্লিসেরিন সোপ’ চেয়ে বসে। পুঁটু তখন কিন্তু মোটেও পুকুর পাড়ে ফুল পাড়ার মত বিলাসিতায় ব্যস্ত ছিল না, “ঢেঁকিশালে পুঁটু ধান ভানে” তখন। অকুতোভয় পুঁটু জবাব দেয় সে ‘গ্লিসেরিন সোপ’ কী, তা সে জানে না। কারণ “ইংরেজি টিংরেজি কিছু/শিখিনি তো, জাতে আমি নিচু”। এছাড়া সে ‘কালোকৃষ্টি’ রূপেই সন্তুষ্ট। এতে বাঘ রেগে গিয়ে তাকে খেতে এলে পুঁটু তার জাতি পরিচিতি দেয়—“জানো না কি আমি অস্পৃশ্য” এবং “আমার মাংস যদি খাও,/জাত যাবে জানো নাকি তাও?”[২৮]। এর পরিপ্রেক্ষিতে মেলে বাঘের তরফে সেই মোক্ষম উত্তর—“ছুঁসনে ছুঁসনে বলে বাঘ”, আরো বলে, “বাঘ্‌নাপাড়ায় বদ্‌নাম/রটে যাবে, ঘরে মেয়ে ঠাসা,/ঘুচে যাবে বিবাহের আশা”। বাঘ ও পুঁটু এখানে সমাজের দুটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। অস্পৃশ্যতা যে সামাজিক এক ব্যাধি,তা এই ছড়ায় একটি কাহিনির আড়ালে দেখানো হল। শিক্ষা, সৌন্দর্য বা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনধারণ—কোনোটাই পুঁটুদের ভাগ্যে জোটেনা। এমনকি সে বাঘেরও অরুচি! আপাত হাসির ছড়ার মধ্যে দিয়ে নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জনগণের, বিশেষ করে মেয়েদের, দুরবস্থাকে তুলে ধরেছেন কবি—পুঁটু সে বক্তব্যের বাহক।[২৯]

রবীন্দ্রনাথের শিশু সংক্রান্ত এই লেখাগুলির বেশিরভাগ অংশ জুড়েই রয়েছে ‘খোকা’রা। তাই শঙ্খ ঘোষের ‘শিশু’ শীর্ষক প্রবন্ধে কাল্পনিক চরিত্র অস্মিতা ক্ষোভের সঙ্গে জানায়, “শিশু বইটা জুড়ে তো খোকাদেরই কথা বলা, আমরা তো কোথাও নেই। তাই আমাদের অন্তরঙ্গতাও নেই।”[৩০] অস্মিতাকে ক্ষান্ত করতে তার মাস্টারমশাই উল্লেখ করেন প্রায় একশো বছরেরও বেশি আগে কবিবন্ধু মোহিতচন্দ্র সেনের লেখা একটি চিঠির কথা, যেখানে এই একই অভিযোগ ছিল। সেই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন “খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ, সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী।”[৩১] তাই সেদিক দিয়ে ‘শিশু’ একপ্রকার ‘স্মরণকাব্য’ হয়ে ওঠে, যেখানে মৃত্যুর বেদনা মিশে রয়েছে, যেখানে খোকা-খুকুর অস্তিত্বের আনুপাতিক বিচার অন্যায্য। তবে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকারও করেছেন এক সত্য

অনুভব — "তিনি নিজে তো চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিলেন, তাই খোকাজন্মের প্রাচীন ইতিহাসই তাঁর সম্বল—খুকীর চিত্ত তাঁর কাছে এত সুস্পষ্ট নয়।"[৩২] এই বক্তব্য তাঁর ভাবনার সীমিতিকে প্রতিষ্ঠা করে, যা পাঠক হিসেবে আমরা জানলেও খুব সহজে তা আত্মীকৃত করতে পারিনা — বিশেষ করে 'গল্পসল্প' বা 'সে' এর কাঠামো বা ভাবনা এই কৈফিয়ৎ-এর সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না।

উক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, 'শিশু' একদিকে যেমন কবির প্রিয়বিয়োগগাথা, অন্যদিকে 'নিজের শৈশবকে তৃষিতের মতো পুনরুদ্ধার' করতে চাওয়ার ক্ষেত্র[৩৩]। এর বেশ কিছুকাল পরে, আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে 'শিশু ভোলানাথ'-এর (১৯২২) কবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন "মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে"[৩৪]। এই পরিস্থিতিতেও অবশ্য প্রশ্ন তোলা অনুচিত যে, সেই সময়ের কবিতাতে মেয়েদের কথা এল না কেন। বরং, 'গল্পসল্প'-এর একটি লেখা 'রাজরাণী' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে কবির দার্শনিক চিন্তন প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতাটি মরণোত্তরকালে পুনর্মুদ্রিত হয় 'চিত্রবিচিত্র' বইতে, তখন তার নাম দেওয়া হয় 'পিয়ারি'। কবিতাটি এই রকম—

> "আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি / খিড়কির আঙিনায়, নামটি পিয়ারি।
> আমি শুধালেম তারে, এসেছ কী লাগি। / কহিল সে চুপে চুপে, কিছু নাহি মাগি।
> আমি চাই ভালো ক'রে চিনে রাখো মোরে, / আমার এ আলোটিতে মন লহো ভরে।
> আমি যে তোমার দ্বারে কর আসাযাওয়া / তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া।
> যখন ফুটিয়া ওঠে যূথী বনময়, / আমার আঁচলে তারি আনি পরিচয়।
> যেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে / আমার পরশ পেলে খুশি হ'য়ে ওঠে।
> শুকতারা ওঠে ভোরে , তুমি থাকো একা, / আমিই দেখাই তারে ঠিকমতো দেখা"[৩৫]

'দাঁতখিচোনো অশুচি অপমানিত সভ্যতার' সামনে দাঁড়িয়েই তিনি লিখেছিলেন এই কবিতাটি। "অর্থাৎ তখন তাঁর মধ্যে তীব্র অমঙ্গলবোধের সংক্রম হয়েছিলো সত্যি, তবু শেষ পর্যন্ত জগৎজোড়া উচ্ছল অভ্যর্থনাকেই তিনি বড়ো করে দেখেছিলেন"[৩৬]। শিশুপাঠ্য কবিতাতে

মেয়েদের কথা এভাবে কখনো দর্শনের নামান্তর হিসেবেও প্রতিভাত হয়—তখনই যাবতীয় আক্ষেপ দূরীভূত হয়ে যায়।

বাংলা শিশুসাহিত্যে ছড়া নিয়ে আলোচনা করতে হলে রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি যোগীন্দ্রনাথ সরকার। প্রায় রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী এই লেখক মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন। ছোটদের জন্য মোট ৩৭টি বই লিখেছেন যোগীন্দ্রনাথ। শ্রীমতি আশা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে সম্পাদনা ও সংকলন মিলিয়ে যোগীন্দ্রনাথের মোট ৪৪ টি বইয়ের সন্ধান পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন; যদিও তার কোনো তালিকা তিনি প্রদান করেননি। যোগীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত সংস্থা 'সিটি বুক সোসাইটি' (১৮৯৬) থেকেই মূলত প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি। তিনি যখন এই জগৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন, তখন তিনি সিটি স্কুলের মাস্টারমশাই। একক বই রচনার উদ্যোগ নেওয়ার আগে থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন 'সখা' বা 'মুকুল'-এর মত শিশুদের পত্রিকার সঙ্গে। ১৮৯১ এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বই-'হাসি ও খেলা'। প্রথম বইটি সম্পর্কে 'সাধনা' পত্রিকায় (১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য: "বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল ... আপাতত ছেলেদের ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা বাঙ্গালী ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টিসাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না ... যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন"[৩৭]। এরপর শিশুদের অক্ষর পরিচয় শেখানোর জন্য 'হিজিবিজি', 'হাসিখুশি', শিশুর বর্ণপরিচয় বিষয়ে 'ছড়া ও পড়া', 'হাসি ও খেলা', জীবজন্তুর পরিচয় জানিয়ে 'আষাঢে স্বপ্ন', শিকার কাহিনি 'বনে জঙ্গলে' ইত্যাদি অজস্র বই উপহার দিয়েছিলেন তিনি শিশুদের। ছবির সঙ্গে কাহিনির যে ওতপ্রোত সংযোগ, তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ১৮৯২ এ প্রকাশিত 'ছবি ও গল্প' এবং ১৮৯৩-এর 'রাঙ্গা ছবি'-তে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বক্তব্য থেকে বলা যায় যে, যোগীন্দ্রনাথ শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনার সময় শুধুমাত্র তাদের শিক্ষাদানের গুরুগম্ভীর বিষয়টিই শুধু খেয়াল করেছিলেন

তাই নয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল রাখার দিকটিও নজর দিয়েছিলেন।[৩৮] আর, এই কারণেই ছোটদের জন্য রচিত তাঁর সবক'টি লেখাই শিশুমনোরঞ্জক ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছিল।

১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয় 'খুকুমণির ছড়া'। এটি দেশ-বিদেশের নানা প্রচলিত ছড়ার সংকলন। তার সঙ্গে কিছু অনুবাদ ও কিছু নিজস্ব রচনা। যেহেতু এই বইটির নামের সঙ্গে 'খুকু'র অস্তিত্ব জড়িয়ে রয়েছে, সেহেতু আলোচনার জন্য এই বইটিকেই প্রথমে নির্বাচন করা হল। রবীন্দ্রনাথের পল্লিবাংলার ছড়া সংগ্রহের বিপুল উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়েই সম্ভবত যোগীন্দ্রনাথ এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই উদ্যোগের ছ'বছর আগেই রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ মোট ৪১০টি ছড়া সংকলিত করেছিলেন এই বই-এ। তার মধ্যে বেশ কিছু ছিল আজগুবি ছড়া। বাংলায় এই ধারারও পথিকৃৎ যোগীন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এই সম্ভবত তিনি প্রথম এই জাতীয় ছড়া লিখেছিলেন।[৩৯] তবে এই বিষয়টি অন্যত্র আলোচ্য। 'খুকুমণির ছড়া' তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় বই। এর ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছিলেন, "যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংগৃহীত ছড়া থেকে অনেক ঘটনা এবং তথ্য বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ম্যাক্সমুলারের গবেষণার কাজে যথেষ্ট সাহায্য পাবে...আশা করি, বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রচারের সহিত বাঙ্গালীর অনাদৃত অবজ্ঞাত গ্রাম্য সাহিত্যের আলোচনা বঙ্গের সুধী সমাজ কর্তৃক যথোচিতভাবে আরব্ধ হইবে।"[৪০]

রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য'-এ 'ছড়া সংগ্রহ' অংশে যে ৮১টি ছড়ার উল্লেখ ছিল, তার কয়েকটি 'খুকুমণির ছড়া' তেও উল্লিখিত হয়েছে প্রায় অবিকল ভাবে। রবীন্দ্র-সংগৃহীত ছড়ার কিছু কিছু পাঠান্তরও আবার লক্ষ করা গেছে যোগীন্দ্রনাথের সংকলনে। মৌখিক পরম্পরায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং এক কাল থেকে অন্য কালে পরিবাহিত হতে থাকা এই ছড়াগুলিকে রঞ্জিতা কুণ্ডু 'শ্রুতি' হিসেবে অভিহিত করতে চেয়েছেন। ওই লেখাটি থেকেই আমরা জানতে পারি যে, Geneva International Bureau of Education ১৯৩২ সালে Children's Books and International Goodwill–এর যে Report and Booklist প্রকাশ

করে, তাতে 'খুকুমণি ছড়া'র পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়, "Short poems of the nursery rhymes types."[৪১] কিন্তু, ওই ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় উক্ত দুটি ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। পাশ্চাত্যের বিবাহ ধারণাটি একান্ত ব্যক্তিগত আর প্রাচ্যে, বিশেষত বাংলায়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে পারিবারিক রীতি-নীতি, সনাতন সামাজিক ব্যবস্থা। সুতরাং, ইংরেজি ছড়ায় বিবাহ প্রসঙ্গ আসে না আর বাংলা ছড়ায় বিবাহ প্রসঙ্গেই মূলত ভাবনা বয়ে চলে; 'গৌরীদান' বা 'কৌলীন্য প্রথা'র ছাপ পড়ে ছড়ায়, আর স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্যের মেয়েদের তুলনায় একেবারে অন্যরকম, প্রায়-বিলীন-হয়ে-যাওয়া মেয়েদের শৈশবচিত্র উঠে আসে।

'খুকুমণির ছড়া'-এই অভিধায় বইটির নামকরণ করা হলেও শুধুমাত্র খুকুকে নিয়ে লেখা ছড়ার সংখ্যা এখানে সামান্যই। তার মধ্যে অধিকাংশই আবার বিবাহ-সংক্রান্ত। যেমন—"আমার মনুরাণীর বে/খাওয়ান দাওয়ান যেমন তেমন/বাজনা শোন যে" অথবা "খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ি/সঙ্গে যাবে কে?"-এর মত বহুশ্রুত ছড়া। কন্যাসন্তান জন্মানোতে সচরাচর খুশি হতেন না পরিবারবর্গ; চোদ্দ বছরেও কন্যা অরক্ষণীয়া থাকলে পরিবার নরকস্থ হবে, এই আশঙ্কায় থাকতেন পিতা-পিতামহীরা। তাই নিরুপায় মাতৃহৃদয়ের অবদমিত ক্ষোভ ও পুরুষতন্ত্রের প্রতি ধিক্কার প্রকাশ পেত কোনো কোনো ছড়ায় — "খুকুনবালা, টাকার ছালা/মটকী ভরা ঘি/খুকুর ভাতে ভোজ হল না/ছি! ছি! ছি!"[৪২] - খুকুর আবার অন্নপ্রাশন! সদ্যোজাত শিশুকন্যার আসন্ন বিবাহ-অবস্থা, তার পিতৃগৃহ ও শ্বশুরালয়—উভয়ক্ষেত্রেই নিরাশ্রয় দশা, আর্থিক পরাধীনতা — এই সবকিছু, যা একজন জননী দেখেছিলেন ও উপলব্ধি করেছিলেন নিজের সঙ্গে, কন্যার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই আশঙ্কা মানসিক প্রতিক্রিয়া রূপে ধরা পড়ত ছড়ার বয়ানে। কন্যার নিরাশ্রয় অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় — "রাগ কোরো না শাশুড়ী গো, আমি তোমার মেয়ে/তুমি যদি তাড়াও, বলো, দাঁড়াই কোথা যেয়ে"— এই ছড়াতেই দেখানো হয়, বাড়ির দাসীর থেকেও দুরবস্থা এই সদ্য-বিবাহিত কন্যাটির। কন্যাকে অপাত্রে সমর্পণ করে মায়ের দুঃখবর্ণনও এই ছড়াগুলির অন্যতম পরিচিত বিষয় ছিল—"ঢাকায়েরা ঢাক

বাজায়/খালে আর বিলে/সুন্দরীরে বিয়ে দিলাম/ডাকাতের মেলে/আগে যদি জানতাম/ডুলি ধরে কাঁদতাম";[৪৩] আবার, কখনো দেখা গিয়েছে কন্যার অকাল-বৈধব্যে মাতৃশোক — "অলকমণি রাজার রাণী কি বলিব আর/অলকমণির কপাল পুড়ে হল ছারখার।"[৪৪] এই সমস্ত ছড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাই বলা যায় যে, যোগীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত ছড়াতেও বাংলার মেয়েদের সেই চিত্রই ধরা পড়েছিল, যেখানে কন্যার বিবাহ-সংক্রান্ত ভাবনাই কন্যার শৈশবকে গ্রাস করে রেখেছিল। কিন্তু এই ধারণাকে কিছুটা সম্প্রসারিত করেছেন রঞ্জিতা কুণ্ডু—"খুকুর সম্বন্ধে সব ছড়াতেই যে খুকুর বিয়ের কথা পাওয়া যায় তা নয়। কোনো কোনো স্থলে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির প্রতাপে কন্যাকে যথা ইচ্ছা আদর করতে না পারার শোধ তোলবার জন্য জননী ছড়া গাঁথেন — মেয়ে নয় আমার সাত বেটা/গড়িয়ে দেব কোমর পাটা/দেখ্ শত্তুর চেয়ে/আমার কত সাধের মেয়ে।"[৪৫] এই ছড়ায় একটা চ্যালেঞ্জ-এর ভাব রয়েছে—মা তার কন্যার সামগ্রিক অবহেলা সহ্য করতে না পেরে একটি মেয়ে সাত পুত্রের সমতুল—এই ভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। কন্যাসন্তান যে মাতৃসত্তার অভিক্ষেপ, তা বোঝা যায় বেশ কিছু ছড়ায়। মেয়েদের কাজের ক্ষেত্র অন্তঃপুর বা পুকুরপাড় — কিন্তু মা তার মেয়েকে সেই কাজে ব্যাপৃত হতে দিতে চান না; নতুন কোনো কাজের ধারণা হয়তো সেই যুগের মায়েদের ছিল না, কিন্তু মায়েরা নিশ্চিতভাবেই চাইতেন না মেয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর নিজের জীবনটি পুনরাবৃত্ত হোক, চাইতেন তাঁদের মেয়েদের জীবন একটু হলেও পরিবর্তিত হোক, সকলে তাঁর মেয়ের রূপ-গুণের কদর করুক — প্রমাণ —"পুঁটু আমার মেয়ের বরণ/পুঁটু আমার চাঁদের কিরণ/পাড়ার লোক পুঁটুর রূপ/কে দেখবি দেখ্‌সে আয়/নবঘন মিশেছে তায়" — লক্ষণীয়, কৃষ্ণবর্ণা 'পুঁটু'র সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী পুঁটুর মা। আবার, "পদ্মদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল/হেঁটোর নীচে দুলছে খুকুর গোছা ভরা চুল/বৃষ্টি এলে ভিজবে সোনা চুল শুকোনো ভার/জল আনতে খুকুমণি যায় না যেন আর"— এখানে খুকুর জল আনতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে খুকুর কেশরাশি। যে সমাজে খুকুর জন্য বরাদ্দ শুধুই গৃহকর্ম, সেখানে এই

ছড়াটিতে খুকুর রূপ তার সেই কাজ সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করেছে ও তা আবার সমর্থিত হয়েছে মায়ের বক্তব্য দ্বারা—এই বিষয়টিও বেশ অন্যরকম। ‘খুকুমণির ছড়া’য় সংকলিত ছড়াগুলি যে সময়ের কথা বলে, সেই সময়ে খোকার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হত যে মেয়েটির, সেও নিতান্তই শিশু বা ‘খুকি’। ছড়াতে কিন্তু অদ্ভুতভাবে শাশুড়ির সেই খুকির প্রতি কোনো স্নেহের ছবি প্রকাশ পায় না — “বত্রিশ আড়ার ঘি কলসী/সরু চালের ভাত/খোকা খাবে সাপুর সুপুর/বৌ কুড়াবে পাত।”[৪৬] এখানে আবার শাশুড়ির ক্ষমতাতন্ত্রে নবাগতা বধূর শৈশবের অপমৃত্যু ঘটে। এইভাবে, ‘খুকুমণির ছড়া’ এক বিশেষ সময়ের চিত্র প্রকাশ করে—মেয়েদের তৎকালীন অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের সামনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছেলেভুলানো ছড়া’র ‘ছড়া সংগ্রহ’-এর পরিপূরক হয়ে ওঠে এই বইটি।

‘খুকুমণির ছড়া’র সামগ্রিক বিশ্লেষণের পর যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অন্যান্য বই-এর নির্বাচিত কিছু লেখার ভিত্তিতে দেখে নেব মেয়েদের কথা সেই বইগুলিতে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

‘ছবির বই’ — ‘তিনটি বোন’ নামের দীর্ঘ ছড়াটি লক্ষণীয়। তিন বোন তিনটি পুষ্যিকে কীভাবে যত্ন করে সামলায়, তারই বর্ণনা—“আমরা তিনটি বোন/হরিণ, ভেড়া, বাছুর নিয়ে/থাকি সর্বক্ষণ।”[৪৭] পুরো ছড়াটির ভরকেন্দ্র হল শেষ স্তবকটি— “তোমরা যদি এমনতর,/কাকেও ভালবাসতে পার,/দেখবে তখন কেমন সুখে/কাটবে গো জীবন--/আমরা তিনটি বোন।”[৪৮] পুরো ছড়াটি জুড়ে অবলা জীবের প্রতি অকাতরে ভালবাসার যে ছবি দেখানো হয়, তার মধ্যে দিয়ে আসলে আদর্শ শৈশবের একটি অঙ্গ দেখানো হয়—“ভালবাসি বলে তারে/ভালবাসে সে আমারে;/তা না হলে বনের পশু/হয় কি গো আপন”—ভালোবাসা যে জীবধর্ম এবং তা যে রেসিপ্রোকাল, সেই পাঠও দেওয়া হয়ে যায়। যেহেতু কোমল ছবি, তাই কোমলতার পরাকাষ্ঠা হিসেবে এর ধারক হয় শিশুকন্যারা। “বাবা বলে, ‘তিনটি রাঙা/ফুলেরি

মতন'''—এই পংক্তিটি প্রমাণ করে সমাজের অগ্রগতি—পারিবারিক পরিসরে মেয়েদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হওয়ার কথা।

'টুনুর ঘুম' ছড়ায় দুই সহোদরা বা দুই বন্ধুর ছবি—একজন ঘুমিয়ে রয়েছে ও অপরজন তাকে জাগাতে উদ্যত। ছড়াটি বিশেষ কিছু কথা না বললেও "বাড়িছে বেলা;/কখন হবে শুরু/মোদের খেলা!/ও টুনু,টুনু,চল না,ভাই/তা ধিনা ধিনা নাচতে যাই"[৪৯]— এই লাইনে ভারহীন শৈশবের চিত্র ধরা পড়ে—যার অভাব ছিল এর পূর্ববর্তী সময়ে।

'সুখের মিলন' ছড়াটি একটি বালিকা ও তার পোষা পাখির কথোপকথন। বালিকাটি পাখিটিকে খাঁচার বাঁধন থেকে খোলা আকাশে মুক্তি দিতে চায়—"স্বাধীনভাবে আপন মনে,/ফির গে যা তুই বনে বনে!/ নূতন জীবন মিলবে সেথা,/নূতন আহার পেয়ে।"[৫০] পাখিটি মেয়েটির ভালোবাসা ছেড়ে যে কোথাও যেতে চায় না, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু মেয়েটির বক্তব্যে রয়েছে 'স্বাধীনতা'র ধারণা, যা এর আগে কোনো বালিকার মুখে শোনা যায়নি। শিক্ষিত রুচিসম্মত পরিবারেও উনিশ শতকে মেয়েদের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়নি। তাই এই বালিকাটি যখন এই ধরনের মন্তব্য করে, বোঝা যায়, মেয়েদেরকে বোঝার আঙ্গিকের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

'রাঙা ছবি'—এই বইটির প্রচ্ছদ ও 'উপহার' অংশে যথাক্রমে দুটি বই পাঠরত বালিকার এবং দুটি বালিকার আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থার ছবি রয়েছে—এ যাবৎকালে এই ধরনের প্রয়াস দেখা যায়নি।

'অতুল শোভা' ছড়াটিতে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করছে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েও—"অবাক হয়ে/তাকিয়ে আছে/তিনটি ছেলে মেয়ে!"[৫১] 'সাধের ঘোড়া'-তে খোকনমণির খেলার সাথী হয়েছে তার দিদি, গৃহকর্মব্যস্ততার ঊর্ধ্বে গুরুত্ব পেয়েছে মেয়েটির সুকুমার বৃত্তি—"রোজ সকালে খোকনমণি/দিদির সাথে তার,/সাধের ঘোড়া চড়ে সুখে!/বেড়ায় চারি ধার!"[৫২] এই

বইয়ের আরও একটি ছড়া এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। ছড়াটির লেখক অবশ্য ‘সখা’ পত্রিকার সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন[৫৩]; ছড়াটি তাঁর বন্ধুবরের বইয়ে সংকলিত হয়েছিল। এই ছড়াটির চতুর্থ স্তবকের চারটি পংক্তি—“কাজ ফেলে না কর্‌ব খেলা,/ছেড়ে দাও না হল বেলা,/আগে কাজ কি আগে খেলা,/জানতে আমি চাই”[৫৪]— সম্ভবত কবির নীতিধর্মী উদ্দেশ্যমূলক রচনা। কিন্তু এই নীতিবাক্যের আড়ালে একটি বালিকার এক করুণ কাহিনি ধরা পড়ে। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে বাড়িতে দাস-দাসী না রাখতে পারায় বালিকাটি মায়ের গৃহকর্মের সঙ্গী, তা পালন করা মেয়েটির কর্তব্য বলে সে ইচ্ছে থাকলেও প্রিয় কুকুরের সঙ্গে খেলাধুলো করতে পারেনা।“দেখছ না কি হাঁড়ি হাতে/চাল ধোয়া রয়েছে তাতে,/মা বলেছেন নিয়ে যেতে/চাকর-বাকর নাই”—মেয়েটির জবানীতে এই চার লাইন-ই বুঝিয়ে দেয় প্রথমত ‘দারিদ্র্য’ ও দ্বিতীয়ত তার ‘মেয়ে-জন্ম’ তার কাছ থেকে তার কাঙ্ক্ষিত শৈশব কেড়ে নিয়েছে।

‘হাসি ও খেলা’ বইটিতে ভাই-বোনের সুসম্পর্ক বা আদর্শ সম্পর্ক নিয়ে যোগীন্দ্রনাথের প্রচুর ছড়া রয়েছে; যেমন এই ছড়াটি—“তিনটি বোন আর চারটি ভায়ে রয়েছি এক ঠাঁই,/সবাই মিলে সাতটি মোরা,/ভুলটি তাতে নাই...ভাই বোনেতে এমনি ধারা মিলন যদি হয়,/হক না কেন যতই বিপদ, নাই কো তাতে ভয়।”[৫৫] মনে হয়, যোগীন্দ্রনাথ শুধু ‘ভাই-বোন’-দের উদ্দেশ্য করেই এই লেখা লেখেননি, অভিভাবক তথা সমাজের, ছেলে ও মেয়েদের প্রতি সমদৃষ্টি প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষাও প্রচ্ছন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। মেয়েদের নানা কাজে একতরফা দোষী করতে অভ্যস্ত ছিল বাংলার সমাজ। ছেলেরা সেই যুগে ছিল সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের লেখায় চরিত্র গঠনের যে পাঠ দেওয়া হয়, তাতে সমালোচিত হয় উভয় পক্ষই। এই নিরপেক্ষ চিন্তাধারাই মেয়েদের ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’ হিসেবে ভাবতে শেখায় না—“যে সব ছেলে বই খুলে পড়াতে দেয় ফাঁকি,/যে সব মেয়ে রাগের ভরে, রাত্তির দিন গুমরে মরে,/অভিমানের মুখোশ দিয়ে মুখটি রাখে ঢাকি,/তেমন মেয়ে, তেমন ছেলে, চায় না কেহ কোনো কালে” (ছড়া- ‘সন্দেশ তায় মিলবে না’)। [৫৬] ‘চিঠিপত্র’ ছড়াটি একেবারেই অন্যরকম। কন্যাসন্তানের সঙ্গে

‘বিদেশে’ গমনোদ্যত পিতার মান-অভিমান ও মানভঞ্জনের ছড়া। এখানে শিশুকন্যাটির শৈশব কোনো বঞ্চনায় বা লাঞ্ছনায় জর্জরিত নয়, বরং উদ্‌যাপিত(Celebrated Childhood)। তাই সে বাবার কাছে অক্লেশে আবদার করে রেশমি কামিজ পরিহিত, কোঁকড়া-চুলওয়ালা পুতুলের, যাকে সে খোকা সাজিয়ে খেলবে। কন্যাসন্তান স্বাভাবিকভাবেই মা-কে প্রতিবিম্বিত করতে চায় নিজের চরিত্রে বা দিনযাপনে—এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। শিশুর মানস-গড়নের এই সূক্ষ্ম বর্ণনা নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক; কিন্তু এর পাশাপাশি দেখে নেওয়া যাক পিতার উত্তরটিও—“যা বললে মা, করবো তাই/রাগেতে আর কাজ নাই,/ভয়েতে আমি মরি;”—কন্যাসন্তানের প্রতি পিতার এই প্রতিবাৎসল্য ছড়ায় সাধারণত বর্ণিত পিতা-পুত্রী সম্পর্কের চেয়ে অনেকটাই পৃথক। এবং, “তাতেও যদি দুখ্‌খু তোমার/ নাহি ঘুচে, ও মা,/জরিমানা কোরো আমায়/ চুমোর উপর চুমা!”—এই পংক্তিটি বুঝিয়ে দেয় ছড়ায় বর্ণিত মেয়েদের অবস্থানের সরণ ঘটতে শুরু করেছে—পণ্যের পরিবর্তে তাকে দেখা হচ্ছে সম্পদ হিসেবে। পিতা-কন্যা সম্পর্কের পর মাতা-কন্যার একটি ছড়ার উল্লেখ করে এই বইটির আলোচনা শেষ করব। মায়েরা অবশ্য মৌখিক ছড়ার কাল থেকেই মেয়েদের নিয়ে সচেতন। এখানেও প্রায় সেরকমই একটি ছবি ফুটে ওঠে ‘অভিমানী’ কবিতায়। মেয়েটি কোনো অজ্ঞাত কারণে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে না গেলে মা তার করুণ ম্লান মুখ দেখে কাতর হয়ে পড়েন—“আয় মা আমার অভিমানী/আয় মা আমার বুকে আয়।”[৫৭] এরপর মা তার ‘ফুলের রাণি’ কে ‘রাঙা কাপড়’ পরিয়ে চুল বেঁধে সাজিয়ে তোলার উৎসাহ দেখালেও এর আগের পংক্তির ব্যঞ্জনা বহুদূর বিস্তৃত। নিতান্ত সামান্য কারণে হওয়া মেয়ের ‘অভিমান’ কে গুরুত্ব দিয়েছেন মা, তাকে প্রদান করেছেন বয়সোচিত সম্মান। শুধু তাই নয়, বন্ধুবিহনে একলা মেয়েটির একাকীত্ব ঘোচাতে তার সঙ্গী হতে চেয়েছেন তার মা—“কেউ যদি না খেলতে চায়;/মায়ে ঝিয়ে করবো খেলা,/আয় মা আমার বুকে আয়”—এই সচেতনতা শুধু কন্যার প্রতি নয়, তার শৈশব-অবস্থার প্রতিও বটে!

‘খেলার গান’ বইয়ের একটি ছড়াই আমাদের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তারই শুধুমাত্র বিশ্লেষণ করা হবে। লক্ষণীয় ‘গণক ঠাকুর’[৫৮] ছড়াটি। এখানেও অবশ্য আদর্শ চরিত্র গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হইয়েছে কথোপকথনের মাধ্যমে। এক দিকে রয়েছেন ‘গণক ঠাকুর’ স্বয়ং এবং অন্যদিকে রয়েছে দুই দল প্রশ্নকর্তা—‘ভালো মেয়ে’ – ‘ভালো ছেলে’ এবং ‘দুষ্ট ছেলেমেয়ের দল’। এই ভাবনাতেও রয়েছে ছেলে-মেয়ের সমমর্যাদার প্রসঙ্গ। ছেলেদের বার্তালাপ এখানে উল্লেখ না করে শুধুমাত্র মেয়েদের প্রসঙ্গটিতেই এখানে আলোকপাত করা হল। প্রথমেই ‘ভালো মেয়ে’র সঙ্গে কথোপকথনে মেয়েটি তার প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ছবি তুলে ধরে এভাবে—“লিখতে পড়তে বসি আমি রোজ সকালে উঠে/কাজ কর্ম করি পরে মায়ের সাথে জুটে।/দুপুরবেলা সেলাই করি, সন্ধ্যাকালে খেলা,/এমনি করে কাটে আমার প্রত্যহ দুবেলা”। গণক ঠাকুর এই ‘মিষ্টি মেয়ে’র বক্তব্যে খুশি হয়ে বলেন—“সুখের সীমা রবে না তার বাড়বে বয়স যত,/ঘরকন্না করবে সুখে লক্ষ্মী মেয়ের মত”। গণক ঠাকুরের বক্তব্যে ধ্বনিত হয় ‘মনুসংহিতা’র নির্দেশ- “সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্যেষু দক্ষয়া”[৫৯] অর্থাৎ, স্ত্রীলোক সর্বদা আনন্দিত ও গৃহকর্মে দক্ষ হবেন। এখানে শৈশব থেকেই মেয়েদের ‘গৃহলক্ষ্মী’ নির্মাণের যে আয়োজন চোখে পড়ে, তার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তবে তার সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষালাভটিও যে গুরুত্বপূর্ণ, তারও আভাস দিয়ে যান কবি। এর সঙ্গেই দেখে নেব, কীভাবে খণ্ডিত হয়েছে ‘দুষ্ট মেয়ে’র যাপনচিত্র বা চাহিদা—দুষ্টু মেয়েদের বক্তব্য—“ঝকঝকে ব্রোচ ভালবাসি, রেসমি জ্যাকেট, শাড়ি,/ বই-এর সঙ্গে আমাদের একেবারেই আড়ি”। এর উত্তরে গণক ঠাকুর বলেন—“সেজেগুজে বাহার দিতে এখন শুধু জানে,/এর পরেতে কাটবে কাল দুঃখে অভিমানে”। অর্থাৎ, বাইরের রূপকে নস্যাৎ করে গণক ঠাকুর অন্তরের শ্রীবৃদ্ধিতে মন দিতে বলেন—যার একমাত্র পন্থা যথার্থ শিক্ষালাভ। এভাবে, মেয়েদের শৈশবকে শুধু গৃহকর্মেই সীমায়িত না রেখে তাকে পড়াশুনা ও খেলাধুলার পরিসরে বিস্তৃত করে দেন যোগীন্দ্রনাথ। ‘খেলার সাথী’ বইয়ের প্রথম ছড়া ‘সেই ভাল’[৬০] এই প্রসঙ্গে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ছোট্ট মেয়ে চারু তার পোষা কুকুর হারুকে পরস্পরের প্রতিস্থাপনযোগ্য অবস্থানের কল্পনায় বেশ কিছু কথা বলে, যা থেকে একটি বালিকার শৈশবাবস্থার একটি দিক পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। মেয়েদের লেখাপড়া ততদিনে পুরোদস্তুর প্রচলিত। তাই চারু বলে—"তোমায় তখন পড়তে হত/সন্ধ্যা-সকাল বেলা/লিখতে হত ক-খ-গ-ঘ/ভুলতে হত খেলা/পাঁচ দ্বিগুণে কত হয়/এক ডাকে না হলে/রামা শ্যামা এসে তোমার/কানটা দিত মলে"। বালিকাটির এই সর্বক্ষণের পঠন-পাঠন হয়ত অপছন্দের—এই আভাস এখানে পাওয়া যায়। তাই সামাজিক চিত্র এখানে মিশে যায় মানসিক চাহিদার সঙ্গে। কিন্তু হারুর মত বকলেস্ পরে, অন্ধকার ঘরে 'ভূতের মতো' একা থাকার চাইতে লেখাপড়া করে দিনযাপন যে তুলনায় উৎকৃষ্ট, তা অকপটে স্বীকার করে চারু, ছড়ার শেষে। ছড়ার পাশে যে ছবি দেওয়া হয়েছে, তা থেকে চারু যে বিত্তবান পরিবারের সন্তান, সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তখনই বোঝা যায় যে, চারুকে গৃহকর্মে ব্যাপৃত হতে হয়না বলেই তার শৈশব জুড়ে থাকে শিক্ষা বিষয়ে মতামত প্রদানের অবকাশ ও পোষ্যকে নিয়ে বিলাসিতা করার অবসর। এর বিপ্রতীপেই রাখা যেতে পারে 'ছেড়ে দেও না কুকুরচন্দ্র' নামক ছড়াটি (পূর্বেই আলোচিত)। দুটি ছড়াতেই রয়েছে পুষ্যির ভূমিকা ও কেন্দ্রে রয়েছে শিশুকন্যা দুজন এবং অদ্ভুতভাবে বিবৃত হয়েছে দুই ভিন্নধর্মী শৈশব-চেতনা।

বাংলা ছড়ার জগতে আরেক অবিস্মরণীয় নাম হল অন্নদাশঙ্কর রায়। ১৯৩৭ সালে রাজশাহির জেলাশাসক অন্নদাশঙ্করের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরফ থেকে একটি টেলিগ্রাম আসে নাটোরের যাত্রায় কবির সঙ্গী হওয়ার আর্জি জানিয়ে। অন্নদাশঙ্কর সেই যাত্রায় স্বয়ং মহাকবি কর্তৃক অনুরু হন ছড়া লেখার জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথও তখন ছড়া লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর বিস্মিত হলে তিনি তাঁর 'সে' বইটি অন্নদাশঙ্করকে উপহার দেন। এই বইটির সূত্রেই অন্নদাশঙ্কর ছড়া লিখতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ১৯৪২ সালে বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে 'একপয়সায় একটি'-তে পাঠিয়ে দেন ১৬টি ছড়া। পরে ঐ ছড়াগুলির সংকলন প্রকাশিত হয় 'উড়কি ধানের মুড়কি' নামে। এইটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছড়ার বই।

আটপৌরে মৌখিক ভাষা ও চলতি ছন্দে ছড়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। ছড়ার সহজ কাঠামোয় কখনো লঘু, কখনো বা গুরুগম্ভীর বিষয়ের বিন্যাস অন্নদাশঙ্করের ছড়াগুলিতে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছিল।[৬১]

অন্নদাশঙ্করের ছোটদের জন্য লেখা ছড়ার বইয়ের সংখ্যা ৭টি ও বড়দের জন্য ছড়ার বই ৪টি। আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয় ছোটোদের বইগুলিকে নির্ভর করেই বিশ্লেষণ করব। প্রথমেই 'রাঙা ধানের খই' বইটির কয়েকটি ছড়া দেখে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই আসে 'ইরা তারা' নামের ছড়াটি। এখানে ইরা ও তারা অবশ্যই দুটি মেয়ে এবং এদের অভিযানের কাহিনি ছড়ায় ধরা পড়ে। মৌখিক ছড়ায় বালিকাকে যখন প্রস্তুত করা হয় 'রাঙা মাথায় চিরুনি' দিয়ে বরের আগমনের জন্য, তখন অন্নদাশঙ্কর কিন্তু ইরাকে প্রস্তুত করেন ভিন্‌দেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য—"ইরা ইরা ইরাণী/রাঙা মাথায় চিরুনি/ইরা যাবে তেহারান/ওরা ভেবে হয়রান।"[৬২] একইভাবে বোখারা-অভিযানে ব্যস্ত হয় তারা—"তারা তারা তাতার/ঘুম আসে না তার/তারা যাবে বোখারা/বোঝে নাকো বোকারা"। সুতরাং মেয়েদের অভিযান-প্রস্তুতি চল্‌তেই থাকে 'ওদের' তথা পারিবারিক-সামাজিক অভিভাবকদের হয়রানিকে অবজ্ঞা করেই। অপরাপর দেশকে জানার যে অদম্য তৃষা অন্নদাশঙ্করের ছিল, এখানে হয়তো সেই ভাবনারই সরলীকৃত প্রকাশ ঘটেছে; আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি এই ভাবনায় সামিল করেছেন মেয়েদের স্বাধীন বিচরণকে। এই বইয়েরই 'নামকরণ' ছড়াটি বেশ মজাদার। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে কার কাকে কীভাবে নামকরণ করা উচিত, সেই বিষয়ে ছড়াটি। কবির আলগোছে মতামতই এখানে শুধু প্রকাশ পায় না, শিশুর ভাবী চরিত্রের একটি মান্যায়ন/standardization করা হয় যেন! ছিঁচকাঁদুনে, অসন্তুষ্ট মেয়েরা 'দুষ্টু', সুচারুরূপে খাওয়া-দাওয়া করতে না পারা মেয়েরা 'বিশ্রী', মিষ্টি হেসে নাকে নস্যি ভরে দেওয়ার মত দুঃসাহসী কাজে সিদ্ধহস্ত মেয়েরা 'দস্যি'! কিন্তু অন্নদাশঙ্কর এই নামকরণ প্রসঙ্গেই যখন বলেন—"দেখে যদি গয়না/ধরে শুধু বায়না/বলে, 'আমি এমনটি পাইনি'/-- এ মেয়েটা ডাইনী", তখন বিষয়টি কিঞ্চিৎ আপত্তিসূচক হয়ে দাঁড়ায়।

'ডাইনী' শব্দকে শিশুমনে এভাবে নেতিবাচক আঙ্গিকে প্রোথিত করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে অসমর্থনযোগ্য। 'ঝুমঝুমি' একটি নাম-নির্ভর ছড়া। একটি দিদির শৈশবের তুলনায় বোন ঝুমঝুমির শৈশব-আবিষ্কারের ছড়া। এখানে দুটি মেয়ের পৃথক অবস্থানের মাধ্যমে 'শৈশব' অবস্থার বৈচিত্র্য পাঠকের কাছে চিহ্নিত করেছেন কবি। 'টুনটুনি ও দুষ্টু বেড়াল' ছড়ায় একটি কাহিনির আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে ধরা পড়েছে নীতিভাবনা। প্রকৃত স্নেহের সংস্পর্শে ক্রূরতাও শুধরে যায় আর অন্যায় আবদারে স্খলিত হতে পারে চরিত্র—এই ভাবনার প্রক্ষেপ ঘটেছে এইখানে। রাস্তা থেকে তুলে আনা বেড়ালকে অবাঞ্ছিত আদরে লালন করে তাকে রাজা ছেড়ে দেন বনে—যেখানে সে পরিণত হয় বুনো বেড়ালে; আর, অন্যদিকে, টুনটুনি পাখির বাসা ভেঙে দেওয়া অপরাধী বেড়ালকে খুকু পরম স্নেহের বশে কোলে তুলে নিলে সে তার ভুল শুধরে ফেলে—"দুষ্টু বেড়াল হলো মিষ্টি বেড়াল/ ভাঙ্গে না পাখির বাসা খুকুর দুলাল/ হাত তুলে খেলা করে খুকুর সাথে/ দুধু আর ভাতু খায় খুকুর পাতে।"[৬৩] লক্ষণীয়, কবি এখানে একটি মনুষ্যেতর প্রাণীর নৈতিক/ব্যবহারিক চরিত্রের মান উন্নয়ন ঘটিয়েছেন একটি মেয়ের নিঃশর্ত স্নেহ-প্রদানের মাধ্যমে, একটি মেয়েকেই ভরসা করেছেন এই শুভকর্মের আয়োজনে—অন্যদিকে রাজা সম্পন্ন করেছেন একটি নিন্দনীয় কার্যক্রম।

মৌখিক ছড়ার পর থেকে সময় এগিয়ে এসেছে অনেকটাই। পরিবর্তিত হয়েছে দৃষ্টিকোণের। তাই অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় বিবাহ প্রসঙ্গ বারেবারে ফিরে ফিরে আসেনা—বরং পুনরাবৃত্ত হয় ছোট্ট খুকুর খেলাধুলা বা পুষ্যি নিয়ে তার নানাবিধ কল্পনার ছবি। এইখানে দুটি দিক আমরা চিহ্নিত করতে পারি—

১। অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় নিম্নবর্গের মেয়েরা নেই। তাই খুকুর পুষ্যিকেন্দ্রিক ভাবনা বিলাসিতা বলে বোধ হয় না।

২। যেকোনো বিষয় অবলম্বনেই হোক না কেন, খুকুর কল্পনা অগ্রাধিকার পেয়েছে। ‘ডালিম গাছের মৌ’ কাব্যগ্রন্থের ‘এই যে কুকুর’, ‘পুতুল’ বা ‘রাঙা মাথায় চিরুনি’, ‘আতা গাছে তোতা’ বইয়ের কিছু কিছু ছড়া—এ সব ছড়াই খুকু ও তার পুষ্যির ছড়া। এ যেন একপ্রকার খুকুর অধিকারবোধের ক্ষেত্র! খোকা ও তার পোষা প্রাণী নিয়ে ছড়া নেই মোটেই। এই বইয়ের ‘ঘোড়দৌড়’ ছড়াটি তিনটি বালিকা — খুকু, আঁখি ও মুনিয়ার, ঘোড়া ছোটাবার গল্প বলে। মোড়া, তাকিয়া বা দাদুর ভুঁড়ি—ওদের কল্পনায় সবসময় পরিণত হয় ঘোড়ায়। এখানে মেয়েদের কল্পনার বিস্তার শুধু দেখানো হ’ল তা-ই নয়, সমাজ-নির্দিষ্ট মেয়েসুলভ খেলা থেকে মেয়েদের বিরত করে ছেলেদের সঙ্গে associated ঘোড়াদৌড়কে মেয়েদের identity’র সঙ্গে যুক্ত করা হল। কবি এখানে প্রচলিত ধারণার বিপরীত উদাহরণ স্থাপন করে এক লিঙ্গ নিরপেক্ষ শৈশব নির্মাণ করলেন। এই বইয়ের ‘পড়ার ছড়া’র কেন্দ্রীয় চরিত্র মঞ্জরিণী বকুল দে সারাদিনই পড়ে। কবি ‘পড়া’ নামক ক্রিয়াপদটি নিয়ে বেশ মজা করেছেন, বিভিন্ন ধরনের ‘পড়া’র পর শেষে গিয়ে বলেছেন এই পড়ায় ব্যথা বা হাত-পা ভাঙার ভয় নেই, কারণ, “এ পড়া/গাছ থেকে নয়, ছাদ থেকে নয়/লাইব্রেরি থেকে/বই চেয়ে নিয়ে পড়া।”[৬৪] পাঠকের বিস্ময় জাগে এই ভেবে যে, অবশেষে তাহলে মেয়েদের স্ত্রী-নির্মাণ-প্রকল্পের পরিবর্তে মেয়েদের পড়াশুনো ছড়ার বিষয় হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। ছড়ায় স্পষ্ট বলা হয়, “উঠতে বসতে চলতে চলতে/পড়া!/খেতে খেতে নাইতে নাইতে/পড়া!/নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে/পড়া!/চৌপর দিন,আবার সাঁঝে/পড়া!/রাত দুপুরে তিনটে বাজে/পড়া!” মেয়েদের নির্দিষ্টকৃত কার্যাবলির পরিবর্তন - গৃহকর্ম থেকে পড়াশুনো- নিঃসন্দেহে সমাজ-বদলের সূচক। আধুনিক ছড়া এভাবে সমকালকে উপস্থাপন করেছে। ১৯৫৫ সালে অন্নদাশঙ্কর লিখেছিলেন ‘সুকুমারী’ নামক একটি ছড়া, যেটি এই বইতেই সঙ্কলিত হয়েছিল। এই ছড়াটি মৌখিক ছড়ার আদলে লিখিত হলেও তার অন্যরকম একটি পাঠ তৈরি করা যায়। সুকুমারীর বড় হওয়া ও বিবাহ-উদ্যোগ কবির কাছে মোটেও আনন্দদায়ক কোনো ঘটনা নয়। বরং, তাঁর ‘সুকুমা’র ‘বড় হওয়া’ একপ্রকার ‘দায়’,

কারণ তাহলেই বর এসে নিয়ে চলে যাবে! কন্যা কবির আদরের মানুষ বলে কবির পিতৃহৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ পায় এই দুই পংক্তিতে—"সুকুমারী দুধের সর/কেমনে করবি পরের ঘর?"[৬৫] । মৌখিক ছড়ায় যেখানে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত, "অন্নপূর্ণা দুধের সর/কাল যাবি রে পরের ঘর", সেখানে এই কবিতায় প্রকাশ পায় মেয়ের বিবাহ তথা 'শ্বশুরবাড়ি' নামক অপরিচিত স্থানে মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এক কুণ্ঠা বা দ্বিধা। "এই মেয়েটা হলে বেটা/একে নিয়ে যেত কেটা"—এ থেকে বোঝা যায়, সমাজের যাবতীয় অন্যায় আচরণ বা বিধি নিষেধের লক্ষ দীর্ঘসময় ধরে মেয়েরাই হয়ে এসেছে। ছড়াটির এই শেষ দুলাইনে সমাজের দিকে প্রশ্ন তুলেছেন অন্নদাশঙ্কর। তৈরি হয়েছে সমাজে বালক-বালিকার বিপ্রতীপ অবস্থান। এই বইয়ের শেষ প্রাসঙ্গিক ছড়া হল 'আদর কর বাঁদরকে', যেখানে খুকুকে সহবৎ-পাঠ দেওয়া হয়। এখানে সংসারকে সুখের ক্ষেত্র গড়ে তোলার শিক্ষা না দিয়ে খুকুকে শেখানো হয়, "তাই তো বলি খুকু/সবার সঙ্গে ভাব কর গো/নইলে পাবে দুখু।"[৬৬] সাধারণ সহজ উপায়ে খুকুর মানসিক বিকাশ হোক্, এই আধুনিক ভাবনার প্রক্ষেপ ধরা পড়ে এই ছড়ায়।

অসামান্য দুটি সম্পর্কের ছড়ার কথা বলা যাক 'আতা গাছে তোতা' বই থেকে। দিদা ও নাতনীর সম্পর্ক মধুর হলেও তা নিয়ে ছড়া বিশেষ রচিত হতে দেখা যায় না। কিন্তু 'মন কেমন করে' ছড়াতে ছোট্ট নাতনি মুনমুনি তার দিদুর বাড়ি ফেরার প্রত্যাশায় দিন গোনে; আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে তার ব্যাকুল মন—এমনকি, স্বপ্নে সে সান্নিধ্য খোঁজে দিদুর। অসমবয়সী এই বন্ধুত্বের ছবি সচরাচর ছড়ায় দেখা যায়না; এরকম লেখার সন্ধান পাওয়া যায়নি এর আগে। আরেকটি কবিতা হল, 'জন্মদিন'। পিতৃহৃদয়ের আবেগমথিত ছড়া। ছোট্ট মেয়ের জন্মদিনে বাবা মনে মনে ভাবেন, এই মেয়ে একদিন বড় হবে, ছোট্টটি থাকবে না। মেয়ের দীর্ঘ জীবন কামনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও তাঁর মনে জাগে, যে, মেয়ে বড় হলেই 'লক্ষ্মী' হবে, দুষ্টুমিও হারিয়ে যাবে—গত শতকেও যেখানে মেয়েকে 'লক্ষ্মী' ক'রে তোলাই ছিল একমাত্র পারিবারিক লক্ষ্য, সেখানে পরবর্তী শতকের বাবা মেয়ের দস্যিপনা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়

হয়ে উঠেছেন ব্যথিত। এ তো শুধু দস্যি মেয়ের লক্ষ্মী মেয়েতে প্রতিস্থাপন নয়, কখনো তা হয়ে ওঠে স্বাভাবিকতার নিরসনে মেয়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক অস্তিত্বের ভার। বাবা হয়তো তাই যন্ত্রণা বোধ করেন। মেয়ের সম্ভাব্য অস্তিত্ব-সংকটের আশঙ্কায় পিতৃহৃদয়ের এহেন গুরু বক্তব্য ছড়াসাহিত্যে বিরল।

'হৈ রে বাবুই হৈ' বই-এ মেয়েদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য ছড়ার সংখ্যা মাত্র একটি। বিখ্যাত ছড়া 'লাল টুক্ টুক্'। লাল ছাতা নিয়ে কালো কুচকুচ মাথার যে ছোট্ট মেয়েটির বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়, তার নাম সোনা রায়। আমরা লক্ষ করব, এই সময় থেকে মেয়েদের সাধারণ পরিচয়ের পাশাপাশি বিশেষ পরিচিতি ব্যবহার শুরু হয়। সোনা রায়ের বৃষ্টির মাঝে পথ চলার খুব স্বাভাবিক ও তুচ্ছ ইচ্ছেও প্রাধান্য পায় এবং শুধুমাত্র তার পা ভিজে থাকবে, এই দুর্ভাবনায় সম্ভবত মা ভাবিত হ'ন। আমরা আগেও মেয়েদের রূপ বা সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রক্ষার্থে মায়েদের দুশ্চিন্তিত হতে দেখেছি। কিন্তু এখানে সেই ধরনের কোনো ভাবনার উল্লেখ নেই। মেয়েকে কেন্দ্র করে মায়ের ভাবনাবৃত্তের পরিবর্তনটিও লক্ষণীয়।

অন্নদাশঙ্করের নৈতিকতা বা সহবৎ শিক্ষাদানের ধরনটি একেবারেই কড়া ভাবের নয়। খুব সাবলীল ভাষায় কোনো রকম গর্জন-তর্জন ছাড়াই তিনি শিখিয়ে দেন অনেক কিছু। ছোলাভাজার প্রলোভনে মেয়েদের ভোলানো না গেলে অভিভাবকেরা দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হয়ে এসেছিলেন 'আছাড়' দেওয়ার মতো ভয়ানক শাস্তিতে। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের লেখায় আমরা পেলাম অতি সহজ বিকল্প উপায়—"এই মেয়েটি দেখন হাসি/ওকেই আমি ভালবাসি...কান্না তোমার থামুক 'খন/তোমায় ভালোবসব, ধন।"[৬৭] অর্থাৎ, তিনি ভালোবাসায় ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন মেয়েটির যাবতীয় দুঃখ! এই বইতেই রয়েছে মেয়েদের রান্না বিষয়ক একটি ছড়া। মেয়েরা হবে 'রন্ধনে দ্রৌপদী'—অন্তত সামাজিক চাহিদা তেমনটাই। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের ছড়ায় ঘটে উলট-পুরাণ। 'আহা কী রান্না'[৬৮] ছড়ায় এমন একটি মেয়ের কথা বলা হয়, যার রান্নায় সর্বদাই ঘটে লবণাধিক্য এবং এমন এক 'বৌমা'র কথা বলা হয়, যার রান্নায় পাওয়া যায় শুধুই

চিনির স্বাদ। কিন্তু এই দোষ কবি ঢেকে দেন কাব্যিক তর্জমায়। তিনি এদের নতুন নামকরণ করেন যথাক্রমে 'লাবণী' ও 'মৌমা'। মেয়েদের দোষত্রুটিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে শেখান কবি এই ছোট্ট ছোট্ট ছড়ার মধ্যে দিয়ে।

'সাত ভাই চম্পা' অন্নদাশঙ্করের ছোটদের জন্য লেখা শেষ ছড়ার বই। এই বইতে তিনটি ছড়ার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমেই বলা যেতে পারে 'খুকুর জন্য ছড়া'র কথা। ছড়ার নামেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই লেখাটি বিশেষভাবেই খুকুর মন-ভোলানিয়া ছড়া। খুকুর জন্য কবি নামিয়ে আনতে চান 'এরোপ্লেন' বা 'হেলিকপ্টার'—মন ভোলানোর ধরন বা উপকরণ পালটে যেতে শুরু করে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। অন্নদাশঙ্কর ছোটদের ছড়াতেও খুব সহজভাবে বলতেন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ তথা বাংলা ভাগের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র ক্ষোভ লঘু চালে তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'রাঙা ধানের খই' কাব্যগ্রন্থের অতি বিখ্যাত ছড়া 'খুকু ও খোকা' তে—"তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো/ তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ বাংলা ভেঙে ভাগ করো/ তার বেলা?"। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সুরারোপিত হওয়ায় এই গানটিও খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একই ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর 'সাত ভাই চম্পা' বইয়ের 'দাদু ও নাতনি' নামক ছড়ায়। নাতনি তার দাদুকে জিজ্ঞেস করে, "তোমরা তখন করছিলে কি/ভাংলো যখন বঙ্গ?"[৬৯] নাতনির কাছে এই বিষয়টি ধরা পড়েছে 'রঙ্গ' হিসেবে। দাদুর অকপট স্বীকারোক্তি, "দিদি, আমরা তখন করতেছিলাম/ ভায়ে ভায়ে দঙ্গ...লীগ বলেছে , কাটতে হবে,/ নইলে হবে জঙ্গ"। অন্নদাশঙ্কর কল্পিত 'নাতনি' বেশ সচেতন। তাই সে যেসব প্রশ্ন তোলে, তা রাজনৈতিক। 'রাজা', তথা ইংরেজ সরকারের অবস্থিতিতেই কীকরে দুটি ভিন্ন দলে যুদ্ধ বা 'জঙ্গ' হতে পারে, এ প্রশ্ন জাগে তার মনে। আবার দাদু সরলীকৃত করে বলেন তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি—"দুই শরিকের খাঁই মেটাতে/রাজা হলো ভঙ্গ"। শেষ স্তবকে দাদুর বক্তব্যে উঠে আসে রাজনৈতিক সত্য—"দিদি, স্বপ্ন ছিল আমরা পাব/সিন্ধু থেকে গঙ্গ/সিন্ধু গেছে গঙ্গ

আছে/স্বপ্ন হল ভঙ্গ"। স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও প্রকৃত স্বাধীনতার স্বপ্নের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছিল বিশ শতকের চল্লিশের দশকে, তার স্পষ্ট ছবি ধরা পড়েছে দাদু-নাতনির কথোপকথনে। এরকম সচেতন রাজনৈতিক কথাবার্তা ছোটদের ছড়ায় বিশেষ দেখা যায় না।

মেয়েদের শিক্ষা বা লেখাপড়া বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের একটি ছড়া একটু অন্যরকম। 'সাত ভাই চম্পা' নামক কবিতার বইয়ের 'সবুরে মেওয়া ফলে' ছড়াটিতে একটি মেয়ের লেখাপড়ার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কবি দেখিয়ে দিয়েছেন একটি বালিকার উপর অযথা চাপ সৃষ্টি করে তাকে আট বছরের মধ্যে মাধ্যমিক, বা পনেরো বছরে স্নাতকোত্তর বা কুড়ি বছরে ডাক্তারি পড়তে বাধ্য করা হলে মেয়েটি ক্রমশ যন্ত্রে পরিণত হবে এবং পরিবারের আশানুরূপ ফল করতে না পারার কারণে সমাজের চোখে সে 'অধম' বলেই চিহ্নিত হবে। তাই তিনি উপায় হিসেবে নির্দেশ/পরামর্শ দেন যে, "কচি মেয়ে ওর বয়সে খেলাধূলাই সাজে/ পড়াতে কি মন বসতে চায়/ ছেলেবেলা হারিয়ে গেলে যতই তাকে ডাকো/ আসবে নাকো আর সে পুনরায়।"[৭০] আমরা লক্ষ করব, এই ছড়াতে শুধুমাত্র একটি মেয়ের লেখাপড়ার গল্প নেই—এখানে ধরা পড়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চিত্র। মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল আট বছরে বালিকার বিবাহ তথা 'গৌরীদান প্রথা'। 'কচি মেয়ের' 'ছেলেবেলা' হারিয়ে যেত সেই দিনেই। লেখক তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার অতিরিক্ত ভার ও অভিভাবকের অতিরিক্ত প্রত্যাশায় কোনো এক মেয়ের অথবা সেই সময়ের হাজার হাজার মেয়ের শৈশব হারিয়ে যেতে দেখে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। অন্নদাশঙ্করের সময়ে মেয়েদের শিক্ষা সুপ্রচলিত। তাই ছড়াটির ভরকেন্দ্র শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে হয়ে উঠেছে মেয়েদের শৈশব-হত্যা-পরিকল্পনা। সমাজ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ বিষয়ে পরিবার বা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি—অবলম্বনটুকু বদলেছে শুধু। তাই ছড়ার শেষ স্তবকে কবি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, "বুদ্ধিমতী মেয়ে তোমার সেও একটি মেওয়া/ সবুর কর, ফলবে

সুনিশ্চয়”। মেয়েকে নিজগুণে সমাদৃত করে রাখাটাই কাম্য—সংবেদনশীল কবি এভাবেই দেখতে চেয়েছেন এক বালিকা বা কিশোরীকে।

অন্নদাশঙ্করের ছোটদের ছড়ার জগৎ প্রসঙ্গে সমালোচক প্রণব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, “ছোটদের ছড়ায় অনাবিল মজা-আনন্দ এবং অবাস্তবতার আড়ালে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এবং সমাজ-সংস্কারের অনেক অন্যায়-অসামঞ্জস্য সম্পর্কেও একটা ধারণা জন্মায়.....শিশুদের ছড়ার ক্ষেত্রেও শুধু অবাস্তবতা আজগুবি ও অসম্ভাব্যতার ছোট কিছুকে শব্দ ও ছন্দের মজায় অনেক বড় করে দেখানোর চেষ্টা নেই। বরং ছোটদের মধ্যে স্বপ্নময়তা এবং কিছু পরিমাণ রহস্যময়তার রসসৃষ্টির প্রয়াস আছে।”[৭১] এই সমস্ত কারণেই অন্নদাশঙ্করের ছড়াগুলিতে মেয়েদের পৃথক পরিচিতি তৈরি হয়েছে। মেয়েদের শৈশব-কৈশোর চিত্রণের ক্ষেত্রেও তিনি প্রচলিত পথের বাইরে হেঁটেছেন। তাই তার সম্পর্কে এই উক্তিটি—“প্রবন্ধকার কথাসাহিত্যিক ভ্রমণ সাহিত্যকার কবি সমাজভাবুক কবি সব অন্নদাশঙ্করকে ছাপিয়ে ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে বিরাজ করবেন”[৭২]— নিঃসন্দেহে যথাযথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগৃহীত ‘ছেলেভুলানো ছড়া’য়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোটদের ছড়ায় মেয়েদের ছোটবেলা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ করার পর আমরা আমাদের আলোচনার ধরন কিছুটা পরিবর্তন করতে চলেছি। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনা না করে এবারে আমরা বেছে নিয়েছি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘পাঁচশো বছরের কিশোর কবিতা সংকলন’ নামক বইটি—যেখানে দীর্ঘ পাঁচশো বছরের কিশোর-মন-উপযোগী প্রচুর ছড়া সংকলিত হয়েছিল। এই বইয়ে প্রায় কালানুক্রমেই সাজানো হয়েছে ছড়াগুলি এবং দুই বাংলার প্রায় সমস্ত কবি, যাঁরা কোনো না কোনো সময় শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের সকলেরই প্রতিনিধিস্থানীয় লেখা এই বইতে সংকলিত করা হয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের ভাবনার পরিবর্তে আমরা দীর্ঘ সময়পর্বে রচিত বিভিন্ন ছড়ায় মেয়েদের শৈশব-কৈশোর কীভাবে বর্ণিত হয়েছিল, তার কিছু প্যাটার্ন(ধরন) লক্ষ করব ও সেই

অনুযায়ী বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে করতে এগোব। এর ফলে আলোচনার ক্ষেত্রটিও বিস্তার পাবে বলেই আমার অনুমান।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সরল দে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'পাঁচশ বছরের কিশোর কবিতা'। 'কিশোর বন্ধুদের কবিতামুখী' করে তোলার তাগিদে 'কিশোর মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা' ক'রেই এই সংকলন প্রকাশ করা হয়েছিল বলে সম্পাদক জানাচ্ছেন। এই ভাবনা থেকেই বোঝা যায়, এই সংকলনে শিশু-উপযোগী ছড়া (যে বিষয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি) সংকলিত হয়নি। এই সূত্রেই আমরা চলে যাব আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় স্তরে—যেখানে বালিকার বাল্যকালের বিচিত্র ছবি বিশ্লেষণ করা হবে না, কিশোরী-মনস্তত্ত্ব প্রাধান্য পাবে। এই সংকলনে রয়েছে মোট চারটি অধ্যায়—ইতিহাসের কালানুক্রমিকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বজায় রাখা হয়েছে। সংকলনে রয়েছে ওপার পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশের কিশোর-কবিতাও।

আমরা অবশ্য কালানুক্রমিক আলোচনা করব না। আমরা চারটি অধ্যায় থেকে মেয়েদের অবস্থান/অস্তিত্ব-বিষয়ক ছড়া বা কবিতাগুলি প্রথমেই পৃথক করে নিয়েছি। দেখা গেছে, এই সমস্ত কবিতার কয়েকটি প্যাটার্ন বা ধরন বা ছক রয়েছে। আমরা প্রথমে সেই শ্রেণিগুলির উল্লেখ করব এবং তার পরে সেই শ্রেণি অনুসারে বিশ্লেষণ এগিয়ে নিয়ে যাব। শ্রেণিগুলি নিম্নরূপ—

১। প্রকৃতি ও কন্যাবন্দনা

২। ভাই-বোন সম্পর্কের বিন্যাসে মেয়েরা

৩। নতুন রূপকথার সম্ভাবনা

৪। 'মেয়েলি' বনাম 'পুরুষালি'—মেয়েদের অবস্থান

৫। প্রান্তিক কিশোরীর মেয়েবেলা

৬। পিতা-মাতা-কন্যার শাশ্বত সম্পর্ক

৭। মেয়েদের 'নাম'ধারী কবিতা

১। প্রকৃতি ও কন্যাবন্দনা –

কন্যাসন্তানকে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা অতি প্রাচীন রীতি। এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে, অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বা উনিশ শতকের প্রথম পর্বে রচিত কবিতাতেই সর্বাধিক এই ধরনের কবিতার উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'খুকুরাম' কবিতায় লিখেছিলেন,"তুই কি চাঁদের কণা পারিজাত কলি,/কোন্ সুরপুর হতে এলি তুই চলি?"[৭৩] আবার, অনেক সময় প্রকৃতির উপরেও আরোপ করা হয় কোনো কিশোরীর গুণাবলী। মূলত বর্ষার বর্ণনায় বারে বারে ফিরে আসে মেয়েদের উচ্ছ্বলতার প্রসঙ্গ। মানকুমারী বসুর 'বর্ষারাণী' কবিতার নামকরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় কবির অভিপ্রায়—"রাত দিন টুপ টুপ/এ কী সাজ অপরূপ/গলায় কদম-হার/এ কী সাজ কী বাহার।"[৭৪] কিশোরী মেয়ের সাজগোজের যে স্বাভাবিক উন্মাদনা, তা যেন প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয়। আবার, অতুলপ্রসাদ সেনের 'মেঘের দল' কবিতায় মেঘ যেন কিশোরী মেয়ের দল! সাদা,নীল বা "রঙিন ওড়না" গায়ে তারা ভেসে বেড়ায়—উদাত্ত মেঘগর্জন কবিকল্পনায় পরিবর্তিত হয়ে যায় নূপুরের শিঞ্জনে/নিক্কনে। এর পরে আবার কবি মেঘের ভেসে চলার প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেন রাধা-কৃষ্ণ মিথ/অনুষঙ্গ—"তারা কোন্ যমুনার নীরে ভরবে গাগরী/কার বাঁশরী শুনলো এরা সাগর-নাগরী, মরি মরি!"[৭৫] মেঘের চরিত্রে আরোপ করা হয়েছে কিশোরীর বৈশিষ্ট্য। বর্ষা ঋতুর পাশাপাশি শরৎ ঋতুকেও মেয়ের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর প্রবণতা দেখা যেত কবিদের মধ্যে। এমনই একটি কবিতা মোহিতলাল মজুমদারের লেখা 'কন্যা শরৎ'। নামকরণটিই আভাস দেয় কবিতায় বিষয়ের। শরৎ ঋতুর সাজ-সজ্জা বর্ণনায় কবি কটি মেয়ের আদল কল্পনা করেন। মেয়েরা স্বভাবতই অলংকার-প্রিয়; এই বোধটিও যেন ধরা পড়ে কবির ভাবনায়—"দোপাটি ফুল—চুট্‌কি পায়ের/সন্ধ্যামণির নাকছাবি,/গোট পরেছে অপরাজিতার/কুন্দকলির সাতনরী হার/আঁচল-খুঁটে রিংটি ভরা/কৃষ্ণকলির লাখ-চাবি।"[৭৬] এমনকি একটি মেয়ের রূপলাবণ্য বিষয়ে সচেতনতাও প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়, শরৎ ঋতুর ভাবনায়—"শিউলিগুলি খোঁপায় পরে/সাঁজের প্রদীপ

নেয় জ্বেলে/ভোর আঁধারে চুলটি খুলে/আবার সে সব দেয় ফেলে”—মনে হয়, প্রকৃতির ওপর কিশোরী সত্তা আরোপিত হয়েছে।

এভাবে দেখা যায়, কখনো কবিরা কন্যাসন্তান-চিত্রণে প্রকৃতির উপাদান গ্রহণ করেছেন; কখনো আবার প্রকৃতি-কল্পনায় কন্যাসত্তার আরোপ করেছেন। এই পারস্পরিক উভমুখী চলন দেখা গিয়েছে প্রাথমিক পর্বের মেয়ে সংক্রান্ত ছড়াসমূহে।

২। ভাই-বোন সম্পর্কের বিন্যাসে মেয়েরা –

ভাই ও বোনের সম্পর্ক নিয়ে প্রচুর ছড়া লিখিত হলেও এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে দুটি ছড়া। এর মধ্যে প্রথমে উল্লেখ্য যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখা ‘কাজলা দিদি’ কবিতাটি। দিদির মৃত্যুতে বিহ্বল, শোকগ্রস্ত অনুজটি জিজ্ঞেস করে চলে দিদির আচমকা অন্তর্ধানের রহস্য। দিদির সঙ্গে তার স্মৃতি যা-কিছু কেন্দ্র করে, সেসব আপাত-তুচ্ছ বিষয়েই কবি আলোকপাত করেন। দিদি প্রকাশ্যে না থাকলেও দিদির স্নেহ জড়িয়ে থাকে পুরো লেখাটিকে। এই সম্পর্কের আর যে লেখাটি এই বইয়ে রয়েছে, সেটিও করুণ রস-নির্ভর।

নিজের বাড়ি ছেড়ে কলকাতার কলেজে সদ্য-ভর্তি-হওয়া এক দাদার সঙ্গে বোনের বিচ্ছেদস্মৃতি এই ছড়ার মূল বিষয়। কুসুমকুমারী দাশের লেখা ‘দাদার চিঠি’ ছড়ায় দাদার মনে পড়ে তার ছোট্ট বোন বুলির আবদার—“সেই যে বুলি ঠোঁট কাঁপায়ে চুলের গোছা ছেড়ে/’যেতে নাহি দিব’ বলে দাঁড়িয়েছিল দোরে”[৭৭]-- তবু দাদাকে যেতে দিতে হয়—বিরহবিধুর মনের সম্বল হয় এই নিখাদ ভালোবাসার সম্পর্ক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘ফোঁটা’ কবিতাটি একটি অসহায় বোনের জবানিতে ব্যক্ত। ভাই-এর জন্য বোন অক্লান্ত পরিশ্রম ক’রে কখনো পোষাক তৈরি করে, কখনো তরোয়ালের খাপ বানিয়ে দেয়, কখনো বা হাত পুড়িয়ে ভাত রান্না করে। কিন্তু সবসময় ভাইয়ের সাহচর্য শুধু দুর্লভ তাই নয়, ভাই এর কাছ থেকে সে ‘লাথি-ঝাঁটা’ বা ‘খোঁটা’ও সহ্য করে থাকে। হয়তো

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি ছবি এখানে ধরা পড়ে, যেখানে ভাই রথের নিশান উড়িয়ে তরোয়াল নিয়ে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে; কিন্তু বাড়ির একরত্তি বোনটিকে দেখার সময় হয় না— অথচ বোন ভাইয়ের যাবতীয় সুদিনের আকাঙ্ক্ষায় "যমের দুয়ারে কাঁটা" দিয়ে যেতে থাকে। পারিবারিক প্রত্যাশাও সম্ভবত এমনটাই। এই দ্বিবিধ পারিবারিক চাহিদা থেকে তৈরি হতে পারে 'Sibling's Rivalry'—১৯৪১ সালে ডেভিড লেভির ভাবনায় এমন বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায়, বাঙালির মানসগড়নে এই বিরোধী ভাবনাকে অতিক্রম করে বোন হয়ে উঠেছে সর্বংসহা।

৩। নতুন রূপকথার সম্ভাবনা —

রূপকথার কাঠামোয় নতুন বিষয় সংযুক্তি বা রূপকথার কাহিনিকে যুগোপযোগী করে প্রকাশ— দুভাবেই ছড়া লিখিত হয়েছে। এই বইয়ে সংকলিত রূপকথার আদলে লিখিত কল্পলোকের সেই ছড়াগুলি দেখে নেওয়া যাক, যেখানে মেয়েদের কথা কোনো না কোনোভাবে উচ্চারিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'জোনাকিরা' ছড়াটির কেন্দ্রে জোনাকিদের কেন্দ্র করে এক রোম্যান্টিক আবহ তৈরি হয়, সেখানে উঠে আসে পরীদের কথা। কবি কল্পনা করেন রাতের জোনাকিরাই দিনের প্রজাপতি ও পরীরা তাদের 'রাখাল' — মাঠের আঁধারে ছোট্ট ফড়িঙে সওয়ার হয়ে 'ছোট্ট পরী' জোনাকি চরায়! "রাখালের মতো তারা কোথাও বসে/বাজায় না মেঠো বাঁশি শুয়ে আলসে?"[৭৮]—রাখালের যে আর্কেটাইপ, তা পরীর ওপরে আরোপ করা হয়। 'রাখাল' বলতেই যে কিশোরের প্রচলিত ছবি আমাদের মননে ভেসে ওঠে, তাকে কবি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেন — পরীকে করে তোলেন রাখালিয়া; ঘরের মেয়েরাই কবির কল্পলোকে 'পরী'তে রূপান্তরিত হয়।

ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'মনের কথা' কবিতায় খুকুর সঙ্গী হয় আকাশের তারা। একটি শিশুর একাকীত্বের সঙ্গী সে-"খুকু বলে তার ঘরের কথাটি/ তারার কাছে/দূরের কাহিনি

তারা বলে মুখে/দুজনে নাচে/দুজনের কাছে দুজনে বলে/মায়ের কথা/ দূরের সাথীরে পেয়ে জাগে বুকে/কি ব্যাকুলতা।"[৭৯] একলা খুকু অনায়াস বাক্যালাপে রত থাকে তারই নির্মিত কল্পলোকে। এই কবিতায় খুকুর কল্পজগতের সরণটি লক্ষণীয়।

রূপকথায় সমকালকে মিশিয়ে দিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী তাঁর 'মকরমুখো সাতটি ডিঙায়' ছড়ায়। রাজপুত্র প্রচলিত ছক অনুযায়ী সাত ডিঙায় সওয়ার হয়ে সমস্ত বাধা বিপদ কাটিয়ে রাজকন্যাকে বিয়ে করে যখন নিয়ে যেতে চায়, তখন সে ডিঙায় যেতে চায় না মোটেই — "বললে — আনো মোটর গাড়ি/তাইতে যাব চড়ে।"[৮০] বোঝা যায়, রাজকন্যারও চাহিদা বদলেছে। রূপকথার রাজ্য ছেড়ে সে পা ফেলেছে বাস্তবের ভূমিতে।

অপূর্বকুমার কুণ্ডুর লেখা 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' কবিতাটি শুরু হয় রূপকথার মোড়ক ভেঙে—"রূপকাহিনীর দরজাতে আজ কে লাগালো তালা/নামলো পথে অরুণ-বরুণ এবং কিরণমালা।"[৮১] রূপকথায় যেকোনো সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান হয় এবং তা একটি মধুর পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। মূলত এগুলি হল রাজপুত্রদের অভিযান — যার কেন্দ্রে থাকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করার পুরুষালি দম্ভ। কিন্তু রূপকথার কিরণমালা প্রথম থেকেই ব্যতিক্রমী। ভাইদের সন্ধানে সে-ই বেরোয় অভিযানে, সফলতাও অর্জন করে। এই ছড়াতেও সেই মূল সুর ধরে রেখেছেন কবি—নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে অরুণ-বরুণের সঙ্গে পথে নেমেছে কিরণমালাও—ক্ষিদের জ্বালায় "মোট বইছে অরুণ-বরুণ ইষ্টিশানের কাছে/পথের ধারে কিরণমালা কয়লা শুধু বাছে"! বোঝা যায়, রূপকথার দিন শেষ হয়ে এসেছে — রাজকন্যা কিরণমালা এখন জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। কবি এদের উদ্দেশে বলেন — "সামনে ছুটে যা রে তোরা নতুন পথের টানে/সবার প্রাণে লাগুক জোয়ার তোদের গানে গানে"। অর্থাৎ, রূপকাহিনির পালা ভুলে গিয়ে নতুন জীবন-কাহিনি রচনা করতে সাহস জোগান কবি এদের মত শত শত ছেলেমেয়েদের — কিরণমালা সেই নবনির্মাণের সূত্রধর।

৪। ‘মেয়েলি’ বনাম ‘পুরুষালি’—মেয়েদের অবস্থান—

মেয়েরা বা ছেলেরা কেমন ভাবে ‘বড়’ হয়ে উঠবে, তা আমাদের ‘সমাজ’ নির্ধারণ করে থাকে। সেই নির্দেশেই মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট হয় গৃহকোণ, অর্পিত হয় ঘর-গৃহস্থালির কাজ আর, ছেলেদের করে তোলা হয় বহির্মুখী। কোমল-স্বভাবা এই ধরনটিকেই ‘মেয়েলি’ ভাবনার অন্তর্গত করে বলা হয় এবং এর বিপ্রতীপে ছেলেদের কাজগুলি হয়ে ওঠে ‘পুরুষালি’। এই দ্বন্দ্ব চিরকালীন।

উক্ত দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করেছেন কবি বনফুল। বাংলায় মহান কীর্তি গড়তে তিনি ডাক দিয়েছেন ছেলে ও মেয়ে উভয়পক্ষকে। দশ দিক আলো করে বাংলাকে নতুন পথ দেখানোর জন্য তরুণ প্রজন্মকে লিঙ্গগত ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে আসতে বলেছেন—“তোমরাই নির্ভর। তোমাদেরই স্বপ্ন/দেখিতেছি মোরা সবে—গণিতেছি লগ্ন।”[৮২] তথাকথিত ‘পুরুষালি’ উদ্দীপনায় বনফুল সামিল করেছেন মেয়েদের—যুগের দাবিতে মেয়েদের এই অগ্রসরমানতা নিঃসন্দেহে এক অন্যরকম ‘মেয়েবেলা’র ছবি প্রকাশ করে।

বিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরীর ‘দোপাটি’ কবিতাটি একেবারেই আমাদের অতি পরিচিত মেয়েদের শৈশবাবস্থার একটি টুকরো তুলে ধরেছে। ‘ফুটফুটে খুকুমণি’ সারাদিন ব্যস্ত থাকে রান্নাবাটি খেলায়। তার কল্পনায় বালি হয় ভাত, পাথর হয় ঝোলের উপাদান। সকলকে খেতে দিয়েই তার তৃপ্তি! লক্ষণীয়, ‘গিন্নী’ পরিচিতিটি তার খুব প্রিয়। ঘোমটা টেনে চলতে গিয়ে পড়ে গেলেও হার স্বীকারে নারাজ সে। এখানে দোপাটির অনুকরণ-প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে এবং খুকুদের ultimate গন্তব্য যে রান্নাঘর, সেই ভাবনাই ফুটে উঠেছে। ছড়াটি নিশ্চিতভাবেই সুখপাঠ্য, কিন্তু, মেয়েলি খেলা বা মেয়েলি কাজের এ এক অতি পরিচিত নিদর্শন।

গৌরকিশোর ঘোষের ‘দুটি কবিতা’ দুই ভাগে বিভক্ত—‘আমার বাবা’ ও ‘আমার মা’। সেখানে বাবা ডাক্তার ও বহির্জগৎ বিষয়ে চিন্তাশীল। কিন্তু মায়ের যে বর্ণনা কবি দেন তা হল,

"এক যে ছিলেন গিন্নী/কোনওদিনই সাতে-পাঁচে থাকেননি/পরের বাড়ির বিয়ের ভোজে/খুব করেছেন রান্না/নিজের ঘরের দরজা এঁটে খুব করেছেন কান্না।"[৮৩] অন্দরমহল তথা হেঁসেল সামলে পরের কারণে নিজেকে উৎসর্গ করেন মায়েরা। এই ছড়াটি সরাসরি কোনো ছোট মেয়ের ছবি তুলে না ধরলেও বুঝিয়ে দেয় মেয়েদের সর্বংসহা হয়ে উঠতে হয় ধীরে ধীরে। 'আত্ম' কে বিসর্জন দিয়ে 'পর'-এর সেবায় নিয়োজিত হতে হয়। বালিকার পূর্ণাঙ্গ নারী হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই পাঠ আবশ্যক বলে এই শ্রেণিতে এই ছড়াটি আলোচনা করা হল। বুদ্ধদেব বসুর 'চম্পাবরণ কন্যা' ছড়াটি এই পর্যায়ের শেষ আলোচিতব্য। 'রংমশাল' পত্রিকার সম্পাদকের কন্যা ছড়ার কেন্দ্রীয় চরিত্র। তিনি "ঘর করেছেন আলো/সমস্ত তাঁর ভালো/দোষের মধ্যে একটি শুধু রাত্তিরে ঘুমোন না।"[৮৪] কিন্তু এইটুকুতেই কন্যার কথা ফুরিয়ে যায় না। তথাকথিত 'মেয়েলি' স্বভাবের ঊর্ধ্বে তার এক অন্য পরিচিতির কথা বলেন কবি—"ঘুমপাড়ানি বঙ্গে/ঘুমকাড়ানি সঙ্ঘে/বক্তৃতাতে তর্কাঘাতে আপন নামে ধন্যা"। মেয়েদের 'নিজস্বতা'য় জোর দিয়েছেন কবি এইখানে। ছড়ার শেষে কবিকে চিন্তিত হতে হয় এই ভেবে যে ঠিক কী ধরনের পদ্যে মেয়েটিকে তুষ্ট করা যাবে! বাগ্মী, তার্কিক, পদ্যরসিক মেয়েকে আমরা হয়তো এখানেই প্রথম পেলাম।

৫। প্রান্তিক কিশোরীর মেয়েবেলা —

আমাদের এ যাবৎ আলোচনায় আমরা মেয়েদের নানা ধরনের শৈশব ও কৈশোর-যাপনচিত্র পেয়েছি। কিন্তু এই পর্বে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক এক 'মেয়েবেলা'য় আলোকপাত করতে চলেছি। সমাজের প্রান্তবাসী, 'ভদ্রলোকে'র গণ্ডির একেবারে বাইরে যে ইতর সমাজ শ্রেণির অবস্থান, সেখানেও নিঃশব্দে মেয়েদের জীবন বয়ে চলে। এই মেয়েরা জনসমাজে চিহ্নিত হয় 'ওরা' বলে; কিন্তু 'ওরা' কাজ করে, পৃথিবীতে টিঁকে থাকার লড়াই চালিয়ে যায় শৈশব-কৈশোর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। সেইরকমই কয়েকটি কবিতা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের লেখা ‘কুড়ানী’ কবিতাটি দিয়েই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। রোগশয্যায় শায়িত, পিতৃহারা, প্রায়-আশ্রয়হীন একটি কিশোরী দিনযাপন করে শুকনো পাতা, কাঠ, খড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা থেকে কুড়িয়ে—তাই তার পরিবার-প্রদত্ত নাম হারিয়ে সামাজিক পরিচিতি হয়ে যায় ‘কুড়ানী’ নামে। দীর্ঘ কবিতায় কুড়ুনী মেয়েটির বয়ানে ধরা পড়ে তার বারমাস্যা। পৌষের শীত বা বর্ষার বৃষ্টি—সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই কুড়ুনীর জীবন সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। কুড়ুনীরা প্রান্তবাসী। তাই অন্ন সংগ্রহের পদ্ধতিটিও ভয়াবহ—যেন সমাজের উচ্চবিত্তের উচ্ছিষ্টেই তাদের একমাত্র অধিকার—মূল অন্নে নয়। পাড়ার লোকেদের আঁটি আঁটি ধান নিয়ে যাওয়া হয়ে গেলে “পিছু পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বার করি মোর ঝুলি/ যেটি পড়ে ভুঁয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটি খুঁটে নিই তুলি।”[৮৫] ভগ্ন স্বাস্থ্যে ভর করেই কুড়ুনী মেয়েটি শীত শেষে শুকনো পাতা তোলে—প্রবল বর্ষণে ঘরের চালা আগলায়, ভেজা কাঠে রান্না করে এক গা কাদা মেখে নালি থেকে তুলে আনা চুনোপুঁটি মাছ—একা হাতে সামলায় একচিল্‌তে সংসার। নিম্নবর্গের প্রতিনিধি কুড়ুনী সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য-প্রায়। তাই, “তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ হাঁ করে আসে ছুটে/মোর ভাগে থোয়, লোকে যা না ছোঁয়, নিতে হয় তাহা খুঁটে”। এই জাতীয় প্রতিবেশী কুড়ুনীর দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়াতে ঘৃণা বোধ করে আর কখনো তার সংগ্রামকে ঈর্ষা বা ব্যঙ্গ করে বলে, “শোবে একদিন কুড়ুনী রূপোর খাটে”। এতৎসত্ত্বেও কুড়ুনী দুর্নিবার। শেষ স্তবকে ব্যক্ত হয় তার দৃঢ়চেতা মনোভাব—“কাঁচা আলে কারো দিইনা পা আমি, পাকা ধানে কারো মই/চাক্‌রি করি না ভিখ্‌ ও মাগি না, এমনি করেই রই”। অপরের আজ্ঞাবহ বা করুণার মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে কুড়ুনী তৈরি করে নিজস্ব পরিচিতি—হোক্‌ তা সর্বহারার পরিচয়, তবু সে স্বাধীন। এক নিম্নবর্গীয় কিশোরীর দিনযাপন চিত্রের অন্তরালে এভাবেই পরিস্ফুট হয় এক সমান্তরাল মেয়েবেলা।

সুশীলকুমার গুপ্তের ‘বেদের মেয়ে’ ছড়াটি আরেক প্রান্তবাসীর ভিন্ন স্বাদের কৈশোরকে উপস্থাপিত করে। সাপ খেলা, ভোজবাজি, চট্‌জলদি ভেল্‌কি ইত্যাদি নানা ধরনের খেলা

দেখানো বেদে জাতির পেশাগত পরিচিতি। ছড়ার ‘বেদের মেয়ে’টি সেই জাতিগত পেশাকে বহন করেই পৌঁছেছে এক ভদ্র পাড়ায়। এরা ব্রাত্য। তাই সচরাচর কোনো শিক্ষিত রুচিশীল মানুষের হৃদয়ে এদের স্থান পাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু ছড়ার অপর চরিত্র ‘খোকন’ নিজের অজান্তেই এই মেয়েটিকে আপন করে নেয়। মেয়েটির রঙ্গিন সাজে তার চোখে ঘোর লাগে, মেয়েটিকে মনে হয় ‘পরী’, এমনকি, মনে মনেই তার নাম রাখে ‘কনকচাঁপার কলি’; আর, এমনি করেই তৈরি হয়ে যায় অসমতুল এক বন্ধুত্ব—“লুকিয়ে তাকে এনে দিই চাল, পয়সা, ছেঁড়া কাপড়/সে দেয় আমায় কত রকম কাঠের মালা, পাথর।”[৮৬]। কথাপ্রসঙ্গে উঠে আসে খোকনের দিদি ও মায়ের মৃত্যুর কথা—সরলমতি খোকন বেদের মেয়ের ভেলকিতে ভর করে ছুটে যেতে চায় তার মা ও দিদির কাছে। কিশোরী বেদের মেয়ে বুদ্ধিমতী। তাই সে খোকনকে “বলে দুষ্টু হেসে/ তোমায় আমি নিয়ে যাব নীল আকাশের দেশে”। তারপর থেকে সে ঐ পথ চিরতরে ত্যাগ করে—খোকন আবার ডুবে যায় একাকীত্বে, ‘কনকচাঁপার কলি’র আগমন প্রত্যাশায় শেষ হয় ছড়াটি। এই ছড়ায় খোকনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকলেও সামাজিকভাবে অপাংক্তেয় একটি মেয়ের হৃদয়বত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এবং, শ্রেণিগত বৈষম্য কে দূর করে দুটি হৃদয় পরস্পরকে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়েছে। নিম্নবর্গের মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন বা কল্পনার মতো বিরল বিষয় এই কবিতার মূল উপজীব্য।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের একটি নামবিহীন ছড়ার কথা দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। “বাবলু তুই রাজা হবি, বাবলি তুই রাণী/ গা থেকে সব ফেলবো ঝেড়ে নোংরা কাঁথাখানি”[৮৭]—ছড়ার প্রথম লাইনদুটি বুঝিয়ে দেয় ছড়াটি নিম্নবর্গের স্বপ্নের গল্প—অধরাকে ধরার বা অপ্রাপণীয়কে পেতে চাওয়ার গল্প বলবে। ফোক্‌লা দাঁতের বাবলি সহায়সম্বলহীন—রাণিসুলভ নয় মোটেই। কিন্তু তাকেও বাবলু আপ্রাণ ভালোবাসতে চায়, স্বপ্নের কলকাতায় তারা প্রজা ও রাজা কে এক স্তরে বসিয়ে নিতে চায়। বাবলিকে রাণি ভাবার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লিখিত হয়, তা শুনে/পড়ে বুর্জোয়া মননে আঘাত লাগে—“বাবলি তুই বড্ড রোগা, ঘুমকাতুরে

বড়--/রাত না হতে তুই কেবলই খিদেয় জড়োসড়ো"! বাবলিরা খেতে পায় না রোজ—তবু কিশোরীর মন স্বপ্ন দেখে—"বাবলি আরো বেশি চেনা, রাণীর মতো রাণী/ চাবুকে নয়, থাকবে সুখে এখন জনপ্রাণী"। সমাজের উপরতলার নির্দেশে যাদের ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হয়, উচ্চবিত্তের শোষণে রোজ যারা মৃতবৎ দিনযাপন করে, তারাই স্বপ্ন দেখে কোনো একদিন সুখে, সমানাধিকারে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার পাবে তারা। বাবলির মতো নিঃস্ব কিশোরীরাই হবে সেই স্বপ্নযাত্রার কাণ্ডারী।

৬। পিতা-মাতা-কন্যার শাশ্বত সম্পর্ক –

ছড়া যেদিন থেকে মায়েদের মুখে মুখে রচিত হতে শুরু করেছিল, সেইদিন থেকেই মায়েদের অসম্পূর্ণ সাধ-আহ্লাদ তাঁরা তাঁদের কন্যারত্নটির মাধ্যমে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন এবং কখনো আবার তাঁদের নিজেদের জীবনে যে দুর্বিষহ দিন প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল, তা থেকে খুকুদের শতহস্ত দূরে রাখতে চেয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে খুকুরা ছিল সংসারের বোঝাস্বরূপ, অনভিপ্রেত। তাই বাবা বা পিতৃস্থানীয় কারুর সঙ্গেই খুকুদের কোনো আন্তরিক যোগাযোগ তৈরি হত না। পারিবারিক কাঠামোও এই দূরত্ব তৈরিতে উৎসাহ যোগাতো। ফলত, মৌখিক ছড়ার যুগে পিতা-পুত্রী নৈকট্য বিষয়ে কোনো ছড়াই চোখে পড়ে না। কিন্তু যে সময় থেকে সচেতনভাবে ছড়া লিখিত হতে শুরু করে, তখন থেকে পিতৃসত্তা ও কন্যাসত্তার নৈকট্য বিষয় হিসেবে উঠে আসে। এই ধরনের ছড়ার সংখ্যা অনেক। এই সংকলনে রয়েছে এমন তিনটি ছড়া। একে একে আমরা বিশ্লেষণ করবো সেই ছড়াগুলি।

কৃষ্ণদয়াল বসুর 'আমি জানি আর খুকু জানে' ছড়াটি আগাগোড়া রোম্যান্টিক। আপাততুচ্ছ প্রাকৃতিক বিষয়, যার কার্য-কারণ অনুসন্ধান আদৌ প্রয়োজনীয় নয়, এমন বিচিত্র বিষয় উল্লেখ করে কবি কোনো এক আহ্লাদী পিতার মুখে বসান এই গর্বিত উক্তি—"আমি জানি আর খুকু জানে।"[৮৮] উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে একটি স্তবকের—"মেঘে মেঘে

লুকোচুরি খেলা/জেগে জেগে দেখি সারাবেলা/বাঁশিখানি কার বাজে প্রাণে/আমি জানি আর খুকু জানে"। একটি বালিকার অকারণ অনুসন্ধিৎসা প্রশ্রয় পায় পিতার উত্তরে। এইরকম সম্পর্কের বিন্যাস প্রথম যুগের ছড়াতে অপ্রাপ্য।

হুমায়ুন কবীরের লেখা 'মেঘনা' একটি ট্র্যাজিক কবিতা। 'মেঘনা' নদীতে জোয়ারের জল বাড়তে শুরু করলে পিতার অনুরোধে নদীর পাড় থেকে পোষা গরু আনতে যায় আমিনা। কিন্তু জোয়ার তাকে টেনে নিয়ে যায়, তার ঘরে ফেরা হয় না। লক্ষণীয়, আমিনা সংসারে কোণঠাসা নয়, তার উপর নির্ভরশীল তার পিতা-মাতা। আবার, তার না ফেরায় ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ বুঝিয়ে দেয় পরিবার আমিনা বিষয়ে দায়িত্বশীল ও চিন্তিত। শেষ স্তবকে নিরসন হয় সকল সন্দেহের— "দেখ্ দেখ্ দূরে মাঝ দরিয়ায়/কালো চুল যেন ঐ দেখা যায়/কাহার শাড়ীর আঁচল আভাস সহসা উঠিছে ভাসি?/ আমিনাকে মোর নিল কি টানিয়া মেঘনা সর্বনাশী?"[৮৯]। পিতা বা মাতা যিনিই এই কবিতার কথক হোন্ না কেন, বোঝা যায়, আমিনার আকস্মিক মৃত্যু তাঁদের শোকস্তব্ধ করে তুলবে। পিতা-মাতার সঙ্গে কন্যার যে শাশ্বত চিরকালীন সম্পর্ক একমাত্র সত্য, তার হাহাকারই যেন কবিতাটির মূল সুর হয়ে বাজতে থাকে।

প্রায় একই সুর ধরা পড়ে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের লেখা 'আদুরী' নামের ছড়াটিতে। কৃষককন্যা, 'দয়াবতী পশুপালিকা' আদুরী মায়ের অনুরোধে অজয় নদের বন্যার হাত থেকে তাদের হাঁসগুলিকে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিল—"হংস ধরিতে ঝাঁপায়ে পড়িল দুলালী/ পদ্মদীঘির যেন সে হংসমরালী।"[৯০] "বাপ মা তাহার কেঁদে খোঁজে গ্রাম ঘুরিয়া"—কিন্তু, আদুরীর আর ফেরা হয় না। আদুরীর মৃত্যু আসলে তার বাবা ও মায়ের তার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা তথা কন্যার সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্কের ট্র্যাজিক পরিণতি। কন্যার সঙ্গে এইধরনের বিচ্ছেদবেদনার ছবিও পূর্বে বিরল ছিল ছোটদের ছড়ার জগতে।

৭। মেয়েদের ‘নাম’ ও তাদের কবিতা –

মৌখিক ছড়ার সময় থেকেই মেয়েদের নিয়ে যে ছড়াগুলি তৈরি হয়েছিল, তাতে মেয়েদের নির্দেশ করা হয়েছিল ‘খুকু’ বা পুঁটু’ নামে। বোঝাই যায়, এইগুলি কোনো বিশেষ নাম নয়, সাধারণ ডাক-মাত্র। আধুনিক কালে এসে যখন মেয়েদের ছড়ার কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠতে দেখি, তখনও সেই পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে, এই সময় থেকেই (বিশ শতকের মাঝামাঝি) কোনো কোনো কবি এই প্রচলিত ভাবনা থেকে সরে এসে মেয়েদের বিশেষ নামে নামকরণ করে তাকে নিয়ে ছড়া লিখতে শুরু করলেন। ফলত, তৈরি হল নতুন ধারা। আমরা পেলাম ‘মিনু’, ‘পুপে’, ‘তুতুল’, ‘সোনা রায়’ বা ‘ঝুম্পা’ কে—তাদের কবিতাকে। আমাদের নির্বাচিত সংকলন গ্রন্থে আমরা এই ধরনের যে ছড়াগুলি পেয়েছি, সেগুলি দেখে নেওয়া যাক।

‘ছেলেভুলানো ছড়া’ বা ‘খুকুমণির ছড়া’ তে আমরা খোকা কে ঘুম পাড়ানোর নানারকমের ছড়া পেলেও খুকুকে ঘুম পাড়ানোর ছবি খুব কম দেখতে পেয়েছিলাম। এই সংকলনে রাজলক্ষ্মী দেবী লিখলেন খুকুর ঘুম-পাড়ানি ছড়া। ‘ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি’র বদলে তিনি ডাকলেন পরীদের—খুকুর ‘ঘুমেল চোখে’ ‘স্বপনের ডালি’ সাজানোর জন্য ও সারারাত জেগে ‘পাহারা’ দেওয়ার জন্য। রাজলক্ষ্মী দেবীর খুকু কি তবে রাজকন্যার সমতুল?—জাগে।

‘কিশোর কবিতা সংকলন’-এর তৃতীয় অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে এই সমস্ত ছড়াগুলি, যেগুলি বিশেষ ভাবে কোনো মেয়েদের নিয়ে রচিত। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘মিনুর ইচ্ছে’ দিয়েই এই পর্বের আলোচনা শুরু করে যেতে পারে। মিনুর ছোড়দা ছুটির দিনে ঘুড়ি ওড়ায়। মিনুর সে অবকাশ নেই। কিন্তু মিনুর ইচ্ছে আছে; এবং, সে ইচ্ছেটিও খানিকটা অন্যরকম। মিনু ঘুড়ি ওড়াতে চায় না, নিজেই ঘুড়ি হয়ে যেতে চায়—“আমগাছটার ওপর দিয়ে/ হল্‌দে বাড়ির ছাদ পেরিয়ে/ আকাশ--/আমার ইচ্ছে করে উড়ি।”[৯১] আকাশে পৌঁছে সে টেনে

আনতে চায় নীল তারাকে—তার খেলার সঙ্গী হিসেবে। এই ‘ইচ্ছে’ কি শুধুই স্বপ্নলোকের নির্মাণ? যুগ যুগ ধরে মেয়েরা যে অবরূদ্ধ থেকেছে, এই ‘ইচ্ছে’তে তার মুক্তির আভাস পায় পাঠক। একে ভর করেই মিনুরা আর বন্দী থাকতে চায় না, বিচরণ করতে চায় খোলা আকাশে। তাই আপাত-সাধারণ ছড়াটিকে অবরূদ্ধ নারীজাতির অবচেতনে লুকিয়ে থাকা মুক্তিচেতনার প্রতীক হিসেবে দেখা যেতে পারে।

বিশ্বনাথ দে’র ‘ইচ্ছে ছিলো’ ছড়াটির কথক পুপের অভিভাবক। তাঁর ইচ্ছেগুলি নিতান্ত পার্থিব, সাধারণ। পুপের জন্য পর্যায়ক্রমে তিনি পুষতে চেয়েছেন চন্দনা বা ময়না পাখি, লাল্চে বা খয়েরি পুষি, বা লোমওয়ালা বা ল্যাজতোলা কুকুরছানা। এই পুষ্যিদের কাজ হবে সকালবেলায় পুপের ‘সহজ পাঠ’ পড়ার সময় সঙ্গী হওয়া, দুপুরবেলায় ছবি রঙ করার সময় পাশে থাকা বা বিকেলে খেলার মাঠে বন্ধু হওয়া। লক্ষণীয়, পুপেকে যে কোনো প্রকারে ভালো রাখার চিন্তা ছড়িয়ে রয়েছে পুরো ছড়াটি জুড়ে। এই সময়পর্বের আগে মেয়ের ইচ্ছে বা পছন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া বা মেয়েদের ‘ভালো রাখা’র কোনো ইচ্ছে বা কৌশল পারিবারিক তরফেও খুব একটা দেখা যায়নি, যদিও এর কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

‘তুতুল’ কে নিয়ে শিবশম্ভু পালের লেখা ‘তুতুলের জন্য কবিতা’টিও একটু অন্যরকম কথা বলে। প্রথম স্তবকে তুতুলের যে নিষ্কলুষ শৈশব, তার বর্ণনা করেছেন কবি—“তোমার বিশ্বে শুধু ভাব আর ভাব/ তোমার দুচোখে নেই এতটুকু পাপ।”[৯২] দ্বিতীয় স্তবকে কবি নিজের বিগত দিনের প্রতিফলন লক্ষ করেছেন, আর এখানেই ছড়াটির বক্তব্য অনেকটাই প্রসারিত হয়ে গিয়েছে—“তুমিতো আমার কাজভোলানিয়া খেলা/ তুমি তো আমার সোনারং ছেলেবেলা”—এই ভাবনায় রয়েছে দুটি প্রান্ত—মেয়ের শৈশবে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করার স্মৃতি এবং সুদূর ভবিষ্যতে মেয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। তুতুলকে আদর করার মধ্যে কথক খুঁজে পেয়েছেন ‘মরণভোলা সুখ’। নিজের সন্তানের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করার অপার্থিব আনন্দের ইঙ্গিত রয়েছে এই ছড়াটিতে। এই ভাবনাতেই ছড়াটির উত্তরণ ঘটে যায়।

অভিরূপ সরকারের ‘ঘরের কাছে লঙ্কাজবা’ একটি স্মৃতিধর্মী কবিতা। কবিতার কেন্দ্রে রয়েছে ঝুম্পা। তার বিচরণক্ষেত্র যে ‘বর্তমান’-এ বিস্তৃত, তা একদিন ‘অতীত’-এ পরিণত হবে। কথক কল্পনা করেন, ঝুম্পা যখন “—খাতা হাতে/ একলা রাস্তা পার হয়ে তার নতুন স্কুলে যাবে,”[৯৩] তখনো তার স্মৃতি জুড়ে থাকবে পুকুরের কালো জল, ‘সিঁড়ির পাশে ঘর’, ‘ঘরের পাশে লঙ্কাজবা’। এই স্মৃতি তো আসলে ঝুম্পার শৈশব—যা হারিয়ে গিয়েও ফিরে ফিরে আসে। এ এক নিরন্তর পথচলা।

বিভিন্ন সময়ে রচিত বা সংগৃহীত উক্ত ছড়াগুলিতে মেয়েদের শৈশব ও কৈশোরের বিচিত্র ধরন লক্ষ করা গিয়েছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে এই ‘মেয়েবেলা’র রূপ পরিবর্তিত হতে থেকেছে, সেভাবেই তা ধরা পড়েছে বিভিন্ন ছড়াকারদের ভাবনায়। তবু সংখ্যাগত বিচারে ছেলেদের নিয়ে লেখা ছোটদের ছড়া তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি। এই পর্যায়ে এসে মেয়েদের নিয়ে ছড়ার পৃথিবী আরো বিস্তৃত হতে পারে কিনা, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

তথ্যসূত্র ::

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ছেলেভুলানো ছড়া", 'লোকসাহিত্য', রবীন্দ্র রচনাবলী: দ্বিতীয়খণ্ড (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬৬

২। তদেব, পৃ. ৬৬৭

৩। তদেব, পৃ. ৬৮৯

৪। তদেব,পৃ. ৬৮৯

৫। তদেব, পৃ. ৬৬৮

৬। তদেব, পৃ. ৬৮২

৭। তদেব, পৃ. ৬৮৩

৮। তদেব, পৃ. ৬৯৫

৯। তদেব, পৃ. ৬৭০

১০। তদেব, পৃ. ৬৭৮

১১। তদেব, পৃ. ৬৮৫

১২। তদেব, পৃ. ৬৮৪

১৩। তদেব, পৃ. ৬৮১

১৪। তদেব, পৃ. ৬৭১

১৫। তদেব, পৃ. ৬৭৩

১৬। তদেব, পৃ. ৬৯২

১৭। তদেব, পৃ. ৬৭৫

১৮। তদেব, পৃ. ৬৭৬

১৯। তদেব, পৃ. ৭০৩

২০। তদেব, পৃ. ৭২০

২১। তদেব, পৃ. ৭০২

২২। নবেন্দু সেন, 'বাংলা শিশুসাহিত্য তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ', কলকাতা, পুথিপত্র, ২০০০, পৃ. ৭০

২৩। তদেব, পৃ. ৭৭

২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিশু', রবীন্দ্র রচনাবলী: দ্বিতীয়খণ্ড (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), কলকাতা, পশ্চিম সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২

২৫। তদেব, পৃ. ৫০-৫১

২৬। তদেব, পৃ. ৫১

২৭। তদেব, পৃ. ৬০

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "এক যে ছিল বাঘ", বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ছোটদের রবীন্দ্রনাথ', কলকাতা, সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ৫৪-৫৫

২৯। তদেব, পৃ. ৫৪-৫৫

৩০। শঙ্খ ঘোষ, "শিশু", 'দেখার দৃষ্টি', কলকাতা, তালপাতা, ২০১৪, পৃ. ১১২

৩১। তদেব, পৃ. ১১৪

৩২। তদেব, পৃ. ১১৫

৩৩। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ: শিশুসাহিত্য', কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০০, পৃ. ৭১

৩৪। শঙ্খ ঘোষ, "সে", 'দেখার দৃষ্টি', কলকাতা, তালপাতা, ২০১৪, পৃ. ৯৮

৩৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রাজরানী", 'গল্পসল্প', "রবীন্দ্র-রচনাবলী', খণ্ড ২৬, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩২৪-৩২৫

৩৬। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ: শিশুসাহিত্য', কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০০,পৃ. ১০০

৩৭। কিরণকুমার রায়, "শিশু-সুহৃদ যোগীন্দ্রনাথ", শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণী', কলিকাতা, যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি, ১৯৫৪, পৃ. ৪৭

৩৮। তদেব, পৃ. ৫

৩৯। রঞ্জিতা কুণ্ডু, "যোগীন্দ্রনাথ সরকার", শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণী', কলিকাতা, যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি, ১৯৫৪, পৃ. ৩৯

৪০। শঙ্কর মিত্র, "শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার", শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণী', কলিকাতা, যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি, ১৯৫৪, পৃ. ৯৫

৪১। রঞ্জিতা কুণ্ডু, "যোগীন্দ্রনাথ সরকার", শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণী', কলিকাতা, যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি, ১৯৫৪, পৃ. ১৩৮

৪২। তদেব, পৃ. ১৪৪

৪৩ তদেব, পৃ. ১৪৬

৪৪। তদেব, পৃ. ১৪৭

৪৫। তদেব, পৃ. ১৪৮

৪৬। তদেব, পৃ. ১৫০

৪৭। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, "ছবির বই", 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী', কলকাতা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৩, পৃ. ৪

৪৮। তদেব, পৃ. ৬

৪৯। তদেব, পৃ. ১১

৫০। তদেব, পৃ. ১২

৫১। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, "রাঙা ছবি", 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী', কলকাতা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৩, পৃ. ৫

৫২। তদেব, পৃ. ৬

৫৩। নবেন্দু সেন, "যোগীন্দ্রনাথ সরকার", শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণী', কলিকাতা, যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি, ১৯৫৪, পৃ. ৫৪

৫৪। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, "রাঙা ছবি", 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী', কলকাতা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৩, পৃ. ১১

৫৫। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, "হাসি ও খেলা", 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী', কলকাতা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৩, পৃ. ৫

৫৬। তদেব, পৃ. ৭

৫৭। তদেব, পৃ. ১৮

৫৮। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, "খেলার গান", 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী', কলকাতা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৩, পৃ. ৫-৭

৫৯। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা, 'মনুসংহিতা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ. ১৬২

৬০। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, "খেলার সাথী", 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী', কলকাতা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৩, পৃ. ৩

৬১। কালিদাস ভদ্র সম্পাদিত, 'প্রসঙ্গ অন্নদাশঙ্কর', কলকাতা, রেসন্‌স, ২০০০

৬২। অন্নদাশঙ্কর রায়, 'ছড়া সমগ্র', কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৩, পৃ. ৪১

৬৩। তদেব, পৃ. ৫০-৫১

৬৪। তদেব, পৃ. ৭০

৬৫। তদেব, পৃ. ৭২

৬৬। তদেব, পৃ. ৮৫

৬৭। তদেব, পৃ. ১৩৩

৬৮। তদেব, পৃ. ১৩৪

৬৯। তদেব, পৃ. ১৭৮-১৭৯

৭০। তদেব, পৃ. ১৯০

৭১। প্রণব চট্টোপাধ্যায়, “ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর”, কালিদাস ভদ্র সম্পাদিত, ‘প্রসঙ্গ অন্নদাশঙ্কর’, কলকাতা, রেসনস, ২০০০, পৃ. ১৬৫

৭২। তদেব, পৃ. ১৬৭

৭৩। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সরল দে ও এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ সম্পাদিত, ‘পাঁচশ বছরের কিশোর কবিতা (প্রথম অধ্যায়)’, কলকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৩৫

৭৪। তদেব, পৃ. ৪৭

৭৫। তদেব, পৃ. ৫৪

৭৬। তদেব, পৃ. ৮৩

৭৭। তদেব, পৃ. ৬৮

৭৮। তদেব, পৃ. ১০৪

৭৯। তদেব, পৃ. ১১৪

৮০। তদেব, পৃ. ১৫৬

৮১। তদেব, পৃ. ২২৫

৮২। তদেব, পৃ. ৯৫

৮৩। তদেব, পৃ. ১৫০

৮৪। তদেব, পৃ. ১১৮

৮৫। তদেব, পৃ. ৮৬

৮৬। তদেব, পৃ. ১৬১

৮৭। তদেব, পৃ. ১৯৫

৮৮। তদেব, পৃ. ৯১

৮৯। তদেব, পৃ. ১১৩

৯০। তদেব, পৃ. ৭০

৯১। তদেব, পৃ. ১৭১

৯২। তদেব, পৃ. ১৮৪

৯৩। তদেব, পৃ. ২২৩

চতুর্থ অধ্যায়

‘রূপকথা’য় মেয়েদের কথা

বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা হল রূপকথা। প্রাথমিকভাবে একে অবশ্য লোকসাহিত্যের অন্তর্গত করেই দেখা হয়েছে। 'বাংলা লোকসাহিত্যের বিশ্বকোষ'-এ এই সংরূপটির পরিচয় 'সমৃদ্ধতর লোককথা'[১] হিসেবে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত অনুযায়ী, এটি 'লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম বিষয়'[২]। পল্লব সেনগুপ্তের মতে লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানে 'টেল'-এর অন্তর্গত হল রূপকথা। যদিও, ইংরেজি 'ফেয়ারি টেল' আর বাংলা রূপকথা সমগোত্রীয় নয়[৩]। বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত রূপকথাগুলির রচনাকাল আমাদের অজানা। মৌখিক পরম্পরা বাহিত এই রূপকথাসমূহ আমরা বই আকারে হাতে পেয়েছি শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের উদ্যোগে। তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রূপকথা সংগ্রহ ও সংকলন করে প্রকাশ করেন 'ঠাকুমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' নামে যথাক্রমে ১৩৮৪ ও ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে। এর কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত হয়েছে রেভারেন্ড লালবিহারী দে রচিত 'ফোক টেইলস অফ বেঙ্গল', সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর 'হিন্দুস্থানী উপকথা' ইত্যাদি। তবে একথা সর্বজনবিদিত যে, বাঙালি শিশুর রূপকথার সঙ্গে পরিচয় দক্ষিণারঞ্জনের হাত ধরেই।

রূপকথাগুলি কোনো একজন ব্যক্তির লিখিত 'text' না হওয়ায় এবং মৌখিক পরম্পরায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে দীর্ঘদিন ধরে বাহিত হওয়ায় তার রূপ বহুবার পরিবর্তিত হতে থাকে। তবু প্রাপ্ত লেখাগুলি পাশাপাশি সাজালে একটি নির্দিষ্ট 'ছক' বা 'ধরন' তৈরি হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "বিষয় ও পরিবেশের মধ্যে ইহাতে খুব বেশি বৈচিত্র্য নাই"[৪]। কি থাকে রূপকথায়?

১। রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যা, রাক্ষস-দৈত্য-পরী-ডাইনি ইত্যাদি চরিত্র অবলম্বনে বাস্তবপ্রতিম কল্পলোক নির্মাণ-প্রকল্প

২। এই বহিঃসৌধের আড়ালে মানুষের প্রত্যাশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন পূরণের প্রচেষ্টা।

৩। অলৌকিকত্ব, দৈববাণী, নিয়তি ইত্যাদির বহুল প্রয়োগ।

৪। মিলনান্তিক কাহিনি নির্মাণ।

রূপকথা যখন শিশুমনোরঞ্জনকারী লেখা, তখন তার পাঠ শিশুমনের চাহিদা অনুযায়ী হওয়াই কাম্য। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক এর অপরাপর পাঠগুলি। রূপকথা প্রাথমিক বিচারে লোককথার একটি সংরূপ। সেক্ষেত্রে লোককথার সমালোচকেরা রূপকথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি ও ইতিহাসের যোগসূত্র সন্ধান করতে চেয়েছেন। 'রূপকথা' এই শব্দটির সঙ্গে 'রূপক'-এর শাব্দিক যোগ বলে দেয় রূপকথার আপাত-বর্ণিত কাহিনির আড়ালে রয়ে গেছে অন্য কোনো কাহিনি। এগুলির ব্যাখ্যা করার জন্য সমালোচকেরা ব্যবহার করছেন 'type-motif index'। মূলকথা হল, সমালোচকেরা সবসময়েই দেখাতে চেয়েছেন এ, রূপকথা শিশুমনের আস্বাদই শুধু নয়, তার পরতে পরতে রয়েছে প্রাপ্তমনস্কের বৌদ্ধিক চর্চার খোরাক।

আমরা এই গবেষণায় রূপকথাকে দেখতে চাইব শিশুসাহিত্য হিসেবে। কিন্তু এই কাহিনিগুলি থেকে যে প্রশ্ন তৈরি হবে, তার উত্তর পেতে আমাদের প্রবেশ করতেই হবে পরিণত মানসলোকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে 'গল্প বলো'; সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপকথাই সে বটে, তাতে না থাকতে পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যক সংবাদ, সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনো কৈফিয়ৎ নেই। সে কোনো একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা দূর করে; সে বাস্তব"।[৫] আমরাও মানবমনে দীর্ঘদিন ধরে লালিত, সঞ্চিত 'গল্প' থেকে প্রাপ্ত 'রূপ' অবলম্বন করে কোনো এক সমান্তরাল 'বাস্তব'কে খুঁজে নিতে চাইব আমাদের গবেষণায়। কারণ আমাদের মূল উপজীব্য, বাংলা রূপকথায় মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপ চিহ্নিত করা।

রূপকথা লোকসাহিত্য বা শিশুসাহিত্য, এর প্রাথমিক যোগ কিন্তু নিঃসন্দেহে মেয়েদের সঙ্গে। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভূখণ্ডের অগণিত নাম-না-জানা দিদিমা, ঠাকুমা, মা, মাসি, পিসির প্রতিদিনের সঙ্গী এই রূপকথা। এর কথক, অন্য প্রান্তে উৎসুক শ্রোতা হল অজস্র শিশু। অতি

সহজেই এই শ্রোতাকুল নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে অভ্যস্ত ছিল রূপকথায় বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে। এরকম সরলীকৃত পাঠে স্বচ্ছন্দ ছিলাম আমরাও, যারা রূপকথার খুব পরিচিত পাঠক। বহুবার শোনা ও পড়ার ফলে আমাদের বা শিশুদের মনেও নিজেদের মত করে রূপকথার একটি বিন্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এখানে দেখা গেল রূপকথা আসলে কোনো রাজপুত্রের অভিযান-কাহিনি, যার কেন্দ্রে আছে কোনো এক অবলা নারী, যাকে উদ্ধার করার জন্যই রাজপুত্রের নানারকম বাধা-বিপত্তির সঙ্গে লড়াই ও অবশেষে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব লাভ। লক্ষণীয়, শিশুমনে এই কাহিনির মধ্য দিয়ে সকলের অজান্তেই প্রবেশ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গ-বৈষম্যের ছবি। সেই সময় থেকেই সচেতন পাঠকের কাছে রূপকথা শিশুসাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে পরিণত চেতনার বিশ্লেষণ দাবি করে। শুরু হয় রূপকথার বিকল্প-পাঠ সন্ধান।

আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার নারীবাদী আঙ্গিক থেকেই বিষয়টি ভাবা যেতে পারে। আলোচনা শুরু করা যাক দক্ষিণারঞ্জনের লেখা দিয়েই।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

রূপকথার নির্মাণ একটি অবিরাম প্রক্রিয়া। তা কখনো সমাজে লোকমুখে নির্মিত হয়, কখনো আবার ব্যক্তিবিশেষ নিজস্ব তাগিদে রূপকথা নির্মাণ করে থাকেন। বর্তমান আলোচনায় আমরা সংগৃহীত-সংকলিত রূপকথাকে 'আদি' বা 'প্রাচীন রূপকথা' এবং রচিত-লিখিত রূপকথাকে 'রূপকথাধর্মী লেখা' বলে নির্দেশ করব।

প্রাচীন রূপকথা বস্তুত সামূহিক-নির্জ্ঞান-নির্ভর। বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র স্তরের মানুষের ভাবনার বা জ্ঞানের প্রক্ষেপণ প্রাচীন রূপকথায় লক্ষণীয়। তাই একাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্প একটির সঙ্গে আরেকটি সংযুক্ত হতে হতে গড়ে ওঠে এক অখণ্ড গল্প। তাই রূপকথা 'পড়া' প্রসঙ্গেও ক্রিয়াশীল থাকে এক দ্বি-কালিক বোধ — Diachronic Reading এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

একদিকে থাকে এর নির্মাণ-কাল, অন্যদিকে সংগ্রহ তথা প্রকাশ-কাল। সুতরাং, আপাতমধুর রূপকথা প্রকৃতপক্ষে এক জটিল নির্মাণ, একথা অনস্বীকার্য।

বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকেই আমরা পরপর একাধিক লেখককে পাই, যাঁরা অন্যান্য সৃজনশীল লেখার পাশাপাশি বঙ্গদেশে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রূপকথা-উপকথা সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মনোমোহন সেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের পরবর্তী দশকে আমরা পাব বিনোদিনী দেবী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুখলতা রাও, শিবরতন মিত্র, সত্যচরণ চক্রবর্তী প্রমুখ লেককেকে যাঁরা পূর্বতন লেখকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, যদিও এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন ব্যতিক্রমী লেখক।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্তৃক সংকলিত 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন, "ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরি হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের 'Fairy Tales' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে 'দেউলে'।... কোথায় গেল — রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, কোথায় — সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মানিক!"[৬] রবীন্দ্রনাথের এই আশঙ্কা নিতান্ত ব্যক্তিগত ছিল না মোটেই। ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্থ ভারতবর্ষ তথা বাঙালি তখন আত্মবিস্মৃত। নিজগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদে সেই সময় একটা ঢেউ উঠেছিল দিশি সাহিত্য-সংস্কৃতি সন্ধানের মধ্যে দিয়েই স্বদেশীয়ানা প্রতিষ্ঠা পাবে, বাঙালির হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্য সুরক্ষিত হবে — এই ছিল বিশ্বাস। দক্ষিণারঞ্জনের এই উদ্যোগকে রবীন্দ্রনাথ সাধুবাদ জানিয়েছিলেন মূলত এই কারণেই — হারিয়ে যাওয়ার 'দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা'[৭]

জনমানসে প্রচার করার জন্যেই। শুধু দক্ষিণারঞ্জন নন, লালবিহারী দে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সীতা দেবী, শান্তাদেবী সকলেই বাংলার উপকথা বা রূপকথা সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন প্রাথমিকভাবে এই জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণাতেই। এর মধ্যে অবশ্যই যুক্ত ছিল রোমান্টিক অনুষঙ্গ। সাহিতের উপাদান হিসেবে যা নেহাৎ নগণ্য, আপাত-তুচ্ছ সেইসব বিষয়কে সাহিত্যে পদবাচ্য করে তোলার আগ্রহ। তাই সংগৃহীত রূপকথাগুলি যখন সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হল, তখন তাতে ধরা পড়ল বহুবিধ মাত্রা।

রূপকথা প্রথম প্রয়োগ করা হল শিশুদের উপর। আপাত আজগুবি কাহিনি, রোমান্টিক আবহ শিশুমনস্তরে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল হল। উপরন্তু, রূপকথায় ধরা পরল এমন এক 'Time-Frame' এবং এমন এক 'setting', যা কিছুতেই 'বর্তমান'কে স্পর্শ করে না। ফলত, শিশু বা পূর্ণবয়স্ক, প্রত্যেকের কাছেই রূপকথা হয়ে উঠল এক আরাম-উপভোগ ক্ষেত্র। এর পাশাপাশি রূপকথায় নৈতিকতার প্রক্ষেপ লক্ষ করা গেল – মূলত চরিত্র নির্মাণের সময়। এই আদর্শ, নীতিবোধ অবশয ব্যক্তিমানস বা কোনো বিশেষ সময়/সমাজ প্রসূত নয় – এক সামূহিক চেতনা। এই নৈতিকতার মানদণ্ডেই প্রাচীন রূপকথাগুলি ধরা পড়েছিল রাষ্ট্র, সমাজ-ব্যবস্থা, পরিবার-সংগঠন, নারী-পুরুষ চরিত্রের বিশেষ ছাঁদ। যেহেতু শিশুই ছিল আদি রূপকথার উদ্দিষ্ট পাঠক, সেহেতু নীতিশিক্ষার প্রথম পাঠ শিশুরা পেতে থাকল রূপকথার মাধ্যমে। তবে একই সঙ্গে রূপকথায় উঠে এলো এমন অনেক বিষয়, যা সরাসরি শিশু-উপভোগ্য নয়।

রূপকথার দ্বিতীয় পর্ব, যাকে আমরা 'রূপকথাধর্মী লেখা' বলতে চাইছি, তার চর্চা শুরু হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে। এঁদের মধ্যে যাদের লেখা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, তাঁরা হলেন হেমন্তবালা দেবী, অখিল নিয়োগী, বিমল সেন, ইন্দিরা দেবী, গৌরী ধর্মপাল, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ। এঁরা নিজেরাই রূপকথা লিখলেন, সংগ্রহ বা সংকলন করলেন না। নির্মাণের উদ্দেশ্য ও নির্মাণ কৌশল – দুটিরই পরিবর্তন ঘটল। রূপকথাধর্মী লেখার সূত্রপাত হল যখন, তখন পরাধীন বাঙালির আত্মবিস্মৃতির পর্ব ঘুচে গিয়ে নতুন আত্মপরিচিতি প্রতিষ্ঠার তাগিদ

দেখা দিয়েছে। কালক্রমে সেই সময় পেরিয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার আনন্দ, আশা, মোহ, মোহমুক্তি – সবই পেরিয়েছে। তৈরি হয়েছে নতুন নতুন সমস্যা ও সংকট। আমাদের ধারণা, এই দ্বিতীয় পর্বের বিস্তার প্রথম পর্বের তুলনায় দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময়। এই কারণে নৈতিকতার মানদণ্ড ও একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলত, পূর্বের রচনার মতো এই লেখাগুলিতে দেশ-সমাজ-চরিত্রের একটি বিশেষ 'Pattern' আর চোখে পড়ে না।

রূপকথা যখনই ব্যক্তিবিশেষের নির্মাণ হবে, তখনই ব্যক্তি-লেখকের চাহিদা, জীবনদর্শন, তাঁর যাপিত সময়কাল, তাঁর দেখা সমাজের প্রভাব পড়বে সেই লেখায়। রূপকথার শোধন শুরু হবে তখনই। 'রূপ' ও 'কথা' তখন 'রূপক'-এর আশ্রয় নেবে। ব্যক্তিবিশেষের wishful thinking এক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। রূপকথা যেখানে ছিল সামূহিক-নির্মিতি, তা হয়ে উঠবে একক-নির্মিতি। 'রূপকথা' থেকে 'রূপকথাধর্মী লেখা' – এই পারিভাষিক পরিবর্তন একারণেই। সুতরাং, এই লেখাগুলি শিশুপাঠ্য হয়েও আরও বেশি বিশ্লেষণের দাবি জানায়। সম্ভাবনা তৈরি হয় নানাবিধ পাঠ-প্রবণতার।

রূপকথার সবকটি আঙ্গিক একটি আলোচনায় সীমায়িত করা কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়। তাই আমরা নির্বাচন করেছি একটি বিশেষ দিক – রূপকথা ও রূপকথাধর্মী লেখায় মেয়েদের (মেয়ে চরিত্র) অবস্থানকে। আমরা সচেতনভাবেই 'নারী' শব্দটি ব্যবহার করছি না এক্ষেত্রে। কারণ 'নারী' শব্দের বিস্তৃতি ব্যাপক – সব ধরনের নারীচরিত্র আমরা আলোচনায় আনব না। যেহেতু আমরা 'মেয়েবেলা'-কে বিশ্লেষণ করতে চাইছি ছোটোদের লেখায়, সেহেতু আমরা মূলত কথা বলব কিশোরী হয়ে ওঠা মেয়েদের নিয়ে।

আলোচনা শুরু করা যায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে নিয়েই। তাঁর 'ঠাকুমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' গ্রন্থাকারে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে। এর আগে অবশ্য ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে রেভারেন্ড লালবিহারী

দে’র রচিত ‘Folk Tales of Bengal’ গ্রন্থটি। এর আরও অনেক পরে, প্রকাশিত হবে শান্তা দেবী ও সীতা দেবী রচিত ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘হিন্দুস্থানী উপকথা’ বইটি। তবে আমাদের প্রাথমিক আলোচনা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের বই দুটিকে কেন্দ্র করে। কথাপ্রসঙ্গে উঠে আসবে উপকথাধর্মী বইগুলি। রূপকথাধর্মী লেখালেখির বিশ্লেষণ-ও পরে প্রসঙ্গত আলোচিত হবে।

‘রূপকথা’ মূলত কোনো এক রাজপুত্রের অভিযানের গল্প। নানাবিধ সমস্যা পেরিয়ে সে পৌঁছে যায় তার অভীষ্ট লক্ষ্যে। রাক্ষস-খোক্কসদের ভয়াবহ মায়াজাল কেটে উদ্ধার করে আনে বন্দিনী রাজকন্যাকে এবং তারপর তারা ‘যুগ যুগ ধরে সুখে রাজত্ব’ করতে থাকে। দেশকালের সীমানা পেরিয়ে প্রায় সমস্ত রূপকথাই এই দকই ছকে বাঁধা।এই পুরো গল্প জুড়ে রাজকন্যার অস্তিত্ব নেহাৎ অল্প পরিসরে। তাই, সেই সীমাবদ্ধতা থেকে আমাদের অভীষ্ট ‘মেয়েবেলা’র নির্মাণ বেশ কিছুটা সমস্যাজনক।

আগেই বলা হয়েছে ‘মেয়েবেলা’ বলতে বোঝানো হচ্ছে বাল্য-অতিক্রান্ত সদ্য কিশোর দশাপ্রাপ্ত মেয়েদের একটি বিশেষ অবস্থাকে। ‘রূপকথা’য় কিন্তু রাজকন্যাদের বয়স ঠিক কত, তা একেবারেই স্পষ্ট নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা বিবাহযোগ্যা হওয়ায় বয়সজনিত ভ্রান্তিও তৈরি হয়ে থাকে। তাই, এই অধ্যায়ে বিশেষত, লেখাগুলি ‘রূপকথা’ বলে রাজকন্যার বয়স-সংক্রান্ত তর্ক সচেতনভাবেই সরিয়ে রাখা হল।

আলোচনা শুরু করা যেতে পারে ‘ঠাকুমার ঝুলি’র কন্যাদের দিয়ে। তারু আগে একবার দেখে নেওয়া যাক উৎসর্গপত্রে শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রূপকথা-কথক ‘ঠাকুরমা’র মুখে ঠিক কি বুলি বসিয়েছেন — ঠাকুরমা ঝুলি খুলতে খুলতে ডেকেছেন — “ঠাকুরমা’র বুকের মাণিক, আদরের ‘খোকাখুকি’।/ চাঁদমুখে হেসে, নেচে নেচে এসে, কুলির মাঝে দে উঁকি।” ‘সুশীল, সুবোধ, চারু, হারু, বিনু, লীলা শশি সুকুমারি’দের সঙ্গেই জমে উঠেছে ঠাকুরমার

আসর। 'বড় বৌ', 'ছোট বৌ', 'নতুন বৌ'-ও সেই আসরের অন্যতম সদস্য। কিন্তু এই উৎসর্গপত্রের শেষ ভাবে ঠাকুরমার 'খোকন'-এর প্রতি একরকম পক্ষপাত লক্ষ করা যায়— "গাছের আগায় চিক্‌মিক্/ আমার খোকন হাসে ফিক্‌ফিক্"; আবার, "নাচবে খোকা, নিবে প্রসাদ/ খোকন আমার গঙ্গাপ্রসাদ—/ কোন্ স্বর্গের ছবি খোকার মর্ত্যে এনেছে?"[৮] এই দীর্ঘ ছড়াটির শেষ স্তবকটি পুরোটাই খোকা-কেন্দ্রিক — এমনকি, ঠাকুমার কোল জুড়ে আলো করে থাকা মানুষটিও ছোট্ট খোকন — খুকি সেখানে ব্রাত্য।

হয়তো এমনটাই সমাজনির্দিষ্ট বিধি, যেখানে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। আর সেইজন্যই রূপকথার উদ্দিষ্ট পাঠকশ্রেণির মধ্যেও খোকনদের প্রাধান্য — এ যেন তাদেরই গল্প।

'বাঙ্গালার রূপকথা' মূলত চারটি অংশে বিভক্ত — 'দুধের সাগর', 'রূপতরাসী', 'চ্যাং-ব্যাং' ও 'আম-সন্দেশ'-এর মধ্যে 'দুধের সাগর' ও 'রূপতরাসী'-ই রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের গল্প। তাই আলোচনা শুরু করা হোক 'দুধের সাগর' অংশের প্রথম কাহিনি — 'কলাবতী রাজকন্যা' দিয়ে। এই গল্পের মূল চরিত্র — দুই রাজপুত্র — বুধকুমার ও রূপকুমার, গল্পের শুরুতেই যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় বুদ্ধু ও ভুতুম নামে একটি বাঁদর ও একটি প্যাঁচা হিসেবে। রাজার বাকি রাজপুত্রদের ষড়যন্ত্রে এদের জীবন প্রাপ্তি, নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে 'কলাবতী রাজকন্যা' লাভ — এই হল গল্পেরর মূল বিষয়বস্তু। কেন্দ্রে রয়েছে কলাবতী রাজকন্যা — যার আগমন 'রূপার বৈঠা, হীরার হালে সজ্জিত 'শুকপঙ্খী নৌকা'য়। 'কুঁচ-বরণ কন্যা' কলাবতীর 'মেঘ-বরণ চুল'। রাণিরা তাকে পুত্রবধূ হিসেবে পেতে চাইলে সে সরাসরি ঘোষনা করে—

"কলাবতী রাজকন্যা মেঘ-বরণ কেশ।।
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ।
আনতে পারে মতির ফুল ঢোল ডাগর।।
সে পুত্রের বাঁদী হয়ে আসব তোমার ঘর।। "[৯]

এই ঘোষণার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় রাজকন্যা বীর্যশুল্কা। সে তার বিবাহের জন্য পুরুষের ক্ষমতা যাচাই করে দেখতে চায়। কিন্তু এহেন স্বাধীনচেতা মেয়ে হয়েও সে পুত্রের ঘরণী নয়, 'বাঁদী' হয়ে থাকতে চায়। শব্দটি নিঃসন্দেহে নারীর সামাজিক অবস্থানটিকে সূচিত করে — যা প্রাক্-বিবাহ পর্ব থেকেই মেয়েদের চিন্তনক্ষেত্রে একটি স্থায়ী জায়গা করে নেয়।

রাজকন্যার খোঁপায় মোতির ফুল তুলে নেয় বানর বুদ্ধু; বাধ্য হয় কলাবতী স্বীকার করতে তাকে স্বামী হিসেবে, পূর্বকৃত শর্ত-মোতাবেক। বুদ্ধু যখন জিজ্ঞেস করে, "রাজকন্যা, এখন তুমি কার?" কলাবতীকে বলতে শোনা যায়, "আগে ছিলাম বাপ মায়ের, তারপরে ছিলাম আমার, এখন তোমার।" এমনকি, কলাবতী এখন 'বাঁদী' হতে বদ্ধপরিকর, "এখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।"[১০] এভাবেই আসলে তৈরি হয় মেয়েদের শৈশব-কৈশোর। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, "পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।/রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"[১১] , অর্থাৎ, স্ত্রীলোককে কুমারী জীবনে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবেন। স্ত্রীলোক স্বাধীনতার অযোগ্য। প্রথম থেকেই তাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় সম্পত্তি হিসেবে — প্রথম জীবনে পিতার, শেষ জীবনে স্বামীর। এর মধ্যে একফালি অংশে শুধু অধিকার তার নিজস্ব, যেখানে সে বুনে চলে নিজের স্বপ্নজগৎ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এই দর্শনে ধ্বংস হতে থাকে 'মেয়েবেলা' —স্বেচ্ছাবিহারিণী নারীর 'স্বাধীন' জীবন নিমেষেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। 'ঠাকুমার ঝুলি'র কথক যেহেতু সমাজের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মা-দিদিমা-ঠাকুমারা, সেহেতু, তাঁদের বয়ানেও ধ্বনিত হয় পুরুষতন্ত্রেরই স্বর।

এর পরের কাহিনি অংশে কলাবতীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। তাকে কেন্দ্র করে বুদ্ধু-ভুতুমের সঙ্গে পাঁচ রাজপুত্রের সংগ্রাম ও শেষ পর্যন্ত রূপকথার নিয়ম অনুযায়ী কলাবতীর সুখে-শান্তিতে দিনযাপন চিত্র — যেন বীর্যশুল্কা রমণিরও এমনটাই ভবিতব্য; বিস্মিত হয়ে যাই তখন, যখন কলাবতীকেও এইরকম সুখই কামনা করতে দেখি। দাপুটে কলাবতীর মেয়েবেলাটি পরিণতি পায় সংসার সুখে।

‘ঘুমন্ত পুরী’ গল্পের রাজকন্যার সামগ্রিক বর্ণনা নিতান্ত সামান্য — রাজপুত্রের কামনাময় দৃষ্টিতে ধরা পড়ে শুধু তার রূপটুকু — “ফুলের বনে সোনার খাট, সোনার খাটে হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা দোলান রহিয়াছে; সেই মালার নীচে, হীরার নালে সোনার পদ্ম, সোনার পদ্মে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বিভোর হয়ে ঘুমাইতেছেন। ঘুমন্ত রাজকন্যার হাত দেখা যায় না, পা দেখা যায় না, কেবল চাঁদের কিরণ মুখখানি সোনার পদ্মের সোনার পাঁপড়ির মধ্যে টুলটুল করিতেছে।”[১২] এখানে রাজপুত্র খুব স্বাভাবিকভাবেই ‘সোনার কাটি-রূপোর কাটি’র স্থান পরিবর্তন করতেই ঘুমন্ত পুরী বহুদিনের ঘুমঘোর কাটিয়ে জেগে ওঠে, দৈত্যের জাদু থেকে রক্ষা পায় রাজ্য। এমনটাই তো ঘটে থাকে। গল্পের শেষে নটে গাছ মুড়িয়ে যায়। কিন্তু শেষে রাজার বক্তব্য আবার পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। রাজপুত্রের কৃতকর্মে খুশি হয়ে রাজা বলেন, “আমার কি আছে, কি দিব? এই রাজকন্যা তোমার হাতে দিলাম, এই রাজত্ব তোমাকে দিলাম।”[১৩] রাজকন্যার মতামত গ্রহণ সেখানে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয়। বাৎসায়নের ‘কামশাস্ত্রে’ দুবার উচ্চারিত হয়েছে, “তস্যাঃ পণ্যসধর্ম্বতাৎ’ অর্থাৎ, ‘সে নারী পণ্য জাতীয়’[১৪]। বোঝা যায়, রূপকথার রূপসী রাজকন্যার অস্তিত্বও ‘পণ্যে’ পর্যবসিত। মেয়ের বিবাহ দানে রাজার কার্পণ্য নেই — কিন্তু সেই উৎসব যেন শুধু রাজ-আড়ম্বরকেই সূচিত করে। ‘মেয়েবেলা’র পণ্যায়নের আয়োজন চলতে থাকে — হোক্ না রূপকথা — মানবমনের অবচেতনে থাকা পুরুষতান্ত্রিক ধারণাটি রূপ লাভ করে কথার মোড়কে।

‘কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা’ কাহিনিটির কেন্দ্রীয় চরিত্র দুটি মেয়ে — উপজীব্য, এদের পারস্পরিক ঈর্ষাকাতরতা ও তজ্জনিত যাবতীয় সমস্যা ও তার সমাধান প্রকল্প। কাঞ্চনমালা রাজার রানী হলে কাঁকনমালা ঈর্ষান্বিতা হয়ে পড়ে ও জাদুবলে কাঞ্চনমালাকে ‘বাঁদী’তে পরিণত করে নিজে রানী হয়ে বসে। এরপর, নানাবিধ সমস্যার স্তর পেরিয়ে কাঞ্চনমালা পূর্বাবস্থা ফিরে পায় ও কাঁকনমালার শাস্তি হয়।

উক্ত কাহিনির বিষয়টি সামান্য হলেও তা বিস্তৃত করার সময় কাঞ্চনমালার পক্ষে কথক একাধিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যেমন — পিঠি-পুলি তৈরির ঘটনা; যেখানে রানী হয়ে ওঠা কাঁকনমালা তৈরি করে 'আস্কে পিঠা, চাস্কে পিঠা, আর ঘাস্কে পিঠা', সেখানে দাসীরূপী কাঞ্চনমালা করেন 'চন্দ্রপুলী, মোহনবাঁশী, ক্ষীরমুরলী, চন্দনপাতা'র মতো নানা লোভনীয় 'পিঠা'। আবার বলা হয় আলপনা দেওয়ার প্রসঙ্গ, যেখানে কাঁকনমালা "একমন চাল বাটিয়া সাত কলস জলে গুলিয়া এ-ই এক গোছা শনের নুড়ি ডুবাইয়া, সারা আঙ্গিনা লেপিতে বসিলেন। এখানে এক খাবল দেন, ওখানে এক খাবল দেন"। অন্যদিকে, কাঞ্চনমালা আঙ্গিণার একটু কোণ ঝেড়ে পরিস্কার করে "চালের গুঁড়ায় খানিকটা জল মিশাইয়া, এতটুকু নেকড়া ভিজাইয়া, আস্তে আস্তে, পদ্ম লতা আঁকিলেন। পদ্ম লতার পাশে সাত কলস আঁকিলেন। কলসের উপর চূড়া, দুই দিকে ধানের ছড়া আঁকিয়া, ময়ূর, পুতুল, মা লক্ষ্মীর সোনাপায়ের দাগ, এইসব আঁকিয়া দিলেন"[১৫]। এ যেন এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা। আদর্শ মেয়ে হয়ে ওঠার এক সামাজিক, নৈতিক মানদণ্ড যেন বেঁধে দেওয়া হয় এই দুটি বিপরীত দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে।

'শীত-বসন্ত' গল্পের ছোট্ট একটি অংশ জুড়ে রয়েছে এক রাজকন্যা, যে রাজকন্যার কাছে ঘটনাচক্রে পৌঁছে গিয়েছে শীত-বসন্তের মা, জনৈক রাজার দুয়োরানী — সে অবশ্য রাজকন্যার পোষা টিয়ারূপে বিরাজমান। দুয়োরানীকে ওষুধ-বড়ি দিয়ে সুয়োরানীর টিয়েপাখিতে পরিণত করার ঘটনা এখানে আলোচ্য নয়। আমরা দেখে নেব, টিয়া ও রাজকন্যার কথোপকথন, যেখানে টিয়া সোনার নূপুর, ময়ূরপেখম, সতনরী হার, কানের দুল, সিঁথির মানিকের প্রসঙ্গে উল্লেখ করার পর বলে ওঠে —

"রাজকন্যা রূপবতী নাম থুয়েছে মায়।
গজমোতি হত শোভা ষোল-কলায়।
না আনিল গজমোতি, কেমন এল বর?
রাজকন্যা রূপবতীর ছাইয়ের স্বয়ম্বর।"

একথা শুনে “রূপবতী রাজকন্যা গায়ের আভরণ, পায়ের নূপুর, ময়ূরপেখম, কানের দুল, ছুঁড়িয়া, ছিঁড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।”[১৬] বিত্ত কীভাবে শৈশবকে বা কৈশোরাবস্থা নির্ণয় করে, এ যেন তারই নিদর্শন। এর মধ্যেই রাজকন্যাকে ঘোষণা করতে শোনা যায়, সে সেই রাজপুত্রকেই গ্রহণ করবে, যে ‘গজমোতি’ আনতে পারবে। স্বয়ম্বরা রাজকন্যার শৈশব এই উদ্ধত মানসিকতা-নির্ভর। তাই গজমোতি আনতে অপারগ রাজপুত্রেরা “রূপবতী রাজকন্যার নফর হইয়া রহিলেন।”[১৭] লক্ষণীয়, ‘নফর’ শব্দটি। যার অর্থ চাকর। প্রশ্ন জাগে, বীর্যশুল্কা রাজকন্যাদের এহেন ‘মেয়েবেলা’ কি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নির্মাণ, নাকি, তা প্রকারান্তরে কোনো এক সময়ের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সূচক?

‘দুধের সাগর’ বিভাগটির শেষ গল্প ‘কিরণমালা’। এই গল্পটির নাম মূল চরিত্রের নাম অবলম্বনে। কাহিনির আরম্ভ এক রাজ্যের এক গৃহস্থের তিন মেয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়। বড়ো বোন ঘেসেড়াকে, মেজো বোন সূপকারকে ও ছোটো বোন রাজাকে বিয়ে করতে আগ্রহী। একথা সেই রাজ্যের রাজা শুনতে পেয়ে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন, ছোট বোনটিকে বিয়ে করে নিজের রানী করে তোলেন। কয়েক বছর পরে রানী সন্তানসম্ভবা হলে বোনেরা রানীবোনের আঁতুড় সামলাতে আসে। বোনের ঐশ্বর্য তাদের ঈর্ষান্বিত করে তোলে — তারা রানীবোনের তিন সন্তানকে পরপর জলে ভাসিয়ে দিয়ে রানীকে ‘অলক্ষ্মী’, ‘ডাকিনী’ প্রমাণ করে রানীকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করিয়ে শান্ত হয়। এই হিংসাত্মক ঘটনা একদিকে যেমন ‘siblings rivalry’-কে প্রকাশ করে, অন্যদিকে এমন একটি সমাজের চিত্র তুলে ধরে যে সমাজ সন্তান প্রসবে অসমর্থ নারীকে ‘ডাকিনী’ হিসেবে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করে না। লক্ষণীয়, ‘ডাকিনী’ শব্দের যুৎসই কোনো পুং-প্রতিশব্দ নেই; সমাজ পুরুষতান্ত্রিক — তাই শব্দভাণ্ডারেও এরকম সীমিতি চোখে পড়ে।

উক্ত ‘ডাকিনী’ রানী প্রকৃতপক্ষে প্রসব করেছিল দুটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান — যারা ভাগ্য বিপর্যয়ে এক ব্রাহ্মণের ঘরে পালিত হয়। এই কন্যাই কিরণমালা। অরুণ-বরুনের বোন। ‘অলক্ষ্মী’ মা-এর ‘লক্ষ্মী’ মেয়ে “কিরণমালা হাড়িতে কুটাটুকু পড়িতে দেয় না, কাজললতা

গাইয়ের গায়ের মাছিটি বসিতে দেয় না। ...তিন ভাই-বোনে মিলিয়া ডালায় ফুল তুলিয়া ঘর বাড়ী সাজাইয়া আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।"[১৮] কিন্তু পট পরিবর্তিত হয়ে যায় এক সন্ন্যাসীর কথায় — যিনি ঘোষণা করেন, 'মায়া-পাহাড়'-এ 'সোনার ফল', 'হীরার গাছে' 'সোনার পাখি'—এসব যে আনতে পারবে, সে বড় বীর। বলা বাহুল্য, অরুণ-বরুন নিজেদের 'বীর' হিসেবে প্রমাণ করতে ছুটে গিয়ে অপ্সরার মায়ায় পড়ে প্রাণ হারায়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কিরণমালার পাশে কোনো রাজপুত্র আসে না। প্রচলিত রূপকথার ছক ভেঙে কিরণমালা উঠে দাঁড়ায় একা—

> "কিরণমালা কাঁদিল না, কাটিল না, চক্ষের জল মুছিল না; উঠিয়া কাজললতাকে খড় খৈল দিল, গাছ-গাছালির গোড়ায় জল দিল, দিয়া রাজপুত্রের পোষাক পরিয়া, মাথে মুকুট হাতে তরোয়াল — কাজললতার বাছুরকে, হরিণের ছানাকে চুমু খাইয়া, চক্ষের পলক ফেলিয়া কিরণমালা মায়া পাহাড়ের উদ্দেশ্যে বাহির হইল।"[১৯]

সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর করে তেত্রিশ দিনের মধ্যে কিরণমালা পাহাড়ে পৌঁছয়। হীরার গাছে সোনার ফল, তীর-ধনুক নিয়ে শীতল ঝর্ণার জল ছিটিয়ে দেয় পাহাড়ের আনাচে-কানাচে; "দেখিতে দেখিতে সকল পাথর লক্ষ লক্ষ রাজপুত্র হইয়া গেল। রাজপুত্রের জোড় হাত করিয়া কিরণমালাকে প্রণাম করিল — সাত যুগের ধন্য বীর!"[২০]

এই গল্পটি আদি রূপকথার প্রথাসিদ্ধ চরিত্রচিত্রণকে ভেঙে দিয়েছে। রূপকথার কেন্দ্রীয় মেয়ে/ নারী চরিত্রের বর্ণনায় সবসময়েই প্রাধান্য পায় তার দেহগত সৌন্দর্য। সেই রাজকন্যা তার রূপের দেমাকেই হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাবিহারী বা বীর্যশুল্কা। তার 'মেয়েবেলা'র সঙ্গেও তাই ওতপ্রোত সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে বিলাসব্যসন, ঐশ্বর্য, বিত্তের অহংকার। এই সমস্ত দিক দিয়েই 'কিরণমালা' ব্যতিক্রমী। গল্পের কোথাও তার রূপবর্ণন করা হয়নি; বরং তার স্নেহময়ী, ধৈর্যশীল চরিত্রের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অসীম সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতি হওয়ার কারণে তাকে দেওয়া হয়েছে 'বীর' আখ্যা। 'কিরণমালা'র 'মেয়েবেলা'ও তাই তার স্বভাব-চরিত্রের মতোই ব্যতিক্রমী।

‘রূপ তরাসী’ অংশের কাহিনিগুলি মূলত রাজপুত্রের সঙ্গে রাক্ষসীদের দ্বন্দ্ব বিষয়ক। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যেতে পারে যে, কিশোরী মেয়ে হিসেবে রূপকথায় রাজকন্যা প্রসঙ্গ বারবার এলেও রূপকথায় মূলত পরিণত নারী চরিত্রের দুটি দিক – রানী ও রাক্ষসী। রানী চরিত্র আঁকতে গিয়ে কথক প্রায় সব সময়েই একটি প্রতিপক্ষ নিয়ে আসেন – একটি ভালো, অন্যটি মন্দ,। একজন গৃহকর্মনিপুণা, অন্যজন স্বার্থপরতায় অন্ধ। কাহিনিতে প্রাথমিকভাবে ভালো রানীটিকে একের পর এক সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য করেন। কিন্তু কাহিনি শেষে তাকে পাটরানী করে মন্দ রানীকে নির্মমভাবে শাস্তি দিয়ে শান্তিবিধান করা হয়। অর্থাৎ আদর্শ রানী চরিত্র অঙ্কণের ক্ষেত্রে নৈতিকতার বোধ আগাগোড়াই ক্রিয়াশীল থাকে।

রূপকথার অপর পরিণত নারী চরিত্র হল রাক্ষসী বা আইবুড়ি। লেম্যান বলেন, “আদিম মানুষের মৃত্যুভয় থেকেই রাক্ষসাদির সৃষ্টি। অন্যমতে স্বপ্নজগতেই এদের সৃষ্টি হয়েছে। আসলে ভয়কে তাড়িয়েই মানুষ অসাধ্যসাধনের যে ইচ্ছা পোষণ করত, তার মধ্য দিয়েই রাক্ষস-খোক্কসের গল্প জন্ম নিয়েছে”[২১]। অর্থাৎ, এই নেতিবাচক চরিত্র নির্মাণের পেছনে কার্যকরী হয়েছে কোনো ‘ভীতি’র বোধ। রাক্ষসীদের পরিচিতি সমাজের কাছে অস্বস্তিসূচক। ঋক্‌বেদ-এ বয়স্কা কুমারীদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কোনো কোনো নারী “পিতৃগৃহে বৃদ্ধা হয়ে যায়”[২২] – এরা সমাজে নিন্দনীয়—এরা ‘কুলপা’, ‘অমাজুরা’ বা ‘আইবুড়ি’। রাক্ষসীরা স্বেচ্ছাবিহারী, স্বাধীনচেতা, কখনো কখনো নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মরিয়া। কিন্তু এরা যে নির্দয়, তা বলা যায় না। বিশেষত পাতালপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যার প্রতি সদয় হয়ে যখন সে বলে, “...কাউকে যেন কস্ নে নাঁত্নি, সঁব তোঁ আঁমি তোঁকেই দোঁবো”[২৩] , তখন মেয়েদের আত্মপরিচিতির অন্য এক সংজ্ঞা সামনে আসে। বোঝা যায়, এরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর প্রতিভূ। তাই তো পুরুষশাসিত সমাজের চোখে এরা কুৎসিত দর্শন। মাতৃতান্ত্রিক প্রতিবেশের প্রতি চূড়ান্ত ভীতিই কি রাক্ষসীদের এইরূপ চিত্র অঙ্কনের কারণ?—প্রশ্ন জাগে।

মূল আলোচনায় হয়তো রানী বা রাক্ষসী প্রসঙ্গ সরাসরি আলোচনার বিষয় নয়, কিন্তু লক্ষণীয়, এই দুটি 'pattern'-এর সঙ্গে সামাজিক বিধিনিষেধ কতটা সক্রিয়। এই রূপকথাগুলির রচনার কাল আমাদের অজানা। তবু বোঝা যায়, সমাজ স্বাধীনচেতা, কুৎসিৎ দর্শন মেয়েদের 'খারাপ' তক্‌মা দিতেই অভ্যস্ত, আর সর্বংসহা রানীই হল আদর্শ গৃহবধূ, আদর্শ স্ত্রী/ মাতা। চরিত্রের এই আদর্শায়নের মূলে আছে সামাজিক চাহিদা যার নিয়ন্ত্রক হল নৈতিক মানদণ্ড।

উক্ত নৈতিকতার প্রতিফলন এবারে আমরা লক্ষ্য করব দুই কিশোরী চরিত্রে – 'চ্যাং ব্যাং' অংশের 'সুখু আর দুখু' গল্পে। এক তাঁতীর দুই স্ত্রী – তাদের দুজনের মধ্যে বড়ো স্ত্রীর মেয়ে সুখু, ছোট স্ত্রীর মেয়ে দুখু। গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই এক নৈতিক দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। সুখু আর দুখুকে পরস্পরের বিপ্রতীপ অবস্থানে রেখে পাঠককে [বিশেষভাবে শিশু-কিশোর পাঠককে] নৈতিকতার পাঠ প্রদান করা হয়েছে। গল্পের প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হয়, "বড় স্ত্রী বড় মেয়ে ঘর সংসারের কূটাটুকু ছিড়িয়া দুইখানা করে না; কেবল বসিয়া বসিয়া খায়। দুখু আর তার মা সূতা কাটে, ঘর নিকোয়, দিনান্তে চারটি চারটি ভাত পায় আর সকলের গঞ্জনা সয়।"[২৪] ক্রিয়াপদের সচেতন ব্যবহার এক্ষেত্রে সুখু আর দুখুদের সামাজিক অবস্থানকে সূচিত করে।

গল্পের প্রথম পর্ব দুখু-কেন্দ্রিক। অতি কষ্টে আগলে রাখা সুতো বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেলে দুখু তার পিছন পিছন দৌড়তে শুরু করে। তার ব্যস্ত চলন বারবার প্রতিহত হয়ে পড়ে গোয়াল পরিষ্কার, 'শেওড়া' গাছের গুঁড়ি পরিষ্কার এবং ঘোড়াকে চার গোছা ঘাস এনে দেওয়ার অনুরোধ পূর্ণ করার প্রচেষ্টায়। তবু দুখু দমে না। 'চাঁদের মা বুড়ী'কে প্রণাম করে সে তুলো ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানায়। বুড়ি এরপর তাকে স্নান সেরে খেয়ে বাক্স বেছে নিতে বলে। নির্লোভ দুখু 'ছেঁড়া নাতা গামছা' 'এক চিমটি ক্ষার' নিয়ে স্নানে যায়, 'এক কোণে বসিয়া' 'চারটি পান্তা' খায়, 'ছোট্ট এতটুকু এক খেলনা-প্যাঁটরার তুলো নিয়ে ফিরে আসে। বুড়ির আশীর্বাদে দৈবী পুকুরে এক ডুবে 'দুখুর সৌন্দর্য উথলে পড়ে' 'আর একডুবে দুখুর গয়না – গায়ে ধরে না।'[২৫]

এর ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটে সুখুর বেলায়। সুখু পাওয়ার পথে গরু, গাছ ও ঘোড়াকে কোনো সাহায্য করে না, বুড়িকে তাচ্ছিল্য করে। আর লোভ তাকে বাধ্য করে দামী শাড়ি, সুবাসিত তেল-চন্দন দিয়ে স্নান করে পুকুরে তিন ডুব দিতে। কিন্তু তিন ডুব দিয়েই সে দেখে, "গা ভরা আঁচিল ঘা পাঁচড়া — এ-ই নখ, শোণের গোছা চুল — কত কদর্য সুখুর কপালে"[২৬]। সুখু পায়েস-পিঠেও 'খাবলে' খায় ও সবচেয়ে বড় বাক্স নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

শিশুসাহিত্য হলেও গল্পটির পরিণতি বিভীষিকাময়। সুখুর বড় বাক্স থেকে অজগর বেরিয়ে সুখুকে খেয়ে ফেলে ও সুখুর মা মাথায় চেলাকাঠ মেরে আত্মহত্যা করে। প্রকৃতপক্ষে, এই গল্পে এক নীতিশিক্ষার আবহ প্রস্তুত করা হয়েছে। যথার্থ শৈশব-কৈশোর গড়ে ওঠে শালীনতা, ভদ্রতা, সুরুচি, নির্লোভ মানসিকতা, সংযমী আচরণ, বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা — এই বোধসমূহের সমন্বয়ে। 'মেয়েবেলা'ও যেহেতু এই যাবতীয় স্বভাবের সমাহার, তাই 'দুখু' চরিত্র ও তার আচরণ সুস্থ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে; অন্যদিকে সুখুর আচরণকে নিন্দনীয় দেখিয়ে তা বর্জন করার অদৃশ্য এক নির্দেশ রয়েছে গল্পটিতে। নির্দেশ লঙ্ঘন করলে কী ভীষণ পরিণতি হতে পারে, তার প্রতীকী চিত্রণ রয়েছে সমাপ্তিতে।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৮ সালে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের আরেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই এটিকে নির্দেশ করা হয়েছে 'বঙ্গোপন্যাস' বা 'বাঙ্গালার গীতকথা' নামে। শ্রী মিত্র মজুমদার এই কথাও বলেছেন যে, "...'ঠাকুরমার ঝুলি'র সহিত সংগতি রাখার নিমিত্ত এবং 'গীতকথা'র সুর অনেকাংশেই পুরুষকণ্ঠের বলিয়া, কথাসাহিত্য বাঙ্গালা উপন্যাসের— 'বঙ্গোপন্যাস—ঠাকুরদাদার ঝুলি' নামকরণ"[২৭]। এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, এই লেখাগুলি পূর্বাপর লেখার তুলনায় কোথাও একটু পৃথক। ভূমিকাতে লেখক স্পষ্ট করেছেন পাশ্চাত্যের অনুপ্রেণায় ও অনুকরণে, বাংলার মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে 'উপন্যাস' এই সংরূপটির উদ্ভব হয়। প্রাক্-উপন্যাস যুগ থেকে বাংলা ভাষায় যে 'শাশ্বত বস্তু' প্রচলিত ছিল, তাকে লেখক

নির্দেশ করেছেন 'কথা' বলে এবং এগুলিই হল 'বাঙ্গালার পল্লীর শ্রুতি সাহিত্য'।[২৮] এই 'কথা' শ্রেণিরই অন্তর্গত 'গীতকথা' — কাহিনির সঙ্গে সম্পৃক্ত গীতিময়তা।

'গীতকথা' বিষয়ে দক্ষিণারঞ্জন কয়েকটি আঙ্গিক উল্লেখ করেছেন, যেমন —

১) গীতকথা—উপন্যাসোপম সংরূপ। এতে রয়েছে কল্পনার উৎকর্ষ এবং ঘটনার বিপুল বৈচিত্র্য। এগুলি 'পরণকথা', 'প্রস্তাব'-এর সমগোত্রীয়।

২) এতে অতিপ্রাকৃত ঘটনা থাকলেও রূপকথার মত রাক্ষস-খোক্কসদের কথা প্রায় নেই।

৩) গীতকথায় আর্য-অনার্য-বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে।

৪) রূপকথা মহিলাদের একচেটিয়া সম্পত্তি হলেও "গীতকথা প্রধানত পুরুষেরই অধিকারে।"[২৯]

পরবর্তী আলোচনায় আলোকপাত করা হবে এই 'গীতকথা'র পাঁচটি কাহিনির উপর। বিশ্লেষণ করে দেখা হবে এই 'পাঁচ নহর', 'মধুমালা', 'পুষ্পমালা', 'মালঞ্চমালা', 'কাঞ্চণমালা' ও 'শঙ্খমালা'য় পুরুষ-কথক কী ধরনের 'মেয়েবেলা' সৃজন করেছেন।

প্রথম কাহিনি 'মধুমালা'। রাজকন্যা মধুমালা তাম্বুল রাজের কন্যা, সমুদ্রের মাঝে সোনার পুরীতে সাত-ছত্রিশ-তের কুঠরী পরে তার ঘর। মধুমালার রূপ-বর্ণনায় কথক এখানে অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন — "কন্যার সিঁথিতে পাটিতে ফুল, ফুল ঢালা সারা অঙ্গ গায়,/ ফুলের বিছানে কন্যা, — চাঁদ যেন নিঝুমে ঘুমায়।"[৩০] নিদ্রাপরী-কালপরীর ইচ্ছেয় মধুমালার পাশে স্থাপন করা হয় মদনকুমার (উজানীনগরের রাজপুত্র)-এর পালঙ্ক। ঘুম ভাঙতে মধুমালা চমকে উঠে সাতফলা ছুরী রাখে কুমারের বুকের উপর। বোঝা যায়, রাজকন্যা প্রত্যুৎপন্নমতি ও সাহসী। কিন্তু মদনকুমার কেঁদে ওঠেন, যা অপুরুষোচিত। মধুমালা প্রশ্ন করেন — "দেব দানব কিংবা হও কোন্ জন? বল শুনি আঁখির মুছি জল! /সোনার সুন্দর মুখে সত্য পরিচয় দিও, অসত্যের মরণ প্রতিফল!"[৩১] মধুমালার এই দার্ঢ্য অক্ষুণ্ণ থাকে তখনও, যখন সে মদনকুমারের সঙ্গে অঙ্গুরীয় বিনিময় করে নিজ উদ্যোগেই মদনকুমারের সঙ্গে প্রতীকী বিবাহ (গান্ধর্ব বিবাহ!) সম্পন্ন করে এবং একে অপরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে।[৩২]

উক্ত ঘটনা পর্যন্ত কাহিনির একমুখী সরলরৈখিক গতি দেখা গেলেও এরপর কাহিনি বিন্যাস জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করে। ভাগ্যদোষে মধুমালা-মদনকুমারের বিচ্ছেদ ঘটলে মদনকুমার উন্মাদের মতো মধুমালার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এরপর যে ক'টি রাজ্য পেরিয়ে সে যায়, প্রত্যেক রাজকন্যাই তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ঘটনাচক্রে। এদের মধ্যে দেবদ্বিজে ভক্তিমতী 'কমল-নয়নী' পঞ্চকলা, 'অমৃত-নয়নী' চন্দ্রকলা, এবং 'হরিণ নয়নী', 'বিদ্যাবতী' কন্যা চম্পকলা, 'পতি' মদনকুমারকে প্রশ্ন করে যে 'স্বামী' তাদের 'পুষিবে' কি না। কাহিনির শেষে মধুমালাকে উদ্ধার করে মদনকুমার রাজ্যে প্রবেশ করে রাজমাতাকে বলে "আজ তোমার 'দাসদাসী' লইয়া আসিয়াছি।"[৩৩] সবকটি রাজকন্যাও কাহিনি শেষে একসঙ্গে আমোদ-প্রমোদেই দিনযাপন করতে থাকে।

উক্ত কাহিনি পুরুষের বহুগামিতার (polygamy) সূচক। একই সঙ্গে এ-ও মনে হয়, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের সমতুল; অন্তত, 'পুষিবে' — এই ক্রিয়াপদ এবং 'দাসী' শব্দবন্ধ তা-ই প্রমাণ করে।[৩৪] আর তখনই বীরত্ব, পাণ্ডিত্য, ভক্তি — সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পুষ্ট 'মেয়েবেলা'র অস্তিত্ব সম্পূর্ণত নির্মূল হয়ে যায়।

'পুষ্পমালা'র কাহিনির সূত্রপাত দুই নিঃসন্তান দম্পতি — রাজা-রানী এবং কোটাল-কোটালনীর দুঃখের পরিস্থিতি বর্ণনের মধ্য দিয়ে। এদের মধ্যে রাজা ও কোটাল এবং রানী ও কোটালনী পরস্পরের কাছে এই সত্যে প্রতিশ্রুত হন যে রাজার মেয়ে ও কোটালের ছেলে হলে তাদের বিয়ে দেওয়া হবে। যথাসময়ে রাজার 'ক্ষীরের পুতুল কন্যা' হয়, কিন্তু রাজা মুখ নীচু করে রাজসভায় যান। সন্তান হিসেবে 'মেয়ে' প্রাপ্তি রাজার পুরুষালি প্রতাপকে হয়তো কিছুটা খর্ব করে। কারণ, শাস্ত্রে বলে, 'কন্যা অমঙ্গল', 'শোকের কারণ' (যথাক্রমে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও মহাভারতের দৃষ্টান্ত)।[৩৫]

এতদ্‌সত্ত্বেও রাজা মেয়েকে বিদূষী করে তুলতে আগ্রহী। তাই, “পঞ্চম বয়স হ’তে কন্যা পুষ্পমালা/রাজা দিল পাঠশালা।”[৩৬] রূপকথা যেখানে রাজকন্যার সৌন্দর্য-সর্বস্ব ‘মেয়েবেলা’ অঙ্কণে আগ্রহী, সেখানে এইরূপ বর্ণনা কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়। একই পাঠশালায় কোটালপুত্র যায়, কিন্তু রাজকন্যার সিংহাসনের নীচে বসে সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য শৈশব-কৈশোরকেও যে বিভাজিত করে, এ যেন তারই দৃষ্টান্ত। উক্ত অবস্থিতি কিছু পরেই বদলে যায় — যখন তারা গুরুর সামনে তাদের বাবা-মায়েদের পূর্বকৃত সত্য পালনে বদ্ধপরিকর হয়ে একে-অপরকে বিবাহে সম্মত হয় — “গুরুর চরণে তিন সত্য শপথ করিয়া, বাপ মাকে সত্যে মুক্তি দিয়া, পুষ্প বসিল নীচে, কোটাল বসিল সিংহাসনে।”[৩৭] এ-ও এক সামাজিক অবস্থান — শুধু তার নিয়ন্ত্রক ‘বিত্ত’ নয়, ‘বিধান’ ; এবং এই বিধানে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্যই চলে ‘মেয়েবেলা’র সংগঠন।

এরপর, পুষ্পমালা তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সাঁঝবাতি দিয়ে, বাবা-মাকে পঞ্চব্যঞ্জন পরিবেশন করে, দাসী-বাঁদী, আশ্রিত-পরিজনকে খাইয়ে দেশত্যাগী হয় সিপাহীর ছদ্মবেশে, পথিমধ্যে যথাযথ অস্ত্রচালনায় রক্ষা করে স্বামীকে; কিন্তু এরপরেও দেখা যায়, ডাকাতের হাতে স্বামী প্রাণ হারালে তার ‘সতীত্ব’ ফিরিয়ে আনে স্বামীকে। পরবর্তীতে যাদুকরী মালিনী চন্দনকুমারকে বশ করলেও পুষ্পমালা অনেক কৌশল করে, ব্রতকথা শুনিয়ে মুক্ত করে সকলকে — এমনকি তার বাবা-মাকেও, সত্য ভঙ্গের জন্য যাঁরা অভিশাপগ্রস্ত ছিলেন — “ধন্য মা তুই কন্যা পুষ্প/ তোরি জন্য শাপে মুক্ত।”[৩৮] এভাবে, এই গল্পে শেষ পর্যন্ত পুষ্পমালার ‘মেয়েবেলা’র মহত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজকন্যাই এখানে গল্পের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, সেই মহতী ‘মেয়েবেলা’র চালিকাশক্তি কি? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নাকি সামাজিক লিঙ্গ নির্মিতির জটিল কৌশল?

‘মালঞ্চমালা’র কাহিনি অন্যান্য কাহিনির তুলনায় বেশ আলাদা। বিধিলিপি অনুযায়ী বারো বছরের কোটালকন্যা মালঞ্চমালার সঙ্গে সাত দিন বয়সী রাজপুত্রের বিয়ে হয় ও বাসরঘরে রাজপুত্রের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় মালঞ্চকে ডাইনী সন্দেহে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে,

চোখ উপড়ে, হাত কেটে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করা হয়ে এবং স্বামীর চিতায় সহমৃতা হতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু কোনোক্রমে মালঞ্চ তার শিশু স্বামীকে বুকে আঁকড়ে পালাতে সক্ষম হয়। ভূত-প্রেত-পিশাচ-কালদূত-রাক্ষসী সকলে মৃত স্বামীকে চাইলে মালঞ্চ দাপটের সঙ্গে বলে ওঠে — "দেব ধর্ম্ম দেখ সাক্ষী। পতি আমার বুকে রাখি,/ পতির পরশ যদি সতী আমি হই/ ছুঁবিকি পাতালে যাবি। — ভস্মের ভস্ম চূর্ণ হবি।/ আমি যে মালঞ্চ নারী, আর কেহ নই।। "[৩৯] মালঞ্চের শেষ বাক্যটি লক্ষ্যণীয় — তার বক্তব্যে সতীত্বের গৌরব রয়েছে কিন্তু তাকে আরও বেশি মহিমান্বিত করেছে আত্মগৌরব। এযাবৎ রূপকথা-গীতকথা কোনো মেয়েকে নিজের পরিচয়ে পরিচিত হতে দেখা যায়নি।

মালঞ্চ নিজ ক্ষমতাবলে শিশু স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলে। বনমধ্যে বাঘ-বাঘিনী পরিবৃত হয়ে বনদেবী রূপে বিরাজ করে। এমনকি, রাজপুত্র-স্বামীর পাঁচ বছর হলে তাকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য 'সহরপাট'-এর সন্ধানে বন ত্যাগ করে মালঞ্চ। এ তার বিচক্ষণতার পরিচায়ক। শহরে এক মালিনীর কাছে আশ্রয় নেয় মালঞ্চ; ভাঙা ঘর ভেঙে তিন-কুঠুরী বানায়, দোয়াত-কলম সহযোগে স্বামী চন্দ্রমাণিককে পাঠশালায় পাঠায়; কিন্তু আত্মগোপন করে থাকে স্বামীর কাছে। চন্দ্রমাণিকের সমস্ত সাধ পূর্ণ করার পর একদিন প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য হয় মালঞ্চ, সে 'কোটালকন্যা'। ঘটনাচক্রে দুধবর্ণ রাজার কন্যা কাঞ্চীর সঙ্গে চন্দ্রমাণিকের বিয়ে হয় ও সেই রাজ্যের রীতি অনুযায়ী বারো বছরের জন্য কারারুদ্ধ হয় চন্দ্রমাণিক। এই খবরে 'চোখে আগুন' মালঞ্চ পক্ষীরাজ হরিকালীকে নিয়ে চন্দ্রমাণিক উদ্ধার অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

এরপর কাহিনি এগিয়েছে বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করে। মালঞ্চ বারংবার বাধা দিয়েছে নিজের প্রতিশোধস্পৃহাকে, বরং অত্যাচারী শ্বশুরের স্নেহ আকাঙ্ক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রমাণিক তারই বুদ্ধিমত্তা, বীরত্ব ও সাহসিকতায় ভর করে বেঁচে ফিরেছে। মালঞ্চ শ্বশুরঘরের কাঙ্ক্ষিত সম্মান লাভ করেছে। এমনকি, মালঞ্চ নিজে কাঞ্চীকে 'পাটরানী' করে তুলেছে — রাজ্যের লোক মালঞ্চকে স্বীকার করেছে 'ঠাকুরুণী' হিসেবে। সংগ্রামী শৈশব-কৈশোরের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মালঞ্চমালা।

'কাঞ্চনমালা' গল্পে মূলত তিনটি নারী চরিত্র বিভিন্ন সময়ে ক্রিয়াশীল হয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে কাহিনির অগ্রগতি ও পরিণতিতে। এদের মধ্যে 'মালিনী' চরিত্রটি খল-চরিত্র। মন্ত্র-তন্ত্র, যাদুবিদ্যা, কুবুদ্ধি ইত্যাদি প্রয়গের মাধ্যমে সে একটি নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মালিনীর বোন্‌ঝি এই গল্পে সবচেয়ে করুণ নিষ্পাপ চরিত্র। মালিনীর দুর্বুদ্ধি তাকে দিয়ে যতবার কোনো হিংসাত্মক কাজ করাতে গিয়েছে, ততবার সে কাঁদতে কাঁদতে তা করতে বাধ্য হয়েছে। মালিনী তার বোন্‌ঝির রূপ-সৌন্দর্যের বিনিময়ে সওদাগর-পুত্র রূপলালকে হস্তগত করতে চেয়েছে; কিন্তু বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অপারগ হয়েছে। বোন্‌ঝি অপরের দ্বারা dominated হওয়ায় এক দমবন্ধ শৈশব-কৈশোরের শিকার, যেখানে তার অভিমত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতাই নেই। কেবলমাত্র কাহিনির শেষ পর্বে বোন্‌ঝির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রূপলালের 'জরা' ভাগ করতে কেউ এগিয়ে না এলে বোনঝি এগিয়ে আসে — "সাত প্রহর উপোস থাকিল, স্নান দান করিয়া, পাটবরণ পরিয়া, সকলের কাছে বিদায় নিল, নিয়া — সেঁউতি ফুলের একগাছি মালা গাঁথিয়া, মালা সওদাগরের পায়ের উপর দিল, দিয়া, সওদাগরের থক্ থক্ গলিত কুষ্ঠ মুখ — সেই মুখে — এ জন্মের মতন দেখা—দেখিয়া, দেখিয়া, দেখিয়া, — চুমা খাইল।"[৪০] রূপলাল রূপ ফিরে পেল ও বোনঝি তালগাছ হইয়া রহিল। সারা জীবনে মাত্র একবার মতপ্রকাশের অবকাশ তার আত্মত্যাগকে মহিমান্বিত করে তুলল এবং স্থৈর্য-সহিষ্ণুতায় পরিপূর্ণ এক পরিণত 'মেয়েবেলা' নির্মাণ করে ফেলল।

আদ্যন্ত Romantic এই বোনঝির প্রায় সমান্তরালেই চলে গল্পের নায়িকা কাঞ্চনমালা। মালিনীর প্ররোচনায় রূপলাল চোখ বেঁধে বিয়ে করে কাঞ্চনমালাকে--বিশ্বাস করে সে 'যম রাক্ষসী'। কাঞ্চন নির্বাসিত হয় প্রাসাদের বাইরে, কুঁড়েঘরে। কিন্তু বাণিজ্যে রওনা হওয়ার সময় কাঞ্চনের অনুমতি না পেলে রূপলালের নৌকো এগোয় না। অনুমতি প্রার্থনা করলে কাঞ্চন বলে, "বাণিজ্যে যাইব, স্বামি, সাথে করে লও তোমার দাসীরে।"[৪১] 'দাসী' হিসেবে নিজেকে উল্লেখ করলেও স্বামী-স্ত্রীর hierarchial position এখানে প্রাধান্য পায়নি, বরং সহধর্মিনীর যোগ্য আবেদন প্রকাশ পেয়েছে।

কাঞ্চনমালাকে অগত্যা এক ভাঙা ডিঙিতে করে যেতে অনুমতি দেয় রূপলাল। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে কাঞ্চনই "দুই হাতে ডিঙ্গা সেঁচিয়া... সওদাগরকে বাঁচাইলেন, মাঝিমাল্লা বাঁচাইলেন।"[৪২] কৌশলে রাজার ঘাট এড়িয়ে যায় কাঞ্চন, সিঁদুর বেসাতে করে খুদ নিয়ে এসে মন্বন্তর-পীড়িত রাজ্যে রূপলালকে রেঁধে খাওয়ায়। 'সতীর স্পর্শে' খুদ কুঁড়ো 'সপ্তব্যঞ্জন'-এ পরিণত হয়। ঘটনা এগোয়। কাঞ্চনমালা যে অপ্সরা, তার প্রকাশ পায়, রূপলালের ভুল ভাঙে, ইন্দ্রের সভা থেকে সে কাঞ্চনকে ফিরিয়ে আনতে চায়। এমতাবস্থায় কাঞ্চন, মালিনীর বোন্‌ঝি তার 'অভাগিনী সখী'কে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য ইন্দ্রের হাতের পাখা প্রার্থনা করে। শেষ পর্যন্ত অনেক শর্ত পেরিয়ে সখীকে বাঁচিয়ে তোলে সে। এক ভাগ্যবিড়ম্বিত 'মেয়েবেলা' চিত্রিত হয় এই গল্পে, যেখানে আত্মত্যাগ বা রোমান্টিকতা সবই সতীত্বের মাপকাঠিতে নির্ণীত হয়।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের দুটি প্রতিনিধিস্থানীয় বই নির্বাচন করে আমরা দেখাতে চেয়েছিলাম রূপকথায় সামাজিকভাবে 'মেয়েদের ছোটবেলা'র ধারণা কীভাবে প্রকাশিত হয়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কথক মূলত মহিলারা — কিন্তু সেখানে মেয়েদের দেখানো হয়েছে সৌন্দর্যের আধার হিসেবে। এই রূপ-যৌবনকে পুঁজি করেই তাদের স্বেচ্ছাবিহার, স্বাধিকার অর্জন প্রচেষ্টা। বারবার নৈতিকতার মানদণ্ডে আদর্শ মেয়ে হয়ে ওঠার পাঠ দিয়ে গেছেন কথকেরা আপাত কাহিনির আড়ালে। কুরূপা, স্বাধীনচেতা মেয়েদের কোনঠাসা করা হয়েছে নেতিবাচক আধারে। মেয়েদের জগৎ ও জীবনকে নিজস্ব উপায়ে 'দেখা'ই রূপকথার কাহিনিলোক তৈরি করেছিল। এ. কে রামানুজন এগুলিকে তাই বলেন 'Women's Tales' [৪৩] —কারণ, এই গল্পগুলি হয় মেয়েদের ঘিরে তৈরি হচ্ছে অথবা মেয়েরাই হয়ে উঠছে এর কথক। ব্যতিক্রমী মেয়ে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র কিরণমালা — যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়ে হয়েও অবলীলায় পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে। এ কাহিনি মেয়েদের সুপ্ত বাসনার ইঙ্গিতবাহী।

অন্যদিকে 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র কথক পুরুষেরা। এই বইয়ের কাহিনিগুলিকে 'উপন্যাস' শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে সম্ভবত এর জটিল কথনরীতির জন্য। চরিত্র নির্মাণেও বহুস্তরীয় প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। সম্ভবত, বিশ শতকের আধুনিকমননের সামনে এই গল্পগুলি পেশ করার ক্ষেত্রে

মেয়েদের গল্প বলার ভঙ্গির বদল চেয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন, তাই এগুলিকে তিনি ঠেলে দিলেন ‘পুরুষের অধিকারে’। এক্ষেত্রে একটি ‘জেন্ডার প্যাটার্ন’ তৈরি করেছেন অধ্যাপিকা অমৃতা দাশগুপ্ত—[৪৪]

গল্পকথক (মূলত মেয়েরা) — শ্রোতা (মহিলা / পুরুষ) — সংকলক / লেখক (মূলত পুরুষ) — পাঠক(মহিলা / পুরুষ) — এর পরে প্রথম ধাপটির ‘অধিকারের হস্তান্তর’ ঘটে — গল্প বলার অধিকার পায় পুরুষেরা।

লক্ষ করব, এই গল্পগুলি নারীকেন্দ্রিক, গল্পগুলিতে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান আপাত-সুদৃঢ়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা পুরুষ চরিত্রগুলির উদ্ধারকর্তা। কিন্তু তারপরেও লক্ষণীয়, এখানে মেয়েদের শ্বশুরঘরে দাসী হয়ে থাকার মধ্যে, তাদের প্রেম, সতীত্ব, সহনশীলতার ওপরে মাতৃত্বের বিজয় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে নারী চরিত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেয়েদের স্বর প্রতিস্থাপিত হয়েছে পুরুষের বয়ানে। নারী ও পুরুষ—উভয়ের প্রেক্ষণবিন্দুর ভিন্নতা দুরকম আঙ্গিকে মেয়েদের ‘হয়ে ওঠা’কে নির্মাণ করেছে।

সীতা দেবী ও শান্তা দেবী

১৩৮৩ বঙ্গাব্দে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয় ‘হিন্দুস্থানী উপকথা’ — লেখক সীতা দেবী ও শান্তা দেবী। এই বইটি শ্রীশচন্দ্র বসু প্রণীত ‘Folk Tales of Hindusthan’-এর অনুবাদ। বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, “গল্পগুলি ইংরেজীতে পড়িয়া সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মহাত্মা স্টেড্ সাহেব তৎসম্পাদিত ‘Review of Reviews’ পত্রিকার ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই উপকথাগুলি আরব্যোপন্যাসের মত মনোহর।”[৪৫] নিশ্চিতভাবেই কাহিনিগুলি ‘মনোহর’। কিন্তু গভীর পাঠে বোঝা যায় যে, এর পরতে পরতে প্রকাশিত হয়েছে নীতিকথা ও আদর্শবাদ। আর এই নীতিশিক্ষার কেন্দ্রে রয়েছে মূলত মেয়েরা। তাই রূপকথা না হওয়া সত্ত্বেও এই বইটিকে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

‘ব্রহ্মদৈত্য ও ঝগড়াটী বামনীর কথা’ গল্পে আধপাগলী এক বুড়ো লোকের সঙ্গে চোদ্দ বছরের কন্যার বিবাহ স্থির হয়। এর আগে মেয়েটির বিয়ে না হওয়ার কারণ ছিল মেয়েটির ঝগড়ুটে স্বভাব। বিয়ের পরেও দেখা যায় মেয়েটির স্বভাব বদলায় না। এমনকি বোকা বরের গালে চড় কষিয়ে তাকে রোজগারের সন্ধানে পাঠায়, ব্রহ্মদৈত্যের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে ঘরছাড়া করে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক এখানে বজায় না থাকায় সমাজ তাকে ব্যঙ্গ করে বর্ণনা করে ‘সুশীলা পত্নী’ হিসেবে।

‘জঞ্জালনগরীর কথা’ শুরুতে একটি সুন্দরী মেয়ের উল্লেখ করা হয়, যে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে চত্বরের মাঝখানে ডিগবাজি খেতে প্রস্তুত। মূল গল্পের সঙ্গে এই টুকরো ঘটনার কোনো সরাসরি যোগ নেই। কিন্তু মেয়েটির এই আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় — “স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও গর্হিত ব্যাপার।....এইরূপ অপরাধী স্ত্রীলোককে পাথর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলা হয়। জঞ্জালনগরীতেও ইহাকে বড় লজ্জাহীনতার কাজ মনে করা হয়।”[৪৬] জঞ্জালনগরীতে শুধুই পন্ডিতদের বাস। শারীরিক কসরৎ প্রদর্শনের মাধ্যমে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করার ইচ্ছে—এই দ্বিবিধ অপরাধ তাই সমাজপতিদের চোখে ধরা পড়ে ‘বেহায়ামি’ হিসেবে। সুতরাং বোঝা যায়, ‘মেয়েবেলা’ও এক্ষেত্রে দিশি পণ্ডিতদের ইচ্ছাধীন নির্মাণ।

‘চারি বন্ধুর কথা’ গল্পটি রূপকথা বা উপকথার নিয়ম মেনেই রচিত। প্রাথমিক পর্বে রাজকন্যা অসহায় ও রাজপুত্র ত্রাণকর্তা। কিন্তু, গল্পের শেষ পর্যায়ে অন্য দেশের রাজপুত্র যখন রাজকন্যাকে বিবাহ করার জন্য জোর করে, তখন রাজকন্যা “অস্থির হইয়া না পড়িয়া, সাহসে ভর করিয়া শীঘ্রই মুক্তি লাভের একটি উপায় স্থির করিয়া ফেলিলেন।”[৪৭] একমাত্র এই গল্পেই রাজকন্যার সাহসিকতাকে কুর্ণিশ জানানো হয়েছে এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় পরবর্তী গল্প ‘হীরা ও লালের গল্প’; এই কাহিনিই এই অংশের শেষ গল্প। রাজপুত্র লাল পিতার সম্মতি না নিয়ে হীরার বিয়ের দিনে কৌশলে

হীরাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। লক্ষণীয়, বধূসজ্জা খুলে পুরুষের পোষাক পরে, ঘোড়ায় চড়ে হীরা, লালের সঙ্গে অতি দ্রুতবেগে শহর ছেড়ে চলে যায়। পথে এক দস্যুর সরাই-এ তারা আশ্রয় নিলে দস্যু লালকে হত্যা করলে হীরাও কৌশল অবলম্বন করে দস্যুকে মেরে ফেলে। আবার, পতিব্রতা হীরার অনুনয়ে শিব-পার্বতীর দয়াতে লাল প্রাণ ফিরে পায়। লালকে আবার ছাগল বানায় এক মায়াবিনী পানওয়ালি। একে ধরার জন্য হীরা আবার অন্য কৌশল অবলম্বন করে। পুরুষবেশী হীরা ঐ দেশেরই রাজকন্যাকে উদ্ধার করে সাপের কবল থেকে — পুরষ্কার স্বরূপ একদিনের জন্য সেই শহরের রাজা হতে চায় সে। রাজা হয়ে সে পানওয়ালির কারসাজি থেকে লালকে মুক্ত করে। কিন্তু লালের সঙ্গেই ঐ দেশের রাজকন্যার বিবাহ হয় এবং আদতে সর্পকূলজাত লাল জলে ফিরে যায়। "জীবনের বাকী দিনগুলি হীরা কাঁদিয়া কাটাইলেন। তাঁহার নির্বুদ্ধিতা ও অবিবেচনার এই ফল।"[৪৮] গল্পের শুরু থেকে যে হীরাকে অকুতোভয় বলে দেখানো হয়, তার পক্ষে কান্না বেমানান এবং তার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অবিবেচক বলা অনুচিত। সম্ভবত, পরিচিত ছকের বাইরে হীরা নামক 'মেয়ে'টির অবস্থান বলেই গল্পের পরিণতিতে হীরার একাকীত্ব আলোকত হয়, কিন্তু বীরত্ব অধরাই থেকে যায়।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে 'রূপকথাধর্মী-লেখা'র বিশ্লেষণ। 'রূপকথাধর্মী-লেখা' বলতে আমরা সেইসমস্ত লেখাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছি, যে লেখাগুলি সরাসরি লোকমানস থেকে সংগৃহীত হয়নি। মৌলিক চেতনা অবলম্বনে রূপকথার আদলে যা লেখা হয়েছে এযাবৎ কাল, সেই লেখাগুলিকেই 'রূপকথাধর্মী লেখা' বলে উক্ত প্রবন্ধে নির্দেশ করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, এই তালিকাটি বেশ দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময়। এই লেখায় আমরা নির্বাচন করেছি তিনজন লেখিকাকে, যাঁরা নিজেদের মৌলিক চিন্তা ভর করে রূপকথা নির্মাণ করেছেন এবং তাঁদের লেখাগুলি রূপকথার প্রচলিত ছক (pattern)-কে অস্বীকার করে নতুন অনেক বক্তব্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। এঁদের লেখায় রূপকথার রাজকন্যেরা বা সাধারণ মেয়েরা স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করেছে। আমাদের নির্বাচিত এই লেখিকারা হলেন হেমন্তবালা দেবী, গৌরী ধর্মপাল এবং নবনীতা দেবসেন।

হেমন্তবালা দেবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২০শে ভাদ্র শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত 'ঠাকুমার ঝুলি'র 'ভূমিকা' অংশে লিখেছিলেন, "ইতিপূর্বে কোনো কোনো গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে দিয়া আমি রূপকথা লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করয়াছি—কিন্তু হৌক মেয়েলি হাত, তবু বিলাতী কলমের যাদুতে রূপকথার কথাটুকু থাকিলেও সেই রূপটি ঠিক থাকে না; সেই চিরকালের সামগ্রী এখনকার কালের হইয়া উঠে"[৪৯] । ভূমিকাশেষে তাই তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন 'দক্ষিণাবাবুকে', যিনি 'ঠাকুমা'র 'মুখের কথা' কেই 'ছাপার অক্ষরে' প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দীর্ঘ তেইশ বছর পরে একজন মহিলাকেই রূপকথা লেখার অনুরোধ করতে শোনা যায় এহেন রবীন্দ্রনাথকে – "তোমার চিঠির সঙ্গে এক টুকরো রূপকথা পাঠিয়েছো। সম্পূর্ণ করো না কেন? ...যত পারো রূপকথা সংগ্রহ করে একখানা বই যদি বের করো, খুব কাজে লাগবে।"[৫০] চিঠিটি লেখা হয় ১৯৩১ সালের ৫ নভেম্বর, দার্জিলিং থেকে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি হলেন হেমন্তবালা দেবী। বলা বাহুল্য, এই অনুরোধ বা নির্দেশ তিনি উপেক্ষা করেননি। লিখে ফেলেছিলেন 'নতুন রূপকথা'।

অভিজাত গৌরীপুর পরিবারে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা হেমন্তবালা দেবী। অন্যদিকে, নাটোর রাজপরিবারের পুত্রবধূ। তিনি তাঁর জীবনকে দুটি মানদণ্ডে দেখতে চেয়েছিলেন – এক বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন, দুই, রবীন্দ্রনাথের লেখা। যশোধরা বাগচী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "হিন্দু অভিজাত ঘরের গার্হস্থ্যজীবন তাঁকে অবরোধবাসিনী করে রাখতে পারেনি। ... মেয়েদের জীবন যে ছোটো গৃহকর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে আত্মতুষ্টি লাভ করে এবং স্বামী-পুত্র-কন্যার রক্ষণাবেক্ষণই যাঁদের স্বাতন্ত্র্যবোধের সীমারেখা নির্ধারণ করে, হেমন্তবালা দেবী সে শ্রেণির লেখিকা ছিলেন না।"[৫১] হেমন্তবালা অসামান্য ধীশক্তি ও ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী ছিলেন।

তাঁর সমস্ত সৃজনশীল লেখাতেই তার প্রকাশ ঘটেছিল। পারিবারিক সম্পর্ক, মেয়েদের সাংসারিক দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সাবেকি চেতনার আলোতে সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন লেখায়; রবীন্দ্রনাথকে সর্বান্তঃকরণে আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আবার তর্কও করেছেন-- এক সমগ্রতার বোধ তাঁর লেখায় প্রতি পদে প্রকাশিত হয়েছে। রূপকথা সৃজনকালে সেই সৌন্দর্যপ্রিয় সংবেদনশীল মন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একীকৃত হয়ে ধরা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র'-এর নবম খণ্ডের প্রায় পুরোটাই হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠি। এই পত্রবিনিময়ের সূচনা হয়েছিল আকস্মিকভাবেই। হেমন্তবালার বিভিন্ন সময়ে লেখা থেকে জানা যায়, বিবাহোত্তর কালে পারিবারিক অশান্তিতে কাতর হয়ে তিনি সাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরিবারের অমতেই গ্রহণ করেছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম। এবং, এই সময়েই বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করার জন্য হেমন্তবালা বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান', 'শেষের কবিতা', 'সঞ্চয়' পড়তে শুরু করেন ও একদিন আকস্মিকভাবেই একটি চিঠি লিখে ফেলেন। সেই থেকে যোগাযোগ শুরু। প্রাথমিক পর্বে তিনি তাঁর পরিচয় আড়াল করে থাকতেন ছদ্মনাম 'জোনাকি' ও রাশিনাম 'দক্ষবালা'র অন্তরালে। পরে আত্মপরিচয় প্রকাশ পায়।

হেমন্তবালার সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৩২ সালের ৯ জুলাই [২৪ আষাঢ় ১৩৩৮]। হেমন্তবালার ছেলে বাড়ির অগোচরে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। শ্রদ্ধা বা নিবেদন প্রগাঢ় হয়েছিল মূলত পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে। পত্রের মাধ্যমেই হেমন্তবালার বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং সেখানেই হেমন্তবালার সহজ সরল ভাষা রীতির সঙ্গে পরিচিত হন রবীন্দ্রনাথ, যে মুগ্ধতার প্রকাশ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত চিঠিতে। ১৯৩১ সালের ২ জুন তিনি হেমন্তবালাকে লেখেন, "তুমি যে ভাষায় চিঠি লেখ, সেই ভাষায় যদি গল্প লেখ নিশ্চয়ই সেটা উপাদেয় হবে। বাহির হতে গেলেই ঠকবে। তোমার জানা কথা ঘরের কথাকে গল্প বানিয়ে তুললে সাহিত্যে তা আদর পাবে, কেননা তোমার ভাষায় সহজ রস আছে"। (১৬ নং চিঠি) তিনি এ-ও বলেছিলেন যে, "তোমার মধ্যে দেখবার দৃষ্টি,

ভাববার মন, লেখবার কলম ও হৃদয়ের আবেগ একসঙ্গে চলচে। তোমার লেখায় অনায়াসে তুমি রস সঞ্চার করতে পার।"(১৭ নং চিঠি)[৫২]। হেমন্তবালা গুরুর এই নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর রূপকথায় সহজ সরল ভঙ্গিতে এত পরিচিত বিষয়ের উপস্থাপনা হয়েছিল। এই অসীম প্রতিভার অধিকারিনী যে স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও এত বলিষ্ঠ সাবলীল রসবোধসম্পন্ন লেখা লিখে চলেছেন অবলীলায়, এবিষয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন হেমন্তবালার ভাই বীরেন্দ্রকিশোর চৌধুরীর কাছে। দেখতেও চেয়েছিলেন তাঁকে। তাই গুরুদেবের স্নেহমিশ্রিত নির্দেশ বা প্রস্তাবকে মেনে নিয়েই হেমন্তবালা সৃজন করেছিলেন রূপকথা, তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে ।

রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিই যে হেমন্তবালা দেবীর রূপকথা রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা, তা আগেই আলোচিত হয়েছে। সরাসরি রূপকথা সংগ্রহ করে সংকলন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হেমন্তবালা সেই কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু কবির জীবদ্দশায় সেই রূপকথা বই-আকারে প্রকাশিত হতে পারেনি। কবির জীবনাবসানের পর, ১৩৭২ বঙ্গাব্দের কার্তিকে হেমন্তবালা সচিত্র 'নতুন রূপকথা' আদ্যন্ত ছাপা হয়। কিন্তু প্রচারের অভাবে তা প্রকাশিত হতে পারেনি। তিনি গুরুদেবের কথা অনুযায়ী রূপকথা সংগ্রহ করেছিলেন কিনা জানা যায় না, কারণ, সেই বিষয়ে তাঁর নিজের কোনো বক্তব্য নেই এবং পাঠক হিসেবে তাঁর রূপকথার বিষয়-নির্বাচন, চরিত্রায়ণ ও উপস্থাপন-ভঙ্গি — সর্বত্রই মৌলিকতার ভাবনা বলে বোধ হয়েছে। তাঁর লেখা রূপকথার কয়েকটি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় সঞ্চিত ছিল। ১৩৯৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে হেমন্তবালার সুযোগ্যা কন্যা বাসন্তী বাগচী প্রকাশিত ও প্রচারিত 'কিশোর রূপকথা'য় হেমন্তবালার 'নতুন রূপকথা'র কয়েকটি কাহিনি অন্তর্ভুক্ত হয়। রূপকথার পাঠকদের কাছে এইটাই বিশেষ প্রাপ্তি বলে বোধ হয়।

হেমন্তবালার চিঠিতে কবি খুঁজে পেয়েছিলেন, 'বাঙালি মেয়ের অন্তরের সুর'। তাঁর রূপকথাতেও ধ্বনিত হল সেই সুর। একজন মেয়ের বয়ানে সচেতনভাবে মেয়েদের শৈশব-কৈশোর নির্মিত হ'ল কীভাবে, তা তাঁর রচনা অবলম্বনে এবারে বিশ্লেষণ করা হবে।

'রাখালরাজা' গল্প পুরুষ-প্রধান। রাখালের ছেলের ভাগ্যবশে 'রাজা' বনে যাওয়ার কাহিনি। কিন্তু এই গল্পে অপ্রধান নারী চরিত্র চাঁদমণি বুড়ির মেয়ে সোহাগির কথায় আলোচনা শুরু করা যাক। সোহাগি চরিত্র আত্মশক্তিতে ভরপুর। বাঙালি বাড়ির মায়ের চিরাচরিত চিন্তা যখন গ্রাস করে সোহাগির মা চাঁদমণি বুড়িকে, তখন কিন্তু সে অবলীলায় বলে, "আমি চাঁদের মায়া-মাখা চাঁদনী মেয়ে, আমার বাবা ছিলেন চাঁদের দেশের মুরুব্বি—চাঁদও তাঁকে খাতির করত। আমাকে বিয়ে করবে বললেই হ'ল! আমি পণ করেছি কক্ষণো বিয়ে করব না।"[৫৩] শুধু তাই নয়, সাদা খরগোশের পিঠে চেপে চাঁদের দেশে পালিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে সে। একটি বিশেষ বয়সে কিশোরীদের বিবাহমুখী করে তোলার যে সামাজিক চাপ, তাকে অস্বীকার করতেই যেন এই অবাধ্যতা প্রশ্রয় দিয়েছেন হেমন্তবালা।

'সুনয়নী' গল্পে মেয়ে চরিত্রের সেরকম গুরুত্ব না থাকলেও গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রদুটি নায়ক-নায়িকা সুলভ নয়। সুনয়নীর চোখ দুটি টানাটানা, কিন্তু সে 'বোবা, কালা, হাবা, পঙ্গু'। অপরদিকে, তার নায়ক-চরিত্রে ছেলেটি কালো, সারা গায়ে কই মাছের মতো আঁশ। গল্পের শেষ পর্বে সুনয়নী হাত বুলিয়ে জন্মান্ধ ছেলের গায়ের আঁশ খসিয়ে ফেলে। লক্ষণীয়, এই দুজনেই কুৎসিৎ দর্শন ও আপাতভাবে গুণহীন হলেও সুনয়নী বিশেষ গুণসম্পন্না – রাজপুত্রকে নিজগুণে সুদর্শন করে তোলা যার প্রমাণ।

'বিদ্যাধর' গল্প নির্মাণে রাজকন্যার প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। কিন্তু ছুতোর পুত্রকে লক্ষ্যভেদ করতে কোনো অজ্ঞাত উপায়ে সাহায্য করে চলে। সে সাহসী। তাই অদৃশ্য ছুতোর পুত্রের সঙ্গে রহস্যময় কথপোকথনের সময়েও সে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করে চলে। এমনকি, সে হুঙ্কার দিয়েও

বলে, “পরিচয় না দিলে প্রলয়কাণ্ড হবে। পরিচয় দিলে কিছু বলব না, ভয় নেই।”[৫৪] এমনকি, সে এও বলে, চুরি করে ফাঁকি দিয়ে তার ঘরে ঢোকার জন্য তাকে ‘শিক্ষা’ দেওয়া উচিত । এরপর ছুতোরের কৌশলের কাছে রাজকন্যা হার মানে ও ঘটনাচক্রে রাজার সামনে এক শর্তে আবদ্ধ হয় যে, সে ছুতোরকে সাত দিন রেঁধে খাওয়াবে, যার দ্বারা ছুতোরের বল বীর্য্য আয়ু বাড়বে। এই দুই বিপ্রতীপ অবস্থান পাঠকের মনে অস্বস্তি তৈরি করে। কারণ, গল্পের শুরুতে যে মেয়েটির অকুতোভয় আচরণ নারীসুলভ পেলবতাকে অস্বীকার করেছিল, গল্পের শেষ অংশে তার এই চূড়ান্ত মেয়েলি অবস্থান একটি সংশয়কে উস্কে দেয় মেয়েদের চিরাচরিত সামাজিক অবস্থিতিই হয়তো বা চূড়ান্ত সত্য।

হেমন্তবালা দেবী ‘রূপকথা’ লিখলেও তা সবসময় রাজা-রানী বা রাক্ষস-খোক্কসদের গল্প হয়ে দাঁড়ায়নি। দরিদ্রের একমাত্র কন্যা প্রভাবতীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে রচিত হয়েছে ‘প্রভাবতীর স্বপ্ন’ গল্পটি। গরীব ঘরে জন্ম হওয়ার কারণে তার অলঙ্কার জোটেনি — কিন্তু সোনার কঙ্কণের তার সাধ। জেদ প্রকাশ করায় তার দরিদ্র পিতা তাকে মোটা, শক্ত জিলিপি গড়িয়ে দেয় কঙ্কণের মতো। কিন্তু তার সাধ মেটে না। মেয়ের সাধ পূরণ করতে বাবা গৃহত্যাগী হলে মেয়েও মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এই প্রথম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে প্রভাবতী বুঝতে পারে, “...এখানে সে একা। তাকে বাঁচতে হবে।” এরপর পুরো গল্পটাই তার টিঁকে থাকার লড়াই। জলপুরী-জলকুমারী-প্রবালী — একের পর এক প্রতিপক্ষ সামলে সে অবশেষে পৌঁছয় জলদেবীর কাছে। গোলাপের কঙ্কণ পরিয়ে তিনি মাতৃক্রোড়ে টেনে নেন প্রভাবতীকে। তার স্বপ্ন ভেঙে যায়। কিন্তু সে বুঝতে পারে সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান — লোভ ও জেদকে সরিয়ে সৌন্দর্যবোধকে সে সম্মান করতে শেখে। নৈতিকতার পাঠ প্রদানের এই ধরনটি অভিনব। লক্ষণীয়, এই গল্পটি সম্পূর্ণ নারীকেন্দ্রিক। Protagonist ও villain — দুপ্রান্তেই মেয়েরা। কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে এটি আপাতভাবে একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

'পলাশবতী' গল্পে পলাশবতীর আধিপত্য কম। গল্পের প্রায় মধ্যপর্বে চন্দ্রদেবের শাপে ফুলপরীর পলাশবতীতে রূপান্তর ঘটে। কিন্তু প্রাক্-পলাশবতী পর্বে তাকে আমরা ফুলপরীরূপে পাই। এই দুই নারীরই জীবনযাপন বীণাকণ্ঠ-গাধাকে ঘিরে, যে গন্ধর্বরাজের বরে বীণাকণ্ঠী হয়েছিল। লক্ষণীয়, একজন মনুষ্যেতর প্রাণীকে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছে গল্পের নায়িকা — তার রূপের পরিবর্তে গুণে মুগ্ধ হয়ে। দ্বিতীয়ত, তাকে আগলে রেখেছে সমস্ত বিপদ থেকে — সুরসাধনায় যাতে কেউ ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে, শেষত, রাজাকে স্পষ্টভাবে বীণাকণ্ঠের গুণের কথা স্মরণ করিয়ে, গৃহস্থসুলভ আচরণ করে ঘরে-বাইরে সর্বত্র সে নিজের এক দৃঢ় Identity নির্মাণ করেছে। অভিশাপ ও শাপমুক্তি রূপকথাধর্মী গল্পগুলির পৌনঃপুণিক উপাদান (Recurring Factor)। 'গুমরী' গল্পেরও মূল motivational কেন্দ্র ঐ অভিশাপ ও শাপমুক্তি। কিন্তু তা ঘটে গল্পের শেষে।

গল্পের শুরু হয় গুমরীর পরিচয়প্রদানের মাধ্যমে। রানীর ছোট মেয়ে, "গায়ের রঙ বোনেদের চেয়ে ময়লা.... মুখের গড়ন তাদের মত অত সুন্দর নয়। তার উপরে বিদ্যা নেই, গুণপনা নেই, কোনো কাজ শেখার ইচ্ছে পর্যন্ত নেই, তার উপরে এই গোমড়া মুখ, সে মুখে হাসি দেখেনি কেউ"।[৫৫] তাই স্বাভাবিকভাবেই, এ মেয়ে 'জংলী'; কারোর সঙ্গে কথা বলতে না চাওয়া, নিজের 'গুমোর' নিয়ে বাঁচতে চাওয়া মেয়ের নাম নির্ধারিত হয় 'গুম্‌রী'। মেয়েদের 'দেখা'র যে স্বাভাবিক পুরষালি ভঙ্গি, সেই 'দেখা' প্রথমেই আহত হয়। কিন্তু হেমন্তবালা দেবী বহিরঙ্গের সৌন্দর্যের পাশাপাশি একটি মেয়েকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য জোর দেন স্বভাব ও কর্মস্পৃহাকে। গল্পের প্রয়োজনে এই আপাতভাবে বিতৃষ্ণা-উদ্রেককারী মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় চিংড়ি মাছের (প্রকাণ্ড রাক্ষুসে গল্‌দা চিংড়ি)।

বিবাহোত্তর জীবনে গুমরী একজন পতিব্রতা রমণীর মতো আচরণ করে। রাজা চিংড়িকে মারতে উদ্যত হলে সে বাধা দেয়। গুমরীর বাবা রাজা রঘুদেব গুমরীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলে সে অরাজি হয়। চিংড়িকে 'মানুষ' করে নেওয়ার প্রসঙ্গে সে স্মরণ করিয়ে দেয়,

“আপনারা আমাকে ত্যাগ করেছেন, ইনি গ্রহণ করেছেন, আমি এঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না।”[৫৬] এই বক্তব্য পাতিব্রত্যের ঊর্ধ্বে গুমরীর মনুষ্যত্ববোধকে প্রমাণ করে। গুমরীর চরিত্রে একেবারে থিতিয়ে পড়া ‘গুমর’ বা অহংকারের সর্বৈব অবসান ঘটে অভিশপ্ত ব্রাহ্মণের বৈশ্য বণিক দশায় তাদের ঘর পরিষ্কার ও বৈশ্যপত্নীর একটি কাজ করে দেওয়ার মাধ্যমে। শুধু এর দ্বারা গুমোর দূরীভূত হয় তা-ই নয়, ক্ষত্রিয় কন্যা কর্তৃক বৈশ্য দম্পতির কার্যসিদ্ধি এবং শেষাবধি ধনিকের কাছে মাথা নোয়ানোর যে ঘটনা দেখানো হয়, তা একপ্রকার ‘social mobility’-র কথা বলে।

গল্পের শেষে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের প্রেক্ষিতে তার চারিত্রিক পরিবর্তন সূচিত হয়। গুমরীর ‘চার বেদ, চৌষট্টি কলা’ মনে পড়ে যায়—ফলত, সে নিজেকে ‘দেবীর মত সুন্দরী’ হিসেবে আবিষ্কার করে, হয়ে ওঠে ‘গৌরবিনী’। আর, রূপকথার এই ভাষ্যই হেমন্তবালা দেবীকে রূপকথাকার হিসেবে একটি স্বতন্ত্র স্থান করে দেয়। সম্পূর্ণা হয়ে ওঠার জন্য শুধুমাত্র বহিরঙ্গের সৌন্দর্যই নয়, অন্তরের চেতনা তথা শিক্ষা ও বুদ্ধি যে অবশ্য প্রয়োজন, সেই বিষয়টি গল্পের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তোলেন তিনি।

রূপকথার যে গঠন বা কাঠামো, যেখানে রাজপুত্রের অভিযানই দস্তুর, সেখানে ‘মুসুরী সিংহের কথা’ গল্পটির বয়ান বিপরীতধর্মী। কাহিনির রাজকন্যা অনাথিনী। বুড়ো দেওয়ান তার পালকপিতা। প্রথাগত রূপকথায় রাজকন্যারা যেখানে সৌন্দর্যের নামান্তরমাত্র, রূপ যাদের একমাত্র পুঁজি, এই কাহিনিটি সেদিক থেকে বেশ কিছুটা অন্যরকম। রাজকন্যা বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলে তাকে গৃহকর্ম-রান্নাবান্নার পাঠ দেওয়া হতে থাকে স্বাভাবিক নিয়মে। এর পাশাপাশি ‘তিনি’ “লেখাপড়া শিখিলেন। গান বাজনা শিখিলেন, ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করিতে আর তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতে শিখিলেন – পুরুষের বেশ পরিয়া দেওয়ান-দরবার করিতেও শিখিলেন।”[৫৭] নিজের ইচ্ছাশক্তিতে বলীয়ান রাজকন্যা স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের প্রস্তাব খারিজ

করে দেয় 'দেশ ভ্রমণে' যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে এবং একা পুরুষ বেশে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। স্বেচ্ছাবিহার হেমন্তবালার রূপকথায় পুনরাবৃত্ত মোটিফ হিসেবে কাজ করে।

এরপরে বাতাবির মত এক ফলে সে প্রবেশ করে পৌঁছে যায় বিশাল এক প্রাসাদের সপ্তম মহলে। এখানে সাজসজ্জার উপকরণ অতিক্রম করে সে যেখানে পৌঁছে নিজেকে খুঁজে পায়, তা হল এক সাঙ্গীতিক পঠন-পাঠন আবহ। আলমারির সুন্দর মলাট দেওয়া 'বই' তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। মেয়েদের চরিত্রগঠনেও যে বিদ্যাচর্চার ভূমিকা সর্বাধিক, সেই বিষয়টিতে আলোকপাত করতে চান হেমন্তবালা।

গল্পের শেষে সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে রত্ন পালঙ্কে নিদ্রিত মুসুরী সিংহ নামক রাজকুমারের গলায় মালা দিয়ে তাকে শাপমুক্ত করে রাজকন্যা। এখানে রূপকথার Lack: Lack Liquidated theory কার্যকরী হয়েছে মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে। এ যেন উলটপুরাণ! এ কাহিনিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে মেয়েদের অভিযান ও রহস্যভেদ। এসব দিক দিয়েই কাহিনিটি বেশ অন্যরকম। শুধু প্রশ্ন জাগে, গ্রামে বা শহরে ছদ্মবেশ নিয়ে ঘোরার সময় 'পুরুষের সাজ' কি বাধ্যতামূলক, অথবা, দেওয়ান-দরবার করার জন্য 'পুরুষের বেশ' কি প্রয়োজন? এই বর্ণনাটি কি আমাদের মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রক্ষেপ?

'সবুর বাদশার কথা' গল্পটি বহুশ্রুত। সম্ভবত গল্পটি 'বাংলার উপকথা' গ্রন্থেই প্রথম উল্লেখ করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। কিন্তু হেমন্তবালা দেবী গল্পটির মূল কাঠামো এক রেখে আঙ্গিক বদলে দিয়েছেন। গল্পটির নাম বাদ্‌শাহ-সংক্রান্ত হলেও তিনি কোনো এক মেয়ের গল্পই বলবেন — একথা বলা বাহুল্য। এ গল্পেরও কেন্দ্রীয় চরিত্র এক রাজার 'সুন্দরী, সুশিক্ষিতা ও গুণবতী' সাত কন্যার ছোট বোন, ছোট রাজকন্যা।

গল্পের শুরুতে রাজার গর্বিত পিতৃসত্তা কন্যাদের কাছে তারা কার ভাগ্যে খাও জানতে চাইলে ছোট মেয়ে অন্যান্যদের উল্টোপথে হেঁটে বলে "সকলেই আপন আপন ভাগ্যে খাইয়া

থাকে"।[৫৮] পিতৃসত্তার অভিমানী হয় ও ছোট রাজকন্যা বিতাড়িত হয় — বনবাসে পাঠানো হয় তাকে। সেখানে সে তার বৃদ্ধা ধাত্রীর সহযোগিতায় 'অর্থশালিনী' হয়ে ওঠে ও ধীরে ধীরে বাগান-বাড়ি-দাসদাসী-হাতিঘোড়া সব কিছুই সাজিয়ে ফেলে। বোঝা যায়, মেয়েটির স্বাধীনচেতা স্বভাব, তার পরিশ্রম করার ক্ষমতা, সর্বোপরি ইচ্ছাশক্তি তাকে এক নতুন পরিচিতি প্রদান করেছে। এমনকি, মেয়েটি পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবও এক লহমায় খারিজ করে, পিতৃপরিচিতি অতিক্রম করে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে।

ঘটনাক্রমে 'সবুর' বাদ্‌শাহের সঙ্গে রাজকন্যার গান্ধর্ব বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে রাজকন্যা তার দিদিদের ঈর্ষাভাজন হয়ে পড়ে ও একের পর এক 'বাধা'র সম্মুখীন হতে হয় তাকে। এমনকি, দৈবশক্তিসম্পন্ন পাখা অন্তর্হিত করে দিয়ে তারা পাখার মালিক 'সবুর' বাদশাহ্‌কেও বোনের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ছোটকন্যা সব বুঝে দিদিদের বাড়ি পাঠাতে বাধ্য হন এবং ধাত্রী ও অমাত্যের উপর সংসারের ভার দিয়ে 'পুরুষবেশে একাকী ঘোড়ায় চড়ে বাদশাহের উদ্দেশ্যে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।"[৫৯] নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, বাদশাহকে উদ্ধার করলেও তিনি রাজকন্যাকে বিস্মিত হন ও তাকে পদাঘাত করেন। সর্বংসহা রাজকন্যার চোখ এবারে ঝলসে ওঠে এবং বীরদর্পে সে নিজেকে ঘোষণা করে 'স্বামীর জীবন রক্ষয়িত্রী' হিসেবে। বাদশাহের ভুল ভাঙ্গে ও দুজনের মিলন ঘটে। গল্পের শেষে রূপকথার গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী সকলেই সুখে দিন কাটাতে থাকে—তফাৎ দুটি—রাজকন্যা বনের রাজ্য ও শহরের রাজ্য—দুটোই একক হস্তে পরিচালনার ভার নেয় ও তার সন্তানাদিও মায়ের কাছেই বড় হয়। মেয়েদের আপন ভাগ্য জয় করার যে অধিকার সমাজ ছিনিয়ে নিতে চায়, হেমন্তবালার গল্পে তা-ই প্রতিষ্ঠিত হয়।

'নানান্ রঙা ফুল আর নানান্ সুবাস' গল্পে মেয়েদের অবস্থান কিছুটা পৃথক। রাজকন্যার পরিচিত Archetype ভেঙে বেরিয়ে আসার ঘটনা আমরা অপরাপর গল্পে পেয়েছি। এখানে সেইরকম কোনো দৃষ্টান্ত নেই। বরং গল্পটি আবর্তিত হয়েছে এক রাজকুমারের অভিযানকে

কেন্দ্র করেই। কিন্তু রাজপুত্র অসাধ্য-সাধন-অভিযান প্রকল্পে যারা পরপর সাহায্য করেছে তারা প্রত্যেকেই নারী। সুতরাং প্রত্যেকেই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। এই গল্পে এরা প্রত্যেকেই নিজেদের এই ক্ষমতাকে একটি শুভকর্মে প্রয়োগ করেছে। রাক্ষসী মানেই মানুষখেকো, যাদুকর বা পরী হলেই মায়াবিনী – এই Archetype থেকেও বেরিয়ে এসেছে এরা। প্রচলিত নেতিবাচক চরিত্রের খোপে থেকেও ইতিবাচক কাজ করে এক সমান্তরাল রূপকল্প নির্মাণ করতে পেরেছে। এখানেই এই গল্পের স্বাতন্ত্র্য। উল্লেখ্য, পাশাবতী এই গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে যাদু করে সকলকে পাশা খেলায় হারিয়ে ভেড়া বানিয়ে রাখে। রাজপুত্রের ভাইদেরও প্রাথমিক পর্বে সে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিল, পরে রাজপুত্রের অনুরোধে তাদের সে ছেড়ে দেয় ঠিকই, কিন্তু পিঠে দেগে দেয় 'পাশাবতীর নফর'। এই উচ্চারণ নারীর স্বেচ্ছাবিহার এবং পুরুষের প্রতি নারীর এক অন্য রকম ব্যবহার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

হেমন্তবালা দেবীর প্রায় প্রতিটি গল্পেই পুনরাবৃত্ত হয় মেয়েদের বিদ্যাভ্যাস, ইচ্ছাবিহার, শারীরিক ক্ষমতাতেও পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা, বিবাহে মত প্রকাশের স্বাধীনতার মত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর চরিত্রদের দিয়েই তিনি সমাজকে কখনো প্রশ্ন করেছেন, কখনো করেছেন প্রতিবাদ। তাই তাঁর রচিত রূপকথায় সমাজে পুরুষ-নারীর হেজিমনিক্যাল অবস্থান রূপান্তরিত হয়েছে সাম্যবাদী অবস্থানে।

গৌরী ধর্মপাল

সংস্কৃত সাহিত্যে দিক্‌পাল ব্যক্তিত্ব গৌরী ধর্মপাল। বাংলা, সংস্কৃত ও গুজরাটি ভাষায় তাঁর সমান দখল। সংস্কৃতের 'ঈশান স্কলার'। পেশাগত জীবনে এক সফল অধ্যাপিকা। এহেন গৌরী ধর্মপালের সমান্তরাল পরিচিতি শিশুসাহিত্যিক হিসেবে। ছোটোদের জন্য লেখা 'চাঁদনি', 'চোদ্দপিদিম', 'আশ্চর্য কৌটো', 'ইংলে পিংলে' ইত্যাদি অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর চমৎকার রচনাশৈলি পুনর্নির্মাণ করেছে উপনিষদ-ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র; ছোটদেরই জন্য। শিশুসাহিত্যে

তাঁর বিপুল অবদানের কারণে তিনি পেয়েছেন ‘শিরোমণি’ পুরস্কার (১৯৮৫), শিশুসাহিত্য সংসদ প্রদত্ত ‘ভুবনেশ্বরী’ পদক (১৯৮৭) এবং ‘বিদ্যাসাগর পুরস্কার’ (১৯৯১)। যেহেতু আমাদের বর্তমান আলোচনা একান্তভাবেই রূপকধর্মী লেখা-কেন্দ্রিক, সেহেতু, ‘লালমাটি’ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত ‘গৌরী ধর্মপাল রচনা সমগ্র’র প্রথম খণ্ডে সংকলিত রূপকথাধর্মী লেখাগুলিকেই আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তবে প্রসঙ্গত তাঁর সামগ্রিক শিশুসাহিত্য রচনার আবহই বিশ্লেষণ করা হবে।

গৌরী ধর্মপালের স্মৃতিকথা বা স্মৃতিচারণধর্মী একটি লেখা ‘অনঙ্গমোহিনী হোমিও হল’। সেখানে প্রথমেই তিনি বলছেন, ‘বুড়ো আংলা, অ্যালিস, লিটল উইমেন আর ঠাকুমার ঝুলি’ তাঁর শৈশবস্মৃতির ধারক। এরপর থেকে তাঁর বিভিন্ন স্মৃতিচারণায় ফিরে ফিরে এসেছে ‘ঠাকুমার ঝুলি’ বা রূপকথার প্রসঙ্গ। ‘আমার ছেলেবেলা’য় তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর বাবার হাত ধরে নরেন্দ্রদেব-রাধারানী দেবী সম্পাদিত ‘পাঠশালা’ পত্রিকা ও ‘শিশুভারতী’ পত্রিকার সঙ্গে পরিচিতি পর্ব। সেখানেও তিনি পড়েছিলেন ‘ঠাকুমার ঝুলি’ এবং ‘অ্যালিস খুকু’ — এরাই নাকি হয়ে উঠেছিল তাঁর “ছেলেবেলার সই”। বোঝা যায়, রূপকথা শুধু আর বইয়েরর পাতায় আটকে থাকেনি, হয়ে উঠেছিল গৌরী ধর্মপালের জীবনচর্যার ‘সই’, কখনো বা জীবনদর্শন। গৌরী ধর্মপালের লেখায় সহজতা, মায়াময় আবেশের সঙ্গে এক গভীর চেতনার সমন্বয় চোখে পড়ে। ছোটদের লেখাগুলিও তাঁর এই ধাঁচেই গড়া। এই সূত্রে তাঁর সুযোগ্য কন্যা রোহিনী ধর্মপালের লেখা ‘গৌড়বুড়ীর গপ্পো’-এর একটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে — “ছোটোদের লেখার মধ্যে ব্রহ্মচেতনার ছোঁয়া দিয়েছেন এমন নির্ভারে, নির্ভাবনায় যে তাঁর লেখার মাধুর্যে তা জারিয়ে জিভে জল নিয়ে আসে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাই তাঁর লেখায় খুঁজে পেয়েছেন চিরকালের রূপকথার জাদু।”[৬০]

এই ‘চিরকালের রূপকথার জাদু’ গৌরী ধর্মপাল কী কৌশলে আয়ত্ত করেছিলেন, তা আমাদের অজানা। কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট যে, শিশু-কিশোরদের সমগ্র পৃথিবীকে ‘দেখা’র যে

পৃথক একটি ভঙ্গি রয়েছে, তা লেখক খুব ভালো বুঝতে পারতেন; সেই ‘দেখা’র সঙ্গে তাঁর ‘দেখা’ও মিশে গিয়ে প্রতিটি লেখা তাঁর মনের কথা বলে উঠত। সুলেখিকা বাণী বসু তাঁর ‘ছোড়দির কথা’ স্মৃতিচারণায় গৌরী ধর্মপালের শিশু-কিশোর সাহিত্যের মূল ভাবটি প্রকাশ করেছেন এভাবে – “কী করলে খোকা খুকু স্বাভাবিক দয়াদাক্ষিণ্যযুক্ত মানুষ হয়ে উঠবে, কী করলে আমাদের এই বসুন্ধরা তাঁর মানব সম্পদ নিয়ে গর্ব করতে পারবে, কোন্ পথে গেলে সবার খুশি, সবার ভালো, এই ভাবনা তাঁর কাহিনিগুলির তলে তলে বয়ে চলে, ভুল ধরা নেই, জ্ঞান দেওয়া নেই, সমাজ সংসারের কোনো ধুন্ধুমার বিপ্লবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নয়, খুব সহজ স্বাভাবিক স্বরবৃত্তে তিনি এই মানবিকতার ছন্দ চারিয়ে দিয়েছেন সর্বত্র।... তাই তাঁর লেখাগুলি রাজনীতি, সুনীতি, দুর্নীতির সমস্ত অভিসন্ধি খুলে ফেলে শুধু মানবনীতির তোয়াক্কা করে থাকে।”[৬১] এটাই তাঁর লেখার স্বাভাবিক শক্তি।

গৌরী ধর্মপালের ছেলেবেলা যেরকম প্রকৃতি-সান্নিধ্যে এক বর্ণময় পরিবেশে অতিবাহিত হয়েছিল, তিনি সেই ভাবেই আঁকতে চেয়েছেন তাঁর গল্পের ছোট ছোট মেয়েদের শৈশব-কৈশোরও। তাঁর গল্পের কোনো কোনো নায়িকা অসামান্য রূপবতী, কিন্তু তার রূপের অহংকার নেই, তার পরিচিতিও রূপের সৌজন্যে নয়। এই যেমন, ‘চাঁদনি’ গল্পটি। নিরিবিলি পাড়াগাঁয়ের সাধাসিধে শান্ত বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান রূপসী চাঁদনি। চাঁদনি কিন্তু তার রূপ বিষয়ে উদাসীন। বরং, তিনি তার স্নেহময়তা, অতিথিপরায়ণতার দিকে নজর দিয়েছেন। রূপের নয়, লেখিকা প্রশংসা করেছেন তার স্বভাবের – “চাঁদনির ছোঁয়া লাগলে জলের বুক ঠাণ্ডা হয়, আলোর উজলানি বাড়ে, হাওয়া হয় চন্দনধূপের ধোঁয়া, মাছি হয়ে যায় প্রজাপতি, ধুলো হয়ে যায় কেয়া ফুলের রেণু। পোড়া কাঠে ফুল ফোটে, মরা গাঙে বান ডাকে, সাপের খোলস আপনি খসে, ঘুমন্তরা উঠে বসে।”[৬২] চাঁদনির কৈশোর তাই যেন এক positive force হিসেবে প্রতীকায়িত। এহেন চাঁদনির আহ্বানে আকাশের চাঁদ অজান্তেই ধরা পড়ে, অপলক দৃষ্টিতে তারা পরস্পরকে আবিষ্কার করে। এক Romantic প্রতিবেশে গল্প পরিণতি পায়। এক মিষ্টি প্রেমের আধার হয়ে থাকে চাঁদনির ছেলেবেলা।

চাঁদনি গল্পে চাঁদ যেমন ছড়ার লোভে আকাশ থেকে টুপ্ করে নেমে এসেছিল, ‘যমুনাবতীর কাসুন্দী’ গল্পে তেমনই যমুনার মায়ের হাতে তৈরি আমের কাসুন্দীর লোভে নেমে আসে সূর্য – ছোট্ট খোকার রূপে। যমুনা ও সূর্যের নিখাদ বন্ধুত্বের এবং ছোট খোকার প্রতি যমুনার বাৎসল্যের প্রভাবে কাসুন্দি যে কখন ফুরিয়ে যায়, তা টের পায় না যমুনা। সূর্য খুশী হয়ে মানিক্যপ্রসূ গাছ উপহার দেয় যমুনাকে। ছেলেবেলায় দিনযাপন করার কোনো নীতিভাষণ নেই গল্পে। যমুনাবতীর সারল্য পাঠককে স্বাভাবিকভাবেই এই বোধে দীক্ষিত করে।

‘আম-রাজা ও ফাগুনী’ গল্পের মূল চরিত্র রানীর দাসীকন্যা ফাগুনী। সে সর্বগুণসম্পন্না। রানীমাকে গান শোনায়, প্রসাধনে সাহায্য করে, রাজকন্যার মন ভোলায়, রাজপুত্রের আনা পশুপাখির ছানাগুলিকে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করে--‘যেন বনের রানি’; এমনকি, রাজাকে মাথা টিপে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। রাজপরিবারের সবার সেবায় নিয়োজিত হয়েও সে যখন রাজার একমাত্র অধিকারের বিষয় দুধবর্ণ আম খেতে চায়, তখনই সমস্যার সূত্রপাত হয়। দাসীর পক্ষে কোনোমতেই তা চেয়ে আনা সম্ভবপর নয়। তাই শুনে রাজ্যের শেষ বাগানে ছিটাচন্দনের বনের মাঝে গা ডুবিয়ে চুপচাপ আশ্রয় নেয় ফাগুনি। অবুঝ শৈশব অভিমানী হয়, লোভ নয়, চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতায় ফাগুনীর বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। লক্ষণীয়, একটি শৈশবের নিষ্ক্রিয়তা সমগ্র রাজ্যে নেতিবাচক/ অশুভ অবস্থা তৈরি করে – “গাছে বোল ধরল না। ...মায়ের দুলের চুড়োর কলসটি বেঁকে গেল। বনের বৃক্ষ শুকিয়ে গেল। মাঠের ধান পুড়ে গেল। পাখ-পাখালি উড়ে গেল।” অবশেষে রাজা ফাগুনিকে দুধবর্ণ আম পাঠালে তার কথা ফোটে আনন্দে – “এমনি সারা রাজ্যের বাগান ভরে ফুল ফুটে উঠল.... রাজ্যিময় আম গাছে গাছে বোল ধরল। রাজ্যের পাখি এসে বসল ডালে। মরা ধান বেঁচে উঠল। মরা গাঙে বান ডাকল।”[৬৩] ফাগুনির দৌলতে সমগ্র রাজ্যে রোপণ করা হল আমগাছ – রাজার ‘মনোপলি’ ‘প্রজাভোগ্য’ হয়ে উঠল। ফাগুনির শৈশবের ঔদার্য এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

গৌরী ধর্মপালের রূপকধর্মী লেখায় রাজার সংজ্ঞা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ‘আজব কারিগর’ এমনই এক গল্প, যেখানে রাজার পাশাপাশি রাজকন্যার পরিচিতিও বদলে গেছে। এই গল্পে কারিগর হল কেন্দ্রিয় চরিত্র আর তার মেয়ে চন্দনা হল তার সহকারী। এই কারিগর বাস্তবিকই ‘আজব’, কারণ, সে আর তার মেয়ে মিলে সারাদিন ধরে খুটখুট করে আশ্চর্য জিনিস তৈরি করে — প্রজাপতির পাখার ঢাকা, ফড়িঙের জুতো, পিঁপড়েদের নূপুর ইত্যাদি। সে দেশের রাজকন্যারও ‘সাজগোজ’, ‘মুখ-গোঁজ’ ‘আবদার বায়না’ আর ‘ধমকধামক’ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। শাসক শ্রেণির প্রতিভূ হওয়ায় সে অবলীলায় দাবী জানাতে পারে যে, তার কারিগরের হাতে তৈরি গয়না, পোশাক, জুতো, থলি চাই। চন্দনা আর কারিগর আদেশ পালন করে বানিয়ে দেয় রোদ-ঝলমলে শাড়ি, ‘বৃষ্টি-রিমঝিম নূপুর’, ‘বাবুই বাসার থলি’ আর ‘সুড়সুড়ি পাতার ঘণ্টি লাগানো শুঁড় তোলা কাশ-ফুরফুরে জুতো’। চন্দনার এই সৃজনশীল ও পরিশ্রমী কৈশোর বদলে দেয় রাজকন্যার জীবনচর্যা। প্রকৃতির সান্নিধ্যে রাজকন্যার মেয়েবেলার পুনর্নির্মাণ ঘটে। রাজা নেমে আসেন মাটির কাছাকাছি — রাজকন্যা হয়ে ওঠে বাবার সহকারী। গল্পের শেষে লেখিকা দেখান এক সাম্যাবস্থা — রাজা ও রাজকন্যা সেখানে চন্দনা ও কারিগরের সঙ্গে বসে নতুন সৃষ্টিশীলতায় মাতে, নবনির্মিত জিনিস পৌঁছেও দেয় সকলের বাড়ি বাড়ি। বিত্ত ও প্রতিপত্তি-নিয়ন্ত্রিত কৈশোরকে ঔদার্য ও পরিশ্রম-নিয়ন্ত্রিত কৈশোর দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজচিত্র নির্মাণ করেন লেখিকা।

গৌরী ধর্মপালের রূপকথাধর্মী লেখার দ্বিতীয় পর্বের নাম ‘আশ্চর্য কৌটো’। এই পর্বের একটি গল্প ‘ময়নামতী’। নরম স্বভাবের মেয়ে এই ময়নামতী, যে মায়ের একমাত্র সঙ্গী; মায়ের কাঁথা সেলাইয়ের সময় সে পাড় থেকে সুতো তুলে দেয়, সন্ধেবেলা মায়ের ছুঁচে সুতো পরিয়ে দেয়। এই নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে সমস্যা শুরু হয় মায়ের ছুঁচ হারিয়ে গেলে। দেখা যায়, সমস্ত গ্রামবাসী তাদের দ্বারা উপকৃত হলেও প্রাথমিকভাবে তারা ময়নামতীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। ময়নামতী গোবেচারা, সরল, ভীত হওয়ায় প্রতিবাদ করতে পারে না। কিন্তু তার সততার কাছে হার মানে সকলে। সেদিন থেকে রোজ ময়নাদের বাড়িতে জেলে মাছ দিয়ে যায়,

দুধ দিয়ে যায় গয়লা আর গদাইবুড়ি দেয় খইমুড়ি । ময়না আর ময়নার মায়ের তৈরি করা কাঁথা মুড়ি দিয়ে গ্রামের মানুষ জীবনযাপন করে। এক পরস্পর-নির্ভরশীল সমাজের ছবি আঁকেন লেখক, যার কেন্দ্রে থাকে একরত্তি ময়নামতী।

গৌরী ধর্মপালের লেখায় নীতিভাষণ নেই। কিন্তু সুষমাসম্পন্ন শৈশব-কৈশোরের ছবি তিনি লিখে চলেন। আত্মসচেতনতা বা আত্মনির্ভরশীলতা তাঁর কাঙ্ক্ষিত মেয়েবেলার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তাই বারবার তাঁর চরিত্রদের চিত্রাঙ্কনে সেই সুষমা ফিরে ফিরে আসে। হতদরিদ্র পরিবারের তাঁতি আর তাঁত বৌ কাপড় বিক্রি করতে বেশ কিছুদিনের জন্য ঘরছাড়া হলে 'গাগুনি' নামের 'ছোট্ট মেয়েটি' খেলতে না পেয়ে, মা-বাবাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাড়ির 'চরকা'টি অভিমান করেই গাগুনিকে জানায় তার প্রতি অবহেলার কথা—যেন গাগুনির চরকাকে personify করা হয়। গাগুনি তখন চরকা পরিষ্কার করে চোখ মুছে সুতো কাটতে বসে — ক্রমে সে একমাসের কাজ এক এক দিনে করে ফেলতে শুরু করে। 'গাগুনির চরকা' গল্পটির শেষেও দেখা যায় গাগুনি-চরকার বন্ধুত্বের সূত্র। স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার মধ্যে যে সর্বাঙ্গীণ প্রশান্তি রয়েছে, তা প্রকাশিত হয় গাগুনির ছেলেবেলার মাধ্যমে।

'ছেলেবেলা' থেকে 'মেয়েবেলা'-তে সরে আসা এই আলোচনার ক্ষেত্রে খুব একটা তাত্ত্বিক প্রয়োজনে নয় — নিতান্তই একটা ইচ্ছে এই নাম-বদলের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল। তবে আমাদের সমাজ বহুযুগ আগে থেকেই 'ছেলেবেলা' ও 'মেয়েবেলা'কে আলাদা দৃষ্টিতেই দেখত। শুধু নামদুটি ছিল না। এরপরে যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দৃষ্টিকোণ বদলেছে, কিন্তু সময় অনুযায়ী উক্ত পার্থক্যের ধরন বদলেছে শুধু, আদতে এই দুটি অবস্থাই যে 'শৈশব' বা 'কৈশোর' এই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অবস্থাকে প্রকাশ করে, তা সমাজ এখনও সম্ভবত বোঝেনি। তাই পুতুল-খেলা নির্দিষ্ট হয় মেয়েদের খেলা হিসেবে আর ছেলেদের জন্য বরাদ্দ হয় ঘুড়ি-ওড়ানো।

‘ফুল্লরার পুতুল’ গল্পে গৌরী ধর্মপাল এই প্রচলিত social conduct ভেঙে দিয়েছেন। দরজির আদুরে মেয়ে ফুল্লরাও পুতুল-প্রিয় মানুষ। কিন্তু কোনো এক বিকেলে এই ফুল্লরার চোখ যায় ছেলেদের ঘুড়ির দিকে। অন্যদিকে, ছেলেরাও চোঁখ-ধাঁধানো সাজ পরানো ফুল্লরার পুতুলে আকৃষ্ট হয়। আর এই সুযোগে লেখক তাদের মুখে বসিয়ে দেন সেই সংলাপ – “ফুল্লরা বললে, আমায় একটু ঘুড়ি ওড়াতে দিবি ভাই?... ছেলেরা বললে, নিশ্চয় দেব। তোর ওই পুতুলগুলো কিন্তু আমাদের একটু খেলতে দিতে হবে”[৬৪] – সাধারণ সংলাপ, কিন্তু অচেনা। ফুল্লরা স্বপ্ন দেখে পুতুলদের নিয়ে সে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, এমনকি, একটা কাগজের পুতুল কোমরে সুতো বেঁধে নিজেই উড়ে যায় ঘুড়ির মত। বোঝা যায়, এটা শুধুই স্বপ্ন নয়, ‘ছেলেবেলা’ ও ‘মেয়েবেলা’র প্রত্যাশিত সমাপতন।

গৌরী ধর্মপালের লেখায় মেয়েদের কথা খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে; তাঁর রূপকথাধর্মী লেখার মেয়েরা সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে উপেক্ষিতার প্রতিভূ হিসেবেও নয়, আবার পুরুষবিদ্বেষী প্রতিবাদী শক্তির প্রতিনিধি হিসেবেও নয় – মানবনীতির ধারক ও বাহক হিসেবে তারা এসেছে। পরিসংখ্যানের বিচারে পঞ্চতন্ত্র, উপনিষদ, ঈশপ বা পশুকথাধর্মী লেখাগুলি বাদ দিয়ে গল্পের মূল চরিত্র হিসেবে মেয়েদেরই আধিক্য। তাঁর ‘দুর্ভেদ্য ও অভেদ্য-র কাণ্ড’ গল্পে ‘উকুন খুকী চুলবুলি’ একদিন অবাক হয়ে তার মা-কে বলেছিল, “তুমি কি হালের খবর কিচুই রাকো না মা? ছেলেতে মেয়েতে আজকাল কোনো তপাৎ আচে নাকি?”[৬৫] এই স্বাভাবিকতাই তাঁর গল্পে প্রকাশিত ।

নবনীতা দেবসেন

আমাদের এই পর্বের আলোচনা শেষ করা হবে নবনীতা দেবসেনের লেখা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বইটির নাম ‘ইচ্ছামতী’। বিভিন্ন সময়ে ‘সন্দেশ’, ‘আনন্দমেলা’, ‘শুকতারা’, ‘রোপণ’-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত ছোটদের নিয়ে নবনীতার লেখার সংকলন। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে এর প্রথম প্রকাশ। ২০১০, এপ্রিলে দ্বিতীয় মুদ্রণ। এই বইয়ে জায়গা করে নেওয়া সাতাশটি গল্পের

একটি স্কটিশ, একটি রুশ এবং দুটি আইরিশ উপকথা অবলম্বনে রচিত। একটি গল্পের কিয়দংশে রয়েছে রাজস্থানী লোককথার প্রভাব।

'ইচ্ছামতী'র গল্পগুলো মূলত রূপকথা। নবনীতার গল্পেও কিন্তু রাজা, রানী, রাজকন্যা, রাজপুত্র, দত্যি-দানো, রাক্ষস-পরী-জিন — সবাই আছে। তবু তারা আলাদা। গল্পের কাঠামো নির্মাণেও নবনীতা অভিনব। রূপকথা তো আদতে গল্প-বলা। তাই নবনীতাও গল্প বলেছেন। তবে সবসময় তার কথক মহিলারা নন, 'জোছনাবুড়ি আর বুবাই' গল্পে মা'র বদলে গল্প শুনিয়েছেন বাবা।

নবনীতার কোনো কোনো গল্পে সরলরৈখিক গতি বজায় রাখা সম্ভব হয় না। একটি বাস্তব জগৎ এবং তার পরেরটি কল্পজগৎ — এভাবে এগোয় গল্পের বুনোট। কখনো কখনো ব্যবহৃত হয় গল্পের ভিতরে গল্প বলার কৌশল। যেমন, 'কাটুরকুটুর পদ্মমুখী আর কাঠুরে কত্তা' বা 'তাতাই আর বাবুই'। কখনো আবার নবনীতা গল্পের মধ্যে বা শেষে ছড়া লেখেন। তবে রূপকথার মিলনান্তক পরিণতির কোনো রদবদল কিন্তু কখনই ঘটাতে চান না তিনি। এব্যাপারে তিনি আদ্যন্ত সনাতনপন্থী।

নবনীতা প্রথমত চরিত্রের নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব আমদানি করেন। অবলীলায় তাঁর রাজপুত্র হয়ে যায় 'বুম্বা', 'গব্বর সিং'-এর মতো ডাকাতরা হয় 'ধ্যান সিং', 'চম্বল সিং', ডাইনিবুড়ি নাম হয় 'বাবা-য়াগা'! নবনীতার রাজকুমারীরাও সেকেলে নয়, নাম তাদের 'রূপসা', 'ইচ্ছামতী', 'নীলমণিয়া', 'শ্রীময়ী', 'ঊষসী'। নবনীতার রূপকথার চরিত্ররা কথায়-কথায় বলে 'থ্যাংক-ইউ', 'হোম টাস্ক', 'মনুমেন্ট', 'ব্লাড প্রেশার'-এর মতো বিদেশি শব্দ। এভাবেই তাঁর গল্পগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে স্বচ্ছন্দে। নবনীতার রূপকথা সমকালকে ছুঁয়ে থাকে। আপাত অসম্ভাব্যতার মধ্যে দিয়ে কোনো কোনো গল্পে নবনীতা নির্মাণ করেন এক সম্ভবপরতায় পরিপূর্ণ সমাজ।

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও নবনীতা অভিনবত্বের দাবীদার। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, নবনীতার গল্পগুলিতে রাক্ষস-দৈত্য-ডাইনি-জিন — এবং সবাই থাকলেও কেউই তাদের প্রচলিত পরিচিতি নিয়ে হাজির হয়নি। 'মরিচকলি' গ্রন্থে পালক পিতা 'জন' নানা অ-লৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করলেও তার মধ্যে পিতৃত্বের প্রতিটি দিকই প্রবলভাবে ধরা দেয়। মেয়ের টানে তাই বারো বছর পরেও সে যায় রাজবাড়িতে। মেয়ে-জামাই-নাতিকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে যায়। 'বুম্বা আর রাক্ষসমশাই' গল্পে রাক্ষসের শখ বাগান করা। সে হিংসুটে নয়, বরং বন্ধুবৎসল। বুম্বাকে সে অভিবাদন জানায় 'প্রতি-নমস্কারে'! বুম্বার মা-কে চাকরানি করে রাখার সম্ভাবনায় রাক্ষস 'ঝরঝরিয়ে কেঁদে' ফেলে। চিরকালের মাতৃহারা রাক্ষস-ও এক নিশ্চিন্ত আশ্রয় খোঁজে। এভাবেই নবনীতা রাক্ষস-দত্যির হিংস্রতার মাত্রা অনেকটাই কমিয়ে আনেন, তাদের চরিত্রে সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন 'মন', যা এর আগেকার রূপকথায় আমরা বিশেষ পাইনি। এর থেকেই বোঝা যায়, স্বেচ্ছায় নবনীতা সরে আসছেন বীভৎসতার ক্ষেত্র থেকে। তিনি এখানে অনেক বেশী কোমল। তাই দয়ালু রাজা কাউকে শূলে দেন না, রাজা কোটাল রাখেন না। ইচ্ছামতীর মা বুকের ছোরা ফেলে দিয়ে ভালোবাসায় জয় করতে চায় অচেনা পৃথিবী। ঊষসীর সৎ-মাকে হেঁটোয় কাঁটা দিয়ে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় না। ছেড়ে দিয়ে আসা হয় মরুভূমির প্রান্তে। কষ্ট পেয়ে তার স্বভাব শুধরে গেলেই সে বাড়ি ফিরে আসবে, এই আশাবাদ ঘিরে থাকে গল্পকে। অর্থাৎ, নবনীতা শিশুমনে কখনই প্রতিশোধ, প্রতিহিংসার ছবি তৈরি করতে চান না, তাই তাঁর গল্পে আমরা দেখি শাস্তি আছে; মৃত্যু নেই, হিংসা আছে; হত্যা নেই।

গল্পগুলিতে নানা ধরনের নারীচরিত্রের অবস্থান। তাদের কেউ রানী, কেউ রাজকন্যে, কেউ গরীব চাষীর মেয়ে, কেউ বা পণ্ডিতকন্যা। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই মিল একটি। এরা প্রত্যেকেই যত্নশীল, স্নেহশীল, আবার বেপরোয়া, সাহসী। এই নারীদের প্রত্যেকেই অভিযানে বেরোয়। বোবা ইচ্ছামতীর মুখে কথা ফোটাতে বেপরোয়া রানী অভিযানে যায়, পরি-রাজপুত্র রূপকুমারকে মুক্ত করতে দৃপ্ত রূপসা নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে, কাঠুরে

বাবাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহসী পদ্মমুখী, রাজকুমার বৃষস্কন্ধ-এর মুক্তি থেকে শুরু করে রাজ্যচালনা — সব কিছুরই দায়িত্ব নেয় বিচক্ষণ শ্রীময়ী, বৃদ্ধ পিতা পণ্ডিতকে ভয়ানক প্রাণীদের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করে বুদ্ধিমতী সুলক্ষণা, পরিরাণীর চক্রান্ত থেকে ভাইদের উদ্ধার করতে নিরলস পরিশ্রম করে চলে ঊষসী, রাজকুমারকে বাঁচাতে নিজের মেয়েকে অবলীলায় বলি দেয় সৎ নতুন রানী। মেয়েদের অভিযান বিষয়ে নবনীতা এভাবেই দুঃসাহসিক পরিস্থিতি নির্মাণ করেন।

নবনীতার মেয়েরা শুধুই গৃহকর্ম নিপুণা বা বাইরের কাজে দড়, তা-ই নয়, তারা রীতিমত শিক্ষিতা। তাই তো পদ্মমুখী কাজে লক্ষ্মী, রূপে-গুণে সরস্বতী। মায়ের সঙ্গে সারাদিন কাজ করার পর সে "সন্ধেবেলায় প্রদীপের আলোতে দুলে দুলে নামতা পড়ে, বর্ণপরিচয় পড়ে।"[৬৬] ধীবরকন্যা পদ্মকুঁড়ি-ও পহ্লবীরাজকে দেখিয়ে দেয় সে একাধারে "নৃত্যগীতপটিয়সী আর কাব্যরসপিপাসুও বটে।" তাই তো 'ডিম্ববতী' গল্পের শেষে নবনীতা বলেন, "একজন ডিম্ববতী, আর চক্ষুষ্মান।/ গুনের ওজনে তারা সমান সমান।"[৬৭] আর এই কারণেই সুলক্ষণা-কে তিনি চিহ্নিত করেন 'পণ্ডিতানী' হিসেব, আর চাষীর তিন মেয়ে শরৎশশী, কিরণশশী ও শশীবালাকে তৈরি করেন এমনভাবে, যাতে তারা বৃদ্ধ চাষী ও চাষীবউয়ের যাবতীয় অভাব-অনটন দূর করতে পারে।

নবনীতার এই গল্পগুলিতে নারীবাদী স্বর যে কতটা প্রকট, তা তিনটি গল্পের মাধ্যমেই দিব্যি প্রকাশ পায়। 'জোছনাবুড়ি আর বুবাই' গল্পটি শুরুই হয় অফিসের কাজে বুবাই-এর মায়ের দিল্লি যাওয়ার প্রসঙ্গে। ফলত বুবাই-কে গল্প শোনান তার বাবা। পাঠকের প্রচলিত সংস্কার প্রথমেই আহত হয়। এরপর 'নীলমনিয়া' গল্পটি। শঙ্কিনী রাজকুমারীর (সর্পকন্যা) সঙ্গে নকুলকুমারের (বেজি) বিয়ের পরে প্রতি পূর্ণিমার রাতে শঙ্খিনী বেরিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায় 'চড়ুইভাতি' করতে। আমরা অবাক হই, যখন দেখি, শঙ্খিনী নকুলকুমারকে তার এই যাওয়ার কথা জানায় 'সিদ্ধান্ত' হিসেবে, 'আবেদন' হিসেবে নয়। 'দয়ালু রাজা' গল্পের রাজা আবার

রানীদের পর্দানসীন করে রাখার পক্ষপাতী নন। তাই তিনি রাজপ্রাসাদে রাজসভায় তাঁর পাশে তিনটি সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করেন তাঁদের। নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের ধারণা প্রকাশ পায় তাঁর এহেন আচরণে। তবু কিন্তু এই মেয়েরা নারীবাদী আস্ফালনে নিজেদের ব্যাপৃত রাখে না। তাদের মন-এর আরেকটা অংশ ঠিক ব্যস্ত থাকে মা-এর, স্ত্রী-এর, পুত্রবধূর ভূমিকা পালন করতে। অর্থাৎ এই গল্পগুলিতে রূঢ় নারীবাদ নয়, নারীদের কিছু প্রাথমিক দাবীদাওয়া/ চাহিদার কথা তুলে ধরা হয়। মেয়েরা মায়েদের যথার্থ সঙ্গী হতে পারে — এই ভাবনায় গল্পগুলির মায়েরা ভগবানের কাছে একটি কন্যাসন্তানের প্রার্থনা জানায়। প্রচলিত রূপকথায় নারীদের প্রথম থেকেই এতটা গুরুত্ব দেওয়ার ঘটনা নিতান্ত বিরল। সেদিক দিয়ে এই গল্পগুলি নিঃসন্দেহে আধুনিকতার এবং সাহসিকতার দাবীদার। 'নীলমনিয়া' গল্পে যখন শঙ্খিনী ও নকুলকুমার নিজেদের সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে মানুষ হয়ে ঘর বাঁধতে চায়, এক হতে চায় তাদের কন্যাসন্তান নীলমণিয়ার দিকে চেয়ে, তখন মনে হয় গল্পগুলির স্থান আরও উপরে, কারণ তা নারীবাদকে ছাপিয়ে মানবতাবাদের ঘোষণা করে।

বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক রূপকথার জগৎ এত বিস্তৃত যে, এই সীমিত পরিসরে সমস্ত লেখা বিশ্লেষণ বা তার প্রবণতাগুলিও উল্লেখ করা সম্ভব হয়না। তবু আমরা লক্ষ করি, আধুনিক কালের রূপকথায় মেয়েদের অস্তিত্ব সানন্দে স্বীকৃত হয়ে চলেছে। এ যুগের বীর্যশুল্কা রাজকন্যাদের চাহিদা তার 'মনোবীণা'য় ঝঙ্কার তুলতে সমর্থ রাজপুত্রের বা কাব্য করতে জানা পুরুষের। কন্যাসন্তানই যে পালনীয়, তা বলা হয়েছে 'আস্তপাহাড়ে মানুষের মেয়ে' গল্পে। জলপরীরা ত্যাগ করেছে রাজাকে—রাণীর শাসন তাদের অনেক বেশি কাম্য।[৬৮]

এভাবে আমরা দেখি, রূপকথার পরতে পরতে ঘটে চলেছে বিপুল পরিবর্তন। Maria Edgeworth-এর নারীবাদী তত্ত্বপ্রসূত বিশ্লেষণে 'Objects of Desire' হিসেবে প্রাচীন রূপকথার রাজকন্যাদের নির্দেশ করা যেতে পারে, আর, নতুন যুগের রাজকন্যাদের বলা যেতে পারে, 'Desiring Subjects'। নারীবাদী সমালোচক Elaine Showalter বলেন,

> "Gynocriticism is a criticism that attends to the woman as producer of textual meaning, with the history, themes, genres, and structures of literature by women"[৬৯]।

এই বক্তব্যের ভিত্তিতে পড়ে নেওয়া যায় পূর্বকথিত লেখিকাদের রচনা। হয়তো বা মহিলাদের কলমে লিখিত বলেই আধুনিক রাজকন্যারা এতো সাবলীল। মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণের ধরনও তাই বদলে যায় এতো সহজে। তবে এর বাইরে পুরুষের কণ্ঠে যে নারীবাদী স্বর ধ্বনিত হয়নি তা বলা উচিত নয়, তবে তা অন্যত্র বিশদে আলোচনাযোগ্য।

তথ্যসূত্র ::

১। ড. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, 'বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', কলকাতা, আকাদেমি অব ফোকলোর, পুস্তক বিপণি, ২০০৪, পৃ. ৫১

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য'

৩। পল্লব সেনগুপ্ত, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০২, পৃ. ১১৮

৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য'

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সাহিত্যতত্ত্ব", 'সাহিত্যের পথে', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী:দ্বাদশ খণ্ড', কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃ. ৪৭৪

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৪১২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৯-১০

৭। তদেব, পৃ-১০

৮। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উৎসর্গ, 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯-১০

৯। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "কলাবতী রাজকন্যা", 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬

১০। তদেব, পৃ. ৪৫

১১। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা), 'মনুসংহিতা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৪৮

১২। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার,"ঘুমন্ত পুরী", 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬

১৩। তদেব, পৃ. ৫৯

১৪। সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'এয়োতি এবং', কলকাতা, ক্যাম্প, ২০০৪, পৃ-১০

১৫। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা" , 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১২ বঙ্গাব্দ,পৃ. ৬৫-৬৬

১৬। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "শীত বসন্ত", 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৪

১৭। তদেব, পৃ. ৮৫

১৮। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "কিরণমালা", 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০১

১৯। তদেব, পৃ. ১০৮

২০। তদেব, পৃ. ১১২

২১। ড. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, 'বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', কলকাতা, আকাদেমি অব ফোকলোর, পুস্তক বিপণি, ২০০৪, পৃ. ৫৪

২২। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রথম খণ্ড', ১১৭:৭, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ২০১০

২৩। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "সোনার কাটি রূপার কাটি", 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭১

২৪। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "সুখু আর দুখু", 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৮

২৫। তদেব, পৃ. ১৯০

২৬। তদেব, পৃ. ১৯৩

২৭। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ভূমিকা, 'ঠাকুরদাদার ঝুলি, বঙ্গোপন্যাস', চতুর্দ্দশ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২০

২৮। তদেব, পৃ. ১২

২৯। তদেব, পৃ. ১৭

৩০। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "মধুমালা", 'ঠাকুরদাদার ঝুলি, বঙ্গোপন্যাস', চতর্দ্দশ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৬৩

৩১। তদেব, পৃ. ৬৮

৩২। "গান্ধর্ব বিয়েতে গুরুজনের অনুমতি বা সমর্থনের অপেক্ষা না রেখেই পরস্পরকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়, এবং বলে, তারা এখন থেকে স্বামী-স্ত্রী। এ বিয়ে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত বৈধ, ও সমাজে স্বীকৃত"।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'বিবাহ প্রসঙ্গে', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৫, পৃ. ১১

৩৩। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "মধুমালা", 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', বঙ্গোপন্যাস, চতর্দ্দশ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৯৭

৩৪। "সংস্কৃতে 'ভৃত্য' শব্দ নিষ্পন্ন 'ভৃ' ধাতর উত্তরে 'ক্যপ্' প্রত্যয় দিয়ে, 'ভার্যা' হয় ভৃ-ধাতুতে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় দিয়ে। অর্থ একই, ভরণীয়। ....অন্নবস্ত্রের জন্য বধূ স্বামীর ওপরে নির্ভরশীল, তাই দাসী-ভৃত্যের মতোই ভরণীয়া ভার্যা, তাকে খাওয়াতে হবে"।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'বিবাহ প্রসঙ্গে', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৫, পৃ. ২৬

৩৫। সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'প্রবন্ধ সংগ্রহ-১', কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৪, পৃ. ১৪৪

৩৬। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "মধুমালা", 'ঠাকুরদাদার ঝুলি, বঙ্গোপন্যাস', চতুর্দ্দশ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ১১০

৩৭। তদেব, পৃ. ১২২

৩৮। তদেব, পৃ. ১৪৯

৩৯। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "মালঞ্চমালা", 'ঠাকুরদাদার ঝুলি, বঙ্গোপন্যাস', চতর্দ্দশ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ১৭৮

৪০। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, "কাঞ্চনমালা" , 'ঠাকুরদাদার ঝুলি, বঙ্গোপন্যাস', চতুর্দ্দশ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২৫৮

৪১। তদেব, পৃ.২৫৮

৪২। তদেব, পৃ.২৬২

৪৩। A.K Ramanujan, 'Towards a counter system: Women's Tales', Ed. By Vinay Dharwadker, *The Collected essays of A. K Ramanujan*, New Delhi, Oxford University Press, 1999, page. 429

৪৪। অমৃতা দাশগুপ্ত, "ঠাকুরদাদার ঝুলি: ভূমিকা একটি লিখিত প্রস্তাব এবং কয়েকটি অলিখিত প্রশ্ন", মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় ও অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'নহি সামান্যা নারী', কলকাতা, সেতু, ২০১৮, পৃ. ২৯৫

৪৫। সীতা দেবী ও শান্তা দেবী, 'হিন্দুস্থানী উপকথা', কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

৪৬। তদেব, পৃ. ৩১

৪৭। তদেব, পৃ. ৪১

৪৮। তদেব, পৃ. ৮৫

৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, 'ঠাকুমার ঝুলি বাঙ্গালার রূপকথা', পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৪১২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ১১

৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র নবম খন্ড', কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৫-১১৬

৫১। যশোধরা বাগচী, 'নারীর অধিকার ও নারীর সমস্যা', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১২, পৃ. ৩৪

৫২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র নবম খন্ড', কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫

৫৩। হেমন্তবালা দেবী, 'নতুন রূপকথা', কলকাতা, এবং মুশায়েরা, ২০১১, পৃ. ১৭

৫৪। তদেব, পৃ. ৬০

৫৫। তদেব, পৃ. ১১৩

৫৬। তদেব, পৃ. ১১৭

৫৭। তদেব, পৃ. ১২১

৫৮। তদেব, পৃ. ১২৫

৫৯। তদেব, পৃ. ১৩৪

৬০। রোহিণী ধর্মপাল, "গৌড়বুড়ির গপ্পো", বাণী বসু ও রোহিণী ধর্মপাল সম্পাদিত, 'গৌরী ধর্মপাল, রচনাসমগ্র-১', কলকাতা, লালমাটি, ২০১৭

৬১। বাণী বসু, "ছোড়দির কথা", বাণী বসু ও রোহিণী ধর্মপাল সম্পাদিত, 'গৌরী ধর্মপাল, রচনাসমগ্র-১', কলকাতা, লালমাটি, ২০০৭"

৬২। তদেব, পৃ. ২২২

৬৩। তদেব, পৃ. ২৪১

৬৪। তদেব, পৃ. ৩০৬

৬৫। তদেব, পৃ. ৪৫৩

৬৬। নবনীতা দেবসেন, 'ইচ্ছামতী', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০, পৃ. ২৭

৬৭। তদেব, পৃ. ৯৫

৬৮। এই গল্পগুলির উৎস:

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্র সরকার সম্পাদিত, 'বাংলার রূপকথা', কলকাতা, পুনশ্চ,২০১৪

৬৯। Lissa Paul, 'From Sex-Role Stereotyping to Subjectivity: Feminist Criticism', Peter Hunt ed, *Understanding Children's Literature*, London and New York, Routledge, 2002, pg. 115

পঞ্চম অধ্যায়

অভিযান কাহিনি ও অন্যান্য ধারার গল্পে মেয়েরা

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা অভিযান কাহিনি বা অ্যাডভেঞ্চারধর্মী কাহিনি। প্রায় একইরকম জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনিগুলি। আমরা এই অধ্যায়ে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্তর্গত অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্য-গোয়েন্দা গল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করব এবং দেখাতে চাইব, এই কাহিনিগুলিতে মেয়েদের অবস্থান বা ভূমিকা ঠিক কীরকম ভাবে উপস্থাপিত।

প্রথমেই আমরা দেখে নেব, 'অ্যাডভেঞ্চার' বলতে কী বোঝানো হয়। Collins Cobuild 'Essential English Dictionary'-তে 'Adventure' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে— "An adventure is a series of events that you become involved in that are unusual, exciting and rather dangerous."[১]। সুতরাং, বাঁধা গতের বাইরে নতুন ধরনের উদ্দীপনামূলক কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়াই হল অ্যাডভেঞ্চার। এই কাজ কখনো কখনো বিপজ্জনকও বটে। 'Encyclopedia of Adventure Fiction' – এর ভূমিকায় সমালোচক Don D'Ammassa বলছেন:

> "An adventure is an event or series of events that happens outside the course of the protagonist's ordinary life, usually accompanied by danger, often by physical action. Adventure stories almost always move quickly, and the pace of the plot is at least as important as characterization, setting and other elements of a creative work"[২]

তবে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির বিপ্রতীপে এই 'নেশা'র অবস্থান। তাই 'অ্যাডভেঞ্চার' একধরনের রোম্যান্টিকতার সূচক বা চিহ্নও বটে।

পাশ্চাত্যের কিশোর-সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সূত্রপাত ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। Johann David Wyss-এর 'The Swiss Family Robinson' (১৮১২), Frederick Marryat-এর 'The Children of the New Forest' (১৮৪৭), Harriet Martineau-এর 'The Peasant and the Prince' (১৮৫৬) হল তার উদাহরণ। ভিক্টোরিয়ান

যুগে এই সংরূপটির উদ্ভব ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে যুক্ত হয় ঐতিহাসিক মাত্রা। আধুনিক যুগে- বিশ শতকে- বহু বিতর্কিত সাম্প্রতিক বিষয়ও অ্যাডভেঞ্চার উপাদান হয়ে উঠেছে।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস' বইয়ের 'শাদা মানুষের দায় ও কালো মানুষের দায়িত্ব' এই অধ্যায়ে উনিশ শতকে ইউরোপে কীভাবে এবং কেন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সূত্রপাত হয়েছিল বা হওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল, তার একটি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি এনেছেন ম্যাথু আর্নল্ড ও তাঁর লেখা 'Culture And Anarchy' (১৮৬৯) বইটির কথা, যেখানে আর্নল্ড সমাজের নৈরাজ্য ও অরাজকতা সামাল দেওয়ার জন্য যথার্থ সংস্কৃতমনস্ক মধ্যবিত্ত শ্রেণির জয়গান গেয়েছেন। ম্যাথু আর্নল্ড-এর মতে, "নিজের শ্রেণী-পরিধির বাইরে যে বেরিয়ে এসেছে, সমষ্টির প্রয়োজনে বা রাষ্ট্রের স্বার্থে নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে যে বিসর্জন দিয়েছে, সে-ই আদর্শ। তার কাছে রাষ্ট্র হল সমাজ-সংহতির শ্রেষ্ঠ আধার। তাই রাষ্ট্রের জন্য নিজেকে যে উৎসর্গ করে, কেবল সে-ই প্রাত্যহিক সত্তার তুচ্ছতা ছাড়িয়ে এক উন্নত স্তরে পৌঁছায়। অব্যবহিত সম্পর্কের ব্যূহজাল কেটে যে বেরোয়, সে-ই সঠিক অর্থে 'সাত্ত্বিক', 'নির্লিপ্ত', 'সংস্কৃতিসম্পন্ন', অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষদের সার-অসারের ভেদটা চিনিয়ে দেওয়ার যোগ্যতা কেবল তারই আছে"[৩]।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবে ও সাহিত্যে ম্যাথু আর্নল্ড প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের প্রতিভূ মানুষদের বলতে চেয়েছেন 'রাষ্ট্রের হরকরা', তারাই যেন দেশে দেশে 'সংস্কৃতি'র সুমহান বার্তা বহন করে চলেছেন যুগ যুগ ধরে। শুধু আর্নল্ড বা রাইডার হ্যাগার্ডের লেখা নয়, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের কথা ও লেখা উল্লেখ করেছেন, যাঁদের লেখার সূত্রে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি গড়ে ওঠা সম্পর্কিত কয়কটি সূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সূত্রগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

১) বাস্তববাদী চিন্তার বিপ্রতীপে শিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক মধ্যবিত্তের রোমান্টিক চিন্তাচেতনা কেলাসিত রূপ ধারণ করেছিল অ্যাডভেঞ্চারধর্মী কাহিনিগুলিতে।

২) প্রচ্ছন্ন ভাবে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে তৈরি হয় শাসক ও শাসিতের; সভ্য ও অসভ্যের; সংস্কৃত-চিন্তক ও অসংস্কৃত-চিন্তকের ভাষ্য।

৩) সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের বৃত্তান্ত এবং উপনিবেশের প্রতি উপনিবেশকারীদের শ্যেনদৃষ্টি।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির জন্ম ইংরেজি অ্যাডভেঞ্চারের প্রেরণাতে হলেও তার একটা নিজস্ব ধরন ছিল। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্ভবেরও একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি ১৮২৩ সালে রামমোহনের লেখা একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন — "...the natives of Bengal wanting vigour of body and adverse to active exertion....". অর্থাৎ, বাঙালির 'দুর্বল শরীর' তার অধীনতার এক চিহ্নবিশেষ। প্রায় একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাসাগরচরিত' প্রবন্ধে—

> "...নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে।"[৪]

কিন্তু এই শীর্ণতা স্বাস্থ্যদৌর্বল্যকে তোয়াক্কা না করে সেই অপবাদ ঘোচাতে বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে জন্ম নিয়েছিল দুই শ্রেণির চরিত্র — ১) যারা অভিভাবকদের তাড়নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বাড়ি ছেড়ে পালায়; (যেমন — শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র কাঞ্চন বা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ভোম্বোল সর্দার'-এর ভোম্বোল) আর ২) যাদের "ধরাবাঁধা গতের জীবন ক্ষুব্ধ করে তোলে, অজানার উজানে ভেসে থাকার ঝুঁকি নিতে তারা যেনো মুহূর্তে প্রস্তুত।" বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'-এর শঙ্কর বা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বিমল বা কুমারকে তিনি এই শ্রেণির বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] বোঝা যায়, শারীরিক শীর্ণতাকে উপেক্ষা করে নতুন ধরনের

এক চরিত্রশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে বাঙালি তরুণ। আর, এভাবেই নিজস্ব ঘরানায় আত্মপ্রকাশ করে বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি।

'চাঁদের পাহাড়'-এ জানা যায়, '(শঙ্করের) মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর দূর দেশে — শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। ...যদিও একথা ভেবে দেখেনি অন্যদেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালির ছেলের পক্ষে তা ঘটা একরকম অসম্ভব। তারা তৈরি হয়েছে কেরানী, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হওয়ার জন্য। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাত পথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই নিরাশা।'[৬] হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'সোনার পাহাড়ের যাত্রী' উপন্যাসের নায়ক বিমলের বক্তব্য ছিল: 'আমাদের রক্তে, আমাদের শিরায় শিরায়, আমাদের হৃদয়ের পরতে পরতে আছে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ, ঘরমুখো বাঙালির ঘরে জন্মেও আমরা হতে চাই বিশ্বমানবের আত্মীয়, আমরা ধন-মান-খ্যাতি কিছু প্রার্থনা করি না, আমরা চাই শুধু ঘটনার আবর্তে ঝাঁপ দিতে, উত্তেজনার পর উত্তেজনা ভোগ করতে, নব নব দৃশ্য আর সৌন্দর্যের মধ্যে তলিয়ে যেতে। সক্রিয় জীবন চাই, গতির বন্যা চাই। বিপদের মহোৎসব চাই।'[৭] এই জাতীয় উক্তি প্রমাণ করতে চায় যে, বাঙালির চিরকালীন শান্তিপ্রিয়, 'ভেতো' স্বভাবের বদনাম ঘুচিয়ে দিতে এবং 'পরিবার' নামক 'পিছুটান' কাটিয়ে অনির্দেশ্যতার প্রতি এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই বাঙলা সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সূত্রপাত হয়।

'অ্যাডভেঞ্চার' মূলত একটি সরণের কাহিনি। স্থানান্তরের কাহিনি। স্থানিক পরিচিতির অতিক্রমণ; একই সঙ্গে তা কালিক-ও। মানুষের স্মৃতির যে পরিধি, বা স্মৃতিলোক থেকে মানসিক যে সরণ, তাকে 'অ্যাডভেঞ্চার' বলা যায় কি না, তা বেশ তর্কসাপেক্ষ। উনিশ শতকের নবজাগরিত বাংলা একসঙ্গে অনেক নতুন বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, নতুন পাঠক্রম, ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য বাঙালির নতুন চেতনা তৈরি করতে শুরু করেছিল। এই প্রথম উপনিবেশের বাঙালি বুঝতে পারলো, বাইরের বিস্তৃত জগৎ জ্ঞানের দ্বারাই অধিগম্য। নিজেকে তারা চিহ্নিত করতে শুরু করলো 'অপর'-এর সাপেক্ষে। এই 'অপর' হল

অন্যান্য দেশের বাসিন্দা। ভারতীয় তথা বাঙালি সামগ্রিক ভূ-রাজনৈতিক প্রতিবেশে চিনে নিতে চাইছিল নিজের অস্তিত্বকে — 'অপর' (other) ও 'আমি' (self) — এই দুই ধারণার পারস্পরিক অবস্থান স্পষ্ট করে বুঝে নিতে এই সময়ের বাঙালি ধীরে ধীরে আগ্রহী হয়ে উঠছিল। এরই মধ্যে বাংলায় ১৮৫৪ সালে চালু হয় ডাকব্যবস্থা, লর্ড ডালহৌসির সৌজন্যে এবং সেই বছরই, প্রথম ট্রেন চলতে শুরু করে বাংলাতে। এই প্রযুক্তিগত বিস্তার অদেখা জগতের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ ক্রমশ বাড়িয়েই তুলছিল। তাই মানুষ এ-ও মনে করতে শুরু করে যে, জ্ঞানের জগতে যা আহরণ করা গিয়েছে, বাস্তবে তার কাছে পৌঁছনো সম্ভব কি না। মূলত এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা ও বিস্ময়ই মানুষের তথা বাঙালির মনে প্রাথমিক পর্বে ভ্রমণের ঈপ্সা ও পরবর্তীতে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তৈরি করেছিল — বেশ অনেক সময় পরেই তা কাহিনি হিসেবে রূপ লাভ করেছিল।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে এই ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, অ্যাডভেঞ্চার-এর ধারণা ও সেই উপাদান-ঠাসা কাহিনি উপনিবেশকারী (Coloniser)-দেরই তৈরি। ঠিক কীভাবে পৃথিবী/ 'অপর'কে দেখা হবে, তা নিশ্চিত/ স্থির করে দিয়েছিল সেই উপরিতলস্থিত গোষ্ঠী। ফলত আফ্রিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, লাতিন আমেরিকাকে, কখনো বা ভারতকেও কীভাবে আবিষ্কার করা যেতে পারে, তার একটা Eurocentric / ইউরো-কেন্দ্রিক দৃষ্টি আমরা বারবার পেয়েছি পাশ্চাত্যে নিছক কিশোরদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য লেখা বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে। পরবর্তীকালে, বাঙালিও যখন এই ধরনের কাহিনি লিখতে শুরু করল, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, সেখানেও কী অদ্ভুতভাবে প্রান্তিক, অবনমিত জাতিদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রকাশ পেল, 'জাতিবিদ্বেষী বিষোদ্গার' প্রচারিত হল, আপাত নিসর্গশোভার বর্ণনা এল, কিন্তু বর্ণবৈষম্যবাদ, অপর দেশের রাজনৈতিক চিত্রের উল্লেখটুকুও করা হল না। বোঝা যায়, উপনিবেশের দীক্ষায়, দীক্ষিত হয়ে গিয়েছে বাঙালি। চেনা জগৎ ছেড়ে বেরোলেও সংকট-সংকটমুক্তির আখ্যানে আসলে ধরা দিয়েছে চেনা জগতেরই সম্প্রসারিত রূপ।

বাংলা অ্যাডভেঞ্চার আখ্যানে উক্ত প্রবণতা ছাড়াও আরও যা দেখা যায়, তা হল মধ্যবিত্ত বাঙালির দ্বিধাদীর্ণ চরিত্র। সম্মান-অসম্মানের দ্বন্দ্বে ইংরেজ ও বাঙালি ভদ্রলোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে, যার প্রভাব পড়ে এধরনের গল্পে। ছোটদের জন্য লিখিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে দেখা যায় 'ভারতবর্ষের শাশ্বত মহিমা, অক্ষয় কীর্তির বা আধ্যাত্মিক বৈভবের সাড়ম্বর প্রকাশ'[৮]। কখনো বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ছাপও মেলে সেই ধরনের লেখায়।

বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলির চরিত্র বিচার করতে গিয়ে দেখা যায় সেখানে মহিলাদের কোনো ভূমিকাই নেই। 'পরিবার' যেখানে মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালি তরুণদের কাছেই ছিল পিছুটানের সূচক, সেখানে মহিলাকেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লেখা খুব একটা সহজ ছিল না। কারণ, 'পরিবার' ছিল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্টকৃত অবস্থান-ক্ষেত্র। এছাড়া, মহিলাবর্জিত লেখা হওয়ার কারণ হিসেবে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ করেছেন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে। "ঔপনিবেশিক সাহিত্যিকদের চোখে নারী স্বভাবতই 'অবলা', বীর পুরুষদের বিপরীত-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'বুদ্ধি' বা 'সাহস' না থাক, নারী কিন্তু পুরুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিতে পারে, কর্তব্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে আনতে পারে। বিভিন্ন লেখায় নানা ছলে-কৌশলে জানানো হয় যে নারী নরকের দ্বার, সুতরাং তার প্রতি এক সহজাত অবিশ্বাস ও মজ্জাগত বিদ্বেষ থাকাটা পুরুষের পক্ষে আদৌ নিন্দনীয় নয়। ফলে পুরুষের বশ্যতা যে নারী নিঃশব্দে মেনে নেয় একমাত্র সে-ই গ্রহণযোগ্য। কিশোরদের জন্য রচিত ঔপনিবেশিক সাহিত্যে থাকে শৌর্য-বীর্যের পাঠ; সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয় যে পুরুষকেন্দ্রিক বীক্ষণই একমাত্র বীক্ষণ, পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। ... ঔপনিবেশিক পৌরুষের প্রধান লক্ষ্য তিনটি — দেশীয় শ্রমিক শ্রেণী, উপনিবেশের প্রজা এবং নারী। ঐ তিন ধরনের নিম্নবর্গীয়দের ঔপনিবেশিক বয়ানের (ডিসকোর্স) সীমানার বাইরে ঠেলে দেওয়াটা একান্ত দরকার ছিল, দরকার ছিল তাদের তিনটি ভেদাভেদশূন্য এককে (Category) পরিণত করা,

সম্পূর্ণ সমীভবন ঘটিয়ে ফেলা।”[৯]– শিবাজীর এই বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে মেয়েদের কোনো ভূমিকা আদপেও থাকা সম্ভব নয়। তবে বিশ শতক থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। মেয়েরাও নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে দেখার চেষ্টা করে। নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করার জন্য বেরিয়ে যেতে শুরু করে চেনা ছকের বাইরে।

অ্যাডভেঞ্চার যেহেতু ‘স্থানান্তরণ’ সম্পৃক্ত বিষয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তা বাইরের জগতের সঙ্গেই অন্বিষ্ট, সেহেতু মেয়েদের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের প্রথম থেকেই বিপ্রতীপতার সম্পর্ক। উনিশ শতকে তো ‘অন্দর’ মহল ও ‘বাহির’ মহল – এই দুই এলাকা নির্দিষ্টই করা থাকতো যথাক্রমে নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্র হিসেবে। প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষাজগতে এবং কর্মজগতেও বাঙালি মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে অনেকটাই দেরিতে, ধীর গতিতে। তাই সাধ করে, শখ করে বাইরের জগতে বেরিয়ে পড়ার দুঃসাহস বাঙালি মেয়েদের হয়নি। তবে, আগে বলা হয়েছে যে, ধীরে ধীরে এই চেনা ছবিরও পরিবর্তন হয়েছিল। এই পরিবর্তনের পর্বান্তর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে হয়েছিল, তা এবারে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

উনিশ শতকে মহিলাদের সামগ্রিক অবস্থান নির্দেশ করতে হলে সর্বাগ্রে দেখা দরকার ‘পরিবার’ ধারণাটি। উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের প্রাথমিক সামাজিক একককে ‘পরিবার’ বলা হয়।[১০] ‘পরিবার’ শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ ‘পরিভারা’ থেকে – যার অর্থ হল নির্ভরশীল।[১১] বস্তুত, জন্মগত তথা পরিবারগত সম্পর্ক দ্বারাই রচিত হয় মানুষজনের প্রাথমিক পরিচয়পত্র। সুধীর কক্কর ও ক্যাথরিনা কক্কর ভারতীয়ত্ব প্রসঙ্গে মনে করেছেন যে, ভারতীয়দের মনে সমাজতন্ত্র বা ধনত বলে কিছু নেই, আছে শুধু পরিবারতন্ত্র – “If there is one ‘ism’ that governs Indian Society and its institution, it is familism.”[১২] উনিশ শতক থেকেই এই পরিবারের চেতনা ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান।

প্রদীপ বসু তাঁর 'পরিবারের ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন যে, উনিশ শতক থেকে শিশু পালন, ধর্ম, পালনীয় কর্তব্য, আচরণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, রন্ধন, দাম্পত্য সম্পর্ক – ইত্যাদি সমস্ত উপাদানকে সংগঠিত করে নির্দিষ্ট সম্পর্ক ও নিয়মের ভিত্তিতে এক পূর্ণাঙ্গ রূপ তৈরি হয় পরিবারের – যাকে তিনি 'ডিসকোর্স' বলতে আগ্রহী। তিনি উনিশ শতকের 'পরিবার'কে উল্লেখ করেছেন "মানসিক গুণাবলি এবং চেতনা বিকাশের এক আদর্শ স্থল' হিসেবে।[১৩] আমরা জানি, উনিশ শতকের বহু চিন্তাবিদ এই নতুন 'পরিবার' ধারণা বিস্তারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রচুর প্রবন্ধ, এমনকি উপন্যাসেও সেই বিষয়ে লেখালেখি হয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও আদর্শ পরিবার নির্মাণ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে নারীদের পাঠ দেওয়া শুরু হয়েছিল। শিবানাথ শাস্ত্রী ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বামাবোধিনী পত্রিকাতেও নারী ও পরিবার সংক্রান্ত নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। এইভাবে, সেই সময় থেকে 'পরিবার' নামক একটি নতুন ধারণা তথা 'ডিসকোর্স' তৈরি হতে দেখা যায়।

উনিশ শতকে যখন 'পরিবার' সম্পর্কে এই ডিসকোর্সের উৎপত্তি হয়, তখন বাঙালি মধ্যবিত্ত উপনিবেশবাদের বিভিন্ন অবমাননাকর শর্তের বন্ধনে আবদ্ধ – যা সে পরিবর্তন করতেও পারতো না, আবার আপোস করাও তার পক্ষে বেশ অসহনীয় হয়ে উঠতো। এমতাবস্থায় 'পরিবার' এমন এক ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ পরিবেশ তৈরি করেছিল, যেখানে পারস্পরিক নৈকট্য তৈরি হওয়া সম্ভব। স্বভাবতই, প্রাথমিক পর্বে 'পরিবার' তাই উনিশ শতকীয় শিক্ষিত বাঙালি পুরুষের কাছে হয়ে উঠেছিল এক স্বাধীনক্ষেত্র, নিভৃত আশ্রয়। তবে, এই ইতিবাচক ধারণার পাশাপাশি 'পরিবার' যেহেতু অন্তঃপুর বা অন্দরমহলের নামান্তর, সেহেতু এখানে বহির্গমনের অধিকারী বা বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সমর্থ পুরুষের সঙ্গে নারীদের সামাজিক তথা পারিবারিক অবস্থানগত এক বৈষম্যও চোখে পড়ে। উপনিবেশবাদের জাঁতাকলে পিষ্ট পুরুষ পরিবারের অভ্যন্তরে যখনই নিজেকে সম্রাট বা সকল ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করতো, তখনই, অজান্তেই অন্তঃপুরে বন্দী বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন নারী 'অপর' বলে

চিহ্নিত হত। সখ্য বা সমানাধিকারের পরিবর্তে শাসক-শাসিতের সম্পর্কেও অনেক সময়েই বিন্যস্ত হত এই ডিসকোর্স। বিষয়টি আরো একটু বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

উনিশ শতকে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি মহিলাদের একমাত্র বিচরণক্ষেত্র ছিল অন্তঃপুর। 'অবরোধ প্রথা' ধীরে ধীরে কমে এলেও মেয়েরা সাধারণত ঘরের বাইরে বের হত না। তাদের অস্তিত্বের প্রায় পুরোটাই জুড়ে ছিল 'ঘর গৃহস্থালি'। সামাজিক রীতি অনুসারে উনিশ শতকের মেয়েদের এত অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত যে, 'সংসার' বলতে তাদের বিবাহোত্তর জীবন বা শ্বশুরবাড়িকেই বোঝাত এবং পিতৃগৃহকে তাদের 'প্রকৃত জীবনের প্রস্তুতি পর্ব' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হ'ত।[১৪] কন্যার ভূমিকা পালনের পর একটি বালিকা খুব দ্রুত 'জায়া' ও 'জননী' এই দুই বৃহত্তর পরিচিতি লাভ করতো এবং বাংলার পারিবারিক গঠন বৈশিষ্ট্যে তাকে আরও বহুস্তরীয় সম্পর্কের আবেষ্টনীর মধ্যে সম্পর্কিত হত। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যেত পুরুষ শাসিত সমাজ এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠা শাশুড়ি বা শাশুড়ি-প্রতিম কোনো রাশভারী মহিলা, যিনি বা যাঁরা সংসারের কর্ত্রী রূপে স্বীকৃত, সেই 'গৃহিণী'-শাসিত সংসারে এই মেয়েরা কোণঠাসা, প্রান্তিক। পারিবারিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মেয়েরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কথা বলেছিল বলে বারবার নারীকণ্ঠে শোনা যেত পুরুষের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। নারীর মনেও প্রবেশ করানো হত পিতৃতান্ত্রিক বোধবুদ্ধি ও চাহিদা। এই সূত্রেই বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের এই মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েদের উপর 'গৃহিণীত্ব' ছিল এক "বাধ্যতামূলক আরোপিত ঘটনা।"[১৫]

উক্ত সময়পর্বে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় 'নারী ও পরিবার' সম্পর্কে যে নিয়মিত লেখা বেরোত, সেখানকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ছিল 'গৃহিণীর কর্তব্য', 'গার্হস্থ্যদর্পণ' ইত্যাদি। কীভাবে মেয়েরা আদর্শ গৃহিণী হয়ে উঠবে, এ ধরনের লেখাতে তার পাঠ দেওয়া হত- "গৃহের সমুদায় কার্যের অধ্যক্ষতা করা গৃহিনীর প্রথম কর্ত্তব্য। ... সমস্ত পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং কল্যাণ তাহার উপর নির্ভর করছে জানবেন।"[১৬] গার্হস্থ্য দর্পণে স্ত্রী সম্পর্কে বলা হয়,

"সাংসারিক সুখ তাহারই হাতে, তিনি কার্য্যে পটু ও আচারে লক্ষ্মী হইলে সংসারের সুখ ঐহিকের পরম সুখ বলিয়া বোধ হয়।"[১৭] 'মহিলা' পত্রিকার **১৩১০**, মাঘ সংখ্যায় লেখা হল মেয়েরা ঘরের কাজের জন্যই উপযুক্ত; কারণ, তারা 'গৃহলক্ষ্মী'। শিক্ষণীয় বিষয়ের সীমানা চিহ্নিত করে এবং মেয়েদের কর্তব্যের বিষয়ে বারবার সচেতন করে তাদের পারিবারিক সুনির্দিষ্ট ঘেরাটোপে আবদ্ধ করা হচ্ছিল। মেয়েদের অর্থ উপার্জনের ভাবনা তখনও অন্তরালে, যদিও দুঃস্থ মেয়েরা ঘরে বসে অর্থ উপার্জনের অনুমতি পেয়েছিল। কৃষ্ণভামিনী দাসী 'স্ত্রী লোকের কাজ' প্রবন্ধে ঘরে বসে করতে পারা যায় এমন বিভিন্ন কাজের তালিকা দিয়েছিলেন। মোটের উপর স্ত্রীলোকের মূল কাজগুলিকে শ্রেণি বিন্যস্ত করা হয়েছিল এইভাবে —

১) গৃহ ও গৃহসামগ্রীর পরিষ্করণ ও সুচারু সজ্জা

২) পরিমিত ব্যয়ে গৃহস্থালির সঞ্চালনা

৩) রন্ধন ও পরিবেশন

৪) সূচিকর্ম

৫) পরিজনদের যত্ন

৬) সন্তানপালন[১৮]

এরসঙ্গে শিশুকাল থেকেই নারী মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হত সতীত্বের ধারণা, পতিসেবার পুণ্য। উক্ত সমস্ত ধারণার সঙ্গে মেয়েরা 'ধর্ম্মভীরুতা', 'সহিষ্ণুতা', 'ভক্তি প্রবণতা', 'লজ্জাশীলতা', 'বিশ্বস্ততা' ইত্যাদি গুণগুলি নিজেদের চরিত্রের অঙ্গ বলে মনে করে নিজেদের একটি জগৎ নিজেদের মতো করে গড়ে তুলেছিল; সমাজ-পরিবার ও আত্ম-নির্মিত সেই জগৎ সীমায়িত ছিল চার দেওয়ালের মধ্যেই, যাকে বলা হয় 'ঘর গেরস্থালি'।

এতক্ষণ ধরে যে অন্তঃপুরচারিনীদের কথা বলা হল, তারা 'ভদ্রমহিলা', যাদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল 'ভদ্রলোক'দের সাপেক্ষে। অধ্যাপক সোহিনী সিন্‌হা কয়েকজন

তাত্ত্বিকের ধারণার সাপেক্ষে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ঐতিহাসিক ব্রুমফিল্ড-এর মতে 'ভদ্রলোক' ছিল সমাজের এক বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠী, অধ্যাপক এস. এন. মুখার্জির মতে 'নতুন সামাজিক শ্রেণী'। আঠারো-উনিশ শতকে সমাজে নিম্নবর্গ তথা 'ছোটলোক' — এই শ্রেণির বিপ্রতীপে রুচিশীল, শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক একদল লোক নিজেদের শ্রেণিসত্তা নির্মাণে সচেতন হয়ে উঠেছিল — ঐতিহাসিক বিচারে এরাই 'ভদ্রলোক'। ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোতে ভারতীয় নারীত্বের ধারণার অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে ব্রিটিশ সরকার বাঙালির তথা ভারতের সাংস্কৃতিক সত্তাকে দুর্বল প্রমাণ করার চেষ্টা করলে ভারতীয় নারীর ধারণা নতুন করে নির্মাণ করার প্রয়োজন হয়। ভারতীয় তথা বাঙালি নারী হয়ে ওঠে 'The Angel in the House' — আদর্শ পুরুষ গড়ে তোলা হয়ে ওঠে তার কর্তব্য, সমাজ নির্মাণে তার না-ই বা থাকলো কোনো ভূমিকা — তার জন্য বরাদ্দ হয় 'Home' বা গৃহকোণ —ঐতিহ্য, পরম্পরা, আত্মমর্যাদা যেখানে লুকিয়ে থাকে। এই পবিত্রতা যেহেতু বঙ্গ রমণীই রক্ষা করে, তাই সে বিদেশি কলুষতা মুক্ত। অন্দরমহলে নারীর এই ভূমিকা কেন্দ্র করেই বিদেশী জাতির থেকে বাঙালি পৃথক পরিচিতি নির্মাণে সচেষ্ট হয়।[১৯] যেহেতু ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার শিকার বহির্জগতে পরাজিত বাঙালি ভদ্রলোক গার্হস্থ্য জীবনে 'Ruler', 'Administrator', 'Legislator', 'Chief Justice'-এর ভূমিকা পালনে ইচ্ছুক ছিলেন, সেহেতু 'ভদ্রমহিলা'রা থাকতেন সম্পূর্ণ নিবেদিত। এইভাবে 'অন্দরমহল' নির্মাণ ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গঠিত জাতীয়তাবাদী পুরুষতান্ত্রিক ধারণা, যেখানে ভারতীয় আদর্শ রমণীর ধারণাকে ব্যবহার করা হয়েছিল।[২০] এইভাবেই দেখা যায়, ভদ্রলোকেদের জীবনে 'Public' বা কর্মময় জীবন ও 'Private' বা শান্ত, নিরুপদ্রব জীবন — দুই ক্ষেত্রেই সমান অধিকার স্থাপিত হয় ও নারীর ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয় কেবল 'Private' পরিসরে। এই বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে পরের উদ্ধৃতিতে,

"The modern distinction between public and private spheres has been employed in such a way that women are constructed as occupying only the private realm... while men are assumed to span both, their lives having both a public, political identity and private personal one. The public private split becomes a male-female distinction and a women's existence within the private realm is justified by her nature."[২১]

মেয়েদের কেন্দ্র করে অভিযান কাহিনি গড়ে না ওঠার ক্ষেত্রে এ ধরণের সামাজিক কারণ অবশ্যই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।

উক্ত ছবিটা একই রকম অবশ্য থাকেনি চিরটা কাল। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই নানা পত্র-পত্রিকায় বাড়ির গৃহিণীদের এই ঘর-গেরস্থালির নির্দিষ্টকৃত কাজে অবহেলার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে আসতে শুরু করে। ঘরদোর যথাযথ ভাবে সামলাতে না পারা, বিলাসিতায় দিন যাপন করার অভিযোগকে পূর্ণতা দেয় মেয়েদের গান-বাজনা, ছবি আঁকতে পারার অভিযোগ – যা স্বাভাবিকভাবেই গৃহকর্মের অন্তরায়।[২২] ১৮৯৬ সালের কোনো একটি রচনায় স্পষ্টতই বলা হয়, "বালিকাগণ বিবিদের স্কুলে রীতিমতো শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অনেকে বিলাতী শিল্পকর্ম, চিত্রবিদ্যা এবং গীতবাদ্যাদিতেও নৈপুণ্যলাভ করে। রন্ধন ও গৃহকর্ম্মাদিতে প্রায় সকলেরই অবহেলা, পূজার্চ্চনা ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠে তাদের উপেক্ষা দেখা যায়।"[২৩] এই উদ্ধৃতি থেকেও বোঝা যায় উনিশ শতকের শেষ কয়েক বছর থেকে মেয়েদের জন্য বেঁধে দেওয়া ছক বা পূর্বকথিত মেয়েদের 'nature' বা প্রকৃতির বদল ঘটছে, মেয়েদের নিজস্ব জগতের সম্প্রসারণ ঘটছে।

বিশ শতক-ও অবশ্য উনিশ শতকের মতোই হিন্দু মেয়েদের যাপনচিত্র ও চরিত্র উভয়কেই জাতীয়তাবাদী আঙ্গিক থেকে নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিল। সোহিনী সিন্‌হা দেখিয়েছেন, "উনিশ শতকের রাজনৈতিক কল্পনায় 'হিন্দু স্ত্রী' এবং বিশ শতকের রাষ্ট্রবাদী ধারণায় 'হিন্দু জননী'র ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল।"[২৪] বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নারীর অস্তিত্ব, অধিকারবোধ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নানা বিতর্কের সৃষ্টি করলেও চোখে পড়ার মতো কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভারতী রায়ের মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪০-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬-এর দাঙ্গা, সামগ্রিকভাবে চল্লিশের

দশক থেকেই ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নানাবিধ পরিবর্তন লক্ষ করা যেতে থাকে। ভারতের নারীসমাজেও নতুন ভাবধারা উন্মোচিত হয়। এর তিনটি দিক—

১) শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

২) পারিবারিক জীবন রীতিতে পরিবর্তন

৩) বহির্বাটীর যাত্রাপথে অবতরণ[২৫]

১৯৪০ সালে প্রথম বামপন্থী মহিলাদের 'সারা ভারত সম্মেলন' হয় লখনউতে। সেখানে সর্বক্ষেত্রে নারীর আইনগত সম্মান, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। ১৯৪৫ সালের ১৭-১৮ নভেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে প্রধানত উঠে আসে সর্বস্তরে পুরুষদের সঙ্গে নারীদের সমান ভাবে কাজের সুযোগের এবং সমান মজুরির দাবি। এই ঘটনাগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, মেয়েদের আর গৃহকোণে রাখা সম্ভবপর হবে না।

মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের পরিচিতির সঙ্গে যেহেতু শ্রমচেতনার একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক আছে বরাবর, সেহেতু ভদ্রমহিলার ধারণা তৈরির সময়েই উপার্জনভিত্তিক কর্মজগৎকে মুক্ত করা হয়নি। কর্মরত মহিলাদের 'Westernised', 'Irreligious', 'Sexually promisecuous' হিসেবে চিহ্নিত করারও বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায় । স্বদেশী আন্দোলনেও নারীরা 'গৃহলক্ষ্মী' বলেই যোগ দিয়েছিল।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ 'মেয়েলিপনা' ও 'পুরুষালিপনা'র কয়েকটি ধারণা খুব স্পষ্টভাবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মনে গেঁথে দিয়েছে। এই আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ[২৬]—

মেয়েলি বৈশিষ্ট্য	**পুরুষালি বৈশিষ্ট্য**
স্নেহশীলা	উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন
সান্তনাদাত্রী	আগ্রাসী

স্তুতিপ্রিয়	প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন
মৃদুভাষিণী	শক্তিমান
কোমল	পৌরুষদীপ্ত, কঠোর
লজ্জাশীলা	ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতাসম্পন্ন
পরনির্ভরশীল	স্বনির্ভর

এই বিভাজনের সূত্রে মেয়েরা সুদূর অতীতকাল থেকেই সামাজিকভাবে প্রান্তবাসী। সমাজনির্দিষ্ট এই আচরণের ছকেই নিহিত থাকে মেয়েদের অভিযানে বিরত থাকার কারণ। তবে উক্ত নির্মিতির পাশ কাটিয়েই তৈরি হয় ব্যতিক্রম। 'বহির্বাটীর যাত্রাপথে' ভারতীয় নারীর 'অবতারণে'র প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও রাজনীতি। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাঙালি ভদ্রমহিলারা সক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেন। ভারতীয় সংবিধানের ১৬ নং আর্টিকেলেও বলা হল,

> "No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for or disorminated against in respect of any employment in office under the state."[২৭]

এই সাংবিধানিক অধিকারও নারীর কর্মক্ষেত্রে যোগদানের পথ সুপ্রশস্ত করেছিল। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, পারিবারিক গঠনের বদল, বিবাহের বয়ঃসীমা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, উদ্বাস্তু সংকট, বিশ্বযুদ্ধ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সাংবিধানিক অধিকার — এই সমস্ত বিষয়ের প্রভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রমহিলাদের কাজের ধরন ও ক্ষেত্র ক্রমশ পরিবর্তিত হতে শুরু করে। প্রাথমিক ভাবে বাড়ির বাইরে শুধুমাত্র শিক্ষাদানে যুক্ত থেকে ধীরে ধীরে চিকিৎসা, ফোটোগ্রাফি, টাইপ রাইটিং, পরিদর্শকের কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলার অগ্রসর হচ্ছেন। প্রয়োজনের তাগিদে এই যে মহিলাদের বহির্মুখী হতে দেখা গেল, আর ফিরলেন না তাঁরা। এবার শখ, ইচ্ছে সাধ ইত্যাদি পূরণ করতেও তাঁরা বেরোলেন সমাজনির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে — সেটাই মেয়েদের অ্যাডভেঞ্চার।

‘কঙ্কাবতী’ / ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-এর লেখা ‘কঙ্কাবতী’ আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করার জন্য সর্বপ্রথমেই আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। ১৮৪৭ সালের ২ জুলাই ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম। হুগলির চুঁচুড়া ও ভদ্রেশ্বরে প্রথাগত শিক্ষা লাভ করলেও মূলত তিনি স্বশিক্ষিত। শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও মধ্য বয়স থেকেই তিনি ভারতীয় যাদুঘরের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছিলেন। বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় সমান পারদর্শী এই ব্যক্তি ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই লিখেছেন। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারি হওয়ার সুবাদে পরাধীনতার গ্লানি, উপনিবেশবাদের যন্ত্রণা – এসবও খুব কাছ থেকেই অনুভব করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখাতেই তাই রসিকতার মোড়কে ব্যঙ্গের শাণিত আঘাত লক্ষ করা যায়। তিনি পাঠকমনে কালজয়ী স্থান অধিকার করে আছেন তাঁর ‘ডমরুচরিত’-এর জন্য, যা তাঁর মৃত্যুর (১৯১৯) পর ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্যের সময় ১৮৯২, নাম ‘কঙ্কাবতী’।

‘কঙ্কাবতী’-ও বাংলা সাহিত্যজগতে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন ‘সাধনা’ পত্রিকার ফাল্গুন, ১২৯৯ সংখ্যায়। সেখানে তিনি এই উপন্যাসের রূপকথা-ধর্ম, শিশু মানসকে স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করতে পারার অসীম ক্ষমতা বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। অন্যত্রও দেখি, ‘কঙ্কাবতী’র পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা ঔপনিবেশিক সময়, উপনিবেশের চাপ, শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর আলোকপাত করা হয়েছে। এই সমালোচনার ধারায় নারায়ণ সান্যাল প্রথম একটু অন্যরকম কথা বললেন তাঁর ‘কিশোরী সমগ্র’ বইয়ের গোড়ায়। ত্রৈলোক্যনাথকে তিনি চিহ্নিত করলেন ‘এক বিশেষ জাতের কিশোরী সাহিত্যিক’ হিসেবে; কারণ, তাঁর মতে, “কঙ্কাবতীই কিশোরী সাহিত্যের প্রথম নায়িকা।”[২৮] কঙ্কাবতী ‘কল্পনাবিলাসিনী, স্বপনচারিণী’। এই উপন্যাস তাই তারই মনোজগতের রূপায়ণ। এই সূত্র ধরেই আমরা ‘কঙ্কাবতী’কে একটু অন্যভাবে পড়ার চেষ্টা করব।

কে এই কঙ্কাবতী? ব্রিটিশ শাসিত ভারতের একটি অখ্যাত গ্রামের (কুসুমঘাটী) নিয়মনিষ্ঠ হিন্দু বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের তিন কন্যাসন্তানের সর্বকনিষ্ঠা। উনিশ শতকের যে সমাজ কাঠামো, সেখানে অর্থগৃধ্ন তনু রায়ের (কঙ্কাবতীর বাবা) কাছে কন্যাসন্তান পণ্য বিশেষ। তাই যেন তেন প্রকারেণ কঙ্কাবতীকে পাত্রস্থ করতে উৎসুক তিনি এবং এক বৃদ্ধ পাত্র মনোনীতও করে ফেলেন। তনু রায়ের স্ত্রী যদিও সহমত নন — কারণ, তাঁর বড় দুই মেয়ে একই কারণে অকাল বিধবা হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। উপন্যাসটির কালচিহ্ন এক্ষেত্রে স্পষ্ট।

উপন্যাসের নায়ক তনু রায়ের প্রতিবেশী খেতু। শিক্ষিত, বিচক্ষণ খেতু কঙ্কাবতীকে শিক্ষিত করে তোলে (যদিও সমাজ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী), কঙ্কাবতীর খেতুকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হলেও তার দারিদ্র্য বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কঙ্কাবতীর বিয়ে স্থির হয় বৃদ্ধ পাত্রে এবং কঙ্কাবতী গৃহত্যাগ করে। শুরু হয় 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যের নিরিখে তো বটেই, সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যেও এইটিই প্রথম কোনো মেয়ের অভিযাত্রার গল্প। এখানে রয়েছে স্থানিক সরণ — মনের অভিমান মেটাতে সে মাঝ নদীতে নৌকায় চড়ে বসে — দিদির ডাকে সাড়া দিয়ে বলে — "শুনিয়াছি আছে নাকি জলের ভিতর/ শান্তিময় সুখময় সুশীতল ঘর/ সেইখানে যাই দিদি পূজি তোমার পা/ এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হথু যা।"[২৯] ভাই কঙ্কাবতীকে কূলে কলঙ্ক লেপন থেকে বিরত করতে চাইলেও সে বলে, "...জ্বলিছে আগুন দেহে নিবাইতে নারি/ যাও দাদা ঘরে যাও হও তুমি রাজা"; মায়ের করুণ আকুতিকেও সে বুঝিয়ে বলে, "বড়ই পিপাসা মাতা না পারি সহিতে/ তুষের আগুন সদা জ্বলিছে দেহেতে/ এই আগুন নিবাইতে যাইতেছি মা।"[৩০] বাবা টাকা-পয়সা-গয়নার প্রলোভন দেখিয়ে ফিরিয়ে আনতে চাইলে উত্তর দেয় — "টাকা কড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ/ আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন/ এ দারুণ যাতনা পিতা আর সহে না/ এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ডুবে যা"— এই উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় উনিশ

শতকে মেয়েদের স্বাভাবিক দিন যাপনের অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়ায় এই ছক ভাঙার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় কঙ্কাবতী। বাংলার প্রথম বালিকার অ্যাডভেঞ্চার তাই দায়ে পড়ে, পারিবারিক-সামাজিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে, শখ পূরণার্থে নয়।

জলের ভেতরে ডুবে গিয়ে কঙ্কাবতী পৌঁছয় মৎস্যরাজ্যে — মাছেরা তাকে রানী করতে চায়। রাজবেশ পরানোর জন্য "পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল অতিক্রম" করে বুড়ো দরজির কাছে পৌঁছতে হয়। সঙ্গী কাঁকড়া ও কচ্ছপ। তারপর খলিফার তৈরি রাজবস্ত্রে সুসজ্জিতা কঙ্কাবতীকে ঝিনুকের মাঝে 'মোতিমহল'-এ থাকতে দেওয়া হয়। কঙ্কাবতীর রূপ ও গুণে মুগ্ধ সকলে তাকে রানী হিসেবে পেয়ে ধন্য ধন্য করে। লক্ষণীয়, বাস্তব সমাজ তার যে মূল্য দিতে পারেনি, বাস্তব থেকে রোমান্টিক জগতে সরণের ফলে তা সে লাভ করে।

কাহিনি এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কাবতীর স্থানান্তর ঘটে। গোয়ালিনীর ঘরে তার ঘটনাচক্রে আগমন ঘটে এবং সেখানে খেতুর মায়ের মৃত্যুসংবাদ তাকে উন্মাদিনী করে তোলে — সে শ্মশানমুখী হয়। সেখানে খেতুর সঙ্গে তার আবার দেখা হয়, খেতু স্থান পরিত্যাগ করে, কঙ্কাবতী ফের নিজগৃহে ফিরে আসে এবং সেখানে ব্যাঘ্ররূপী খেতু তাকে বিবাহ করে এক অজ্ঞাত ঠিকানায় নিয়ে আসে। লক্ষ করব, কঙ্কাবতীর চলন অব্যাহত।

খেতু তার ব্যাঘ্ররূপ ধারণের আদ্যোপান্ত বর্ণনাকালে নাকেশ্বরী প্রেতিনীর উল্লেখ করে এবং কঙ্কাবতীকে সেই স্থান ত্যাগ করতে বললে কঙ্কাবতী উত্তর দেয় — "কঙ্কাবতী নরকের কীট নয়। নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিলে ভাল, না পারি, তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। যদি তোমার মৃত্যু, তো আমারও মৃত্যু। কঙ্কাবতী মরিতে ভয় করে না। তোমাকে ছাড়িয়া কঙ্কাবতী এ পৃথিবীতে থাকিতেও চায় না।"[৩১] অভিযাত্রী কঙ্কাবতীর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয় মনুসংহিতার নিদান—"পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।/সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে" অর্থাৎ, "কায়মনোবাক্যে যে নারী পতিকে লঙ্ঘন করেন না, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন এবং সজ্জন কর্তৃক সাধ্বী বলে কথিত হন।"[৩২]

অ্যাডভেঞ্চারধর্মী গল্পে সংকট ও সংকটমোচনের যে পুনরাবৃত্ত ছক থাকে, এইখান থেকেই যেন তা পুরোদস্তুর বোঝা যায়। একটি মেয়ে এগিয়ে আসে সংকটমুক্তির ক্ষেত্রে, যদিও তার চালিকাশক্তি উনিশ শতকীয় পতিসেবার আদর্শ, তবুও এই ইচ্ছে প্রশংসার্হ।

খেতুকে নিয়ে কঙ্কাবতী-নাকেশ্বরীর যুদ্ধের বেশ মজাদার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। নাকেশ্বরীর প্রবল নিঃশ্বাসের দাপটে কঙ্কাবতী একবার দরজার কাছে পড়ে যায়, তবু হাল ছাড়ে না। খেতুকে উদ্ধার করতে সে বদ্ধপরিকর। তবে নাকেশ্বরীর দ্বিতীয় নিঃশ্বাসে সে হার স্বীকার করে ও "কঙ্কাবতী একেবারে পর্ব্বতের বাহিরের বনের মাঝখানে"[৩৩] গিয়ে পড়ে। আরও একবার স্থান পরিবর্তন ঘটে তার। অচেনা পরিসরে একের পর এক অজানা চরিত্রের মুখোমুখি হয় সে। ব্যাঙ (মি. গমীশ)-এর পরামর্শে সে এগোতে থাকে, মশার সঙ্গে 'পচাকাল' পাতিয়ে সে অনুরোধ করে — "পতিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আমি লোকালয় যাইতেছি। সেখান হইতে ভাল চিকিৎসক আনিব, আমার স্বামীকে দেখাইব। তাই আমি বিলম্ব করিতে পারি না। পুনরায় আমি এই রাত্রিতেই পথ চলিব। ...তোমরা আমাকে একটু যদি পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।"[৩৪] কঙ্কাবতীর পথ চলা ফুরোয় না। খর্ব্বুর, ব্যাঙ, মশা সকলের সহায়তায় কঙ্কাবতী এবার চলে খোক্কোসের বাচ্চা ধরতে।

কঙ্কাবতী আকাশে উঠতেও ভয় পায় না। বীরদর্পে ঘোষণা করে "পতিপরায়ণা সতীর পরাক্রম আজ আকাশের লোককে দেখাইব"[৩৫] এবং যাত্রার প্রারম্ভে খেতুর পদধূলি নিতেও সে ভোলে না। অর্থাৎ, অ্যাডভেঞ্চারের মাদকতা বা ব্যক্তিগত ভাবে অভিযাত্রার সাফল্যে কঙ্কাবতী মথিত নয়, তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ঔপনিবেশিক যুগের নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিন্যাস। এই অভিযানের মূল চালিকাশক্তিও তাই।

আকাশ পৌঁছে খোক্কোস শাবকের পিঠে চড়ে কঙ্কাবতী নক্ষত্রদের বৌকে অনুরোধ করে চুনকামে লেপে দেওয়া আকাশের মূল পথটি বলে দিতে। আকাশের মূল অংশে প্রবেশ করে খোক্কোসকে মেঘের ডালে বেঁধে পায়ে হেঁটে সে চাঁদের কাছে পৌঁছায়। এরপর এক দীর্ঘ

আলাপ-আলোচনা চাঁদ, দুর্দান্ত সিপাহী, চাঁদনী ও চাঁদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কঙ্কাবতীর চলতে থাকে — কঙ্কাবতী পূর্ববর্তী পরামর্শ অনুযায়ী চাঁদের শিকড়ের অংশবিশেষ চেঁছে এনে খেতুকে খাওয়াতে সমর্থ হলেও খেতুর মৃত্যু হয়। এর পরবর্তী অংশে লেখক অত্যন্ত বিশদে কঙ্কাবতীর সহমরণের ইচ্ছে এবং আয়োজনের বর্ণনা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কঙ্কাবতী 'সতী' হয় এবং "অতি সুখ নিদ্রা। অতি শান্তিদায়িনী নিদ্রা" তে আচ্ছন্ন হয়।

উপন্যাসটির শেষ অংশে লেখক স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেন এতক্ষণ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা সবই কঙ্কাবতীর স্বপ্নচিত্র। কাহিনির সমাপ্তিতে কঙ্কাবতী জ্বরের ঘোর কাটিয়ে ওঠে ও সত্যই খেতুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু সেখানে কোনো নতুনত্ব নেই। কঙ্কাবতীর আত্ম-আবিষ্কারও সাধিত হয় স্বপ্ন পর্বের অভিযানেই। 'স্বপ্ন' আমাদের অবচেতনের আকাঙ্ক্ষার রূপ। তাই, একজন উনিশ শতকের মেয়ের পক্ষে বাস্তবে যা অসম্ভব ছিল, কিন্তু যা ছিল অভিপ্রেত, তা মেয়েটির স্বপ্নের দ্বারা পূরণ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়ী করে তোলা হয় তাকে, যদিও তার এই অভিযাত্রার মূলে ধ্বনিত হয় পতির প্রতি আনুগত্য, সেবা, ভক্তি — পতিপ্রেম থাকে অনুচ্চারিত। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বাস্তব থেকে রোমান্টিক জগতে, অপ্রাপ্তি থেকে সব পেয়েছির দেশে এই যে এক বালিকার অভিযান, তা প্রাপ্তবয়স্কদেরও চিন্তনের বিষয়। আর, এখানেই, সার্থকতা লাভ করে 'কঙ্কাবতী'র বিকল্প পাঠ প্রচেষ্টা। কঙ্কাবতীকে লুই ক্যারলের 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর অ্যালিসের সমগোত্রীয় মনে হলেও দুজনের সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ার কারণে দুটি রচনার ভরকেন্দ্র আলাদা হয়ে যায়। কঙ্কাবতীর গুরুত্ব এই বিচারে বহুমুখী।

'আলি-ভুলির দেশে' / সুখলতা রাও

১৯২২ সালে, ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'আলি-ভুলির দেশে'। ১৯৫৭ সালে, ২৬ সেপ্টেম্বর, মোট ১৫-টি গল্পের সংকলন হিসেবে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে 'আলি-

ভুলির দেশে'। প্রতিটি গল্পে উপস্থিত না থাকলেও আলি-ভুলির প্রথাভাঙা কার্যাবলী নজরকাড়া — তাই তাদের নামেই বইটির নামকরণ করা হয়।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রথম সন্তান সুখলতা রাও বাংলা শিশুসাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি নাম। 'পরম্পরাগত গল্পকাহিনির সংগ্রাহক ও নবভাষ্যে পরিবেশক' রূপেই তিনি মূলত পরিচিত হলেও তাঁর শতাধিক মৌলিক রচনা ও কিছু বিদেশী শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত রচনাও রয়েছে। 'আলি-ভুলির দেশে' তাঁর মৌলিক রচনাগুলির একটি। এখানে আলি ও ভুলির অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে যাকে চিত্রিত করা হয়েছে, সেই ছোট্ট মেয়ে ননু, তাঁর আদরের ভাইঝি নলিনী দাশেরই প্রতিরূপ বলে শোনা যায়।

আলি ও ভুলি অদ্ভুত দুই চরিত্র। ছোট্ট ননুর বন্ধু তারা। কিন্তু তাদের কেউ দেখেনি কোনোদিন। হয়তো বাস্তববাদী মনে তারা ধরা দেয়নি, ধরা দেয় না। কিন্তু ননু সবসময়েই হারিয়ে যায় আলি-ভুলির সঙ্গে তাদের দেশে। ননুকে সেই দেশের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসে, "...ওই যে ঘাসের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা দেখা যাচ্ছে, ঐখান দিয়ে, ঐ ছোট টিপি পার হয়ে, ঐ গাছের পিছন দিয়ে আলি ভুলির দেশে যেতে হয়।"[৩৬] খেতে বসে, পড়তে বসে — সবসময়েই হারিয়ে যায় ননু তার ভাবনার জগতে, আলি-ভুলির দেশে। অর্থাৎ ক্ষুদে ননুর কাছে এ এক কল্পবিশ্ব। সেখানে বড় বড় বাড়ি, আলোকসজ্জিত, উকুনে বুড়ির বিয়েতে পায়েসের গন্ধের রেশ, নীল ফুল — লাল ফুলের মাঝে চাঁদের আলোয় পরীদের নাচ — এসবের মাঝে ননু হারিয়ে যেতে থাকে। আলি-ভুলির হাত ধরে ননুর সরণ ঘটে এমন এক স্বপ্নের জগতে, যা আমাদের একান্তভাবে কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু যা সমীকরণ-এ মেলানো বাস্তব জগতে অসম্ভব — এ এক মানস-অভিযান। দুই ছোট্ট ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে অপর এক মেয়ের বাস্তবের অতিরিক্ত এক জগতে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনি — পক্ষান্তরে প্রাপ্তবয়স্কের আকাঙ্ক্ষা আর অপ্রাপনীয়তার মধ্যে যাতায়াত করে এই আলি-ভুলি-ননু।

এই গল্প সংকলনের শেষ গল্পে ননু অনুপস্থিত। আলি-ভুলি এবার বন্ধুত্ব পাতায় খোকাবাবুর সঙ্গে। ননুর মতো খোকাকেও তারা নিয়ে যায় তাদের আশ্চর্য দেশে। কিন্তু এবারের ছবিটা অন্য। আলি-ভুলি খোকাকে নিয়ে যায় এমন এক বাড়িতে, যেখানে প্রতিদিনের খাবার জোটে না; 'খোকা'র বয়সী ফণী ও তার বোন টিনির ক্ষুধার্ত চাউনি, তদের আর্থিক অসামর্থ্য, বাবার অসুস্থতা — খোকাকে অবাক আর ভারাক্রান্ত করে। খোকা জানতে পারে 'দুর্ভিক্ষ'-র কথা। এমতাবস্থায় আরেকদিন খোকাকে নিয়ে আলি-ভুলি পাড়ি দেয় এমন এক রাজ্যে যেখানে ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, পাখি, মৌমাছি — বনের সকলে মিলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশের দিকে তাকিয়ে প্রচুর ফল-মূল-মধু সংগ্রহ করে নিয়ে এসে বলে, "নিয়ে যাও এসব, তোমাদের দেশের মানুষদের খেতে দাও।"[৩৭] সুতরাং, এবারে আলি-ভুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় শিক্ষিত সমাজ কত সচেতনভাবে তাদের পারিপার্শ্বিককে এড়িয়ে যায় — অথচ কত সহজেই সকলে সকলের সঙ্গে মিথোজীবীতার সম্পর্কে ভর করে বাঁচতে পারি। শিবাজী বন্দ্যোপধ্যায় বলেন, "সুখলতা রাওয়ের 'আলি ভুলির দেশ' তাহলে ফ্যালনা আরশি না। কখনও তা দূরবীণ, মেলে ধরে আঁখির সামনে পরিচিত বিশ্ব থেকে পৃথক স্বপ্ন-বিশ্ব; কখনো তা অনুবীক্ষণকল, মেলে ধরে আঁখির সামনে পরিচিত বিশ্বের ভিতরকার দুঃস্বপ্নে ভরা বিশ্ব।"[৩৮]

ছোট্ট দুটি মেয়ের এই ছোট-বন্ধুদের নিয়ে মেতে ওঠা অ্যাডভেঞ্চার প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট গুরুগম্ভীর তত্ত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু তার পরেও বলা হয়, "এই আলি ভুলি বড় সর্বনেশে বন্ধু। তোমরা যেন তাদের সঙ্গে অমন বেশি বন্ধুত্ব পাতিও না।"[৩৯] কেন এমন নির্দেশিকা জারি করা হয়, তা খতিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় সুখলতা রাওয়ের খুড়তুতো বোন লীলা মজুমদারের একটি গ্রন্থকে এর পরিপূরক গ্রন্থ হিসেবে নিয়ে এসেছেন। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় লীলা মজুমদারের 'মণিমালা' বইটি, যেটি প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৮ সাল নাগাদ কলকাতা বেতারকেন্দ্রের 'মহিলামহল' অনুষ্ঠানে 'ঠাকুমার চিঠি' নামক একটি ফরমায়েশি বেতার-কথিকার সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে ১২ থেকে ২২

বছরের মেয়েদের যে সাধারণ ও স্বাভাবিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, সেই 'নিতান্ত ঘরোয়া সমস্যা' নিয়ে আলোচনা ও উপদেশের সংকলন এই বইটিকেই শিবাজী নির্বাচন করেছেন, যার কথক ঠাকুমা স্বয়ং, আর যার মূল চরিত্র 'মণিমালা' — যার অবস্থান আলি-ভুলির বিপ্রতীপে। ১২ বছর বয়স থেকে ২২ বছর পর্যন্ত একটি মেয়ের সম্পর্কে যা যা কাঙ্ক্ষিত, এখানে রয়েছে তারই নির্দেশ। দ্বাদশবর্ষীয়ার প্রতি ঠাকুমার নির্দেশ — "একটু বড়সড় হলে বইরের একটা গাম্ভীর্য থাকলে মানায় বলে ঐ এ বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে বেশি হৈ চৈ না করলেই ভালো।"[৪০] অর্থাৎ, অ্যাডভেঞ্চারের মূল কথা যাতায়াত ও উন্মাদনা — দুটিকেই মেয়েদের ক্ষেত্রে নস্যাৎ করা হল। উপদেশমালার শেষে একুশবর্ষীয় মণিমালার প্রতি উপদেশ — "হাজার হোক শিশু প্রতিপালন মেয়েদের কাজ, তারা মায়ের জাত" অথবা "তুমি যতই আধুনিকা হও না কেন, তোমার স্বামীর পরিচয়ে তোমার পরিচয়, তুমি এখন তাদের বাড়ির লোক।"[৪১] বলতে দ্বিধা নেই, লীলা মজুমদারের মতো লেখিকার বয়ানেও তাহলে উঠে এসেছিল উনিশ শতকীয় ঘর-গেরস্থালির চিন্তা — মেয়েদের অন্দরমহলে, অপরের ছত্রছায়ায় নিজেদের উৎসর্গ করার মধ্যেই জীবনের চরিতার্থতা। তাই ঠাকুমা পত্রের গোড়াতেই মণিকে লিখেছিলেন আলি-ভুলি প্রসঙ্গে — "ভদ্রলোকের মেয়ের ভদ্র ব্যবহার হবে, কথাবার্তায় একটা ছিরি থাকবে, চেহারায় একটা শীলতা থাকবে, চলাফেরায় একটা গাম্ভীর্য থাকবে, নইলে আর শিক্ষা হল কি?"[৪২] অর্থাৎ, আলি-ভুলির অসংস্কৃত উড়নচণ্ডী মনোভাব, একপ্রকার 'ধিঙ্গিপনা' কাম্য নয় মোটেই। তাদের স্মৃতিটাকেও উপড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। এমনকি, গ্রন্থটির ভূমিকাতে লেখিকা অভিভাবকদের উদ্দেশ্যেও বলেন যে, "বাংলার সব মা-বাবারা যদি এই বই পড়তেন আমি কৃতার্থ হয়ে যেতাম" । জনৈক সমালোচকও যখন 'মণিমালা'কে নির্দেশ করেন 'বঙ্গতনয়ার জীবন কাব্য' হিসেবে, তখন বোঝা যায়, সামগ্রিকভাবে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহমুখী চিন্তনই লালিত হতে থাকে একুশ শতকের উদার মননেও।[৪৩]

সুতরাং, বোঝা যায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের এই বহির্মুখী হওয়া মেনে না নেওয়ায় মহিলারাও পুরুষকণ্ঠে দীর্ঘদিন এই মেয়েদের বাড়ির বাইরে পা দেওয়ার বিষয়টির প্রতিবাদ করেছেন। তাই অভিযাত্রায় মেয়েদের বেছে নিতে হয় স্বপ্নের পথ, ঘটে কাল্পনিক সরণ — যে পথে পাড়ি দেওয়া যায় অপেক্ষাকৃত সহজে — যে পথে তাই বারবার বেরিয়ে পড়ে কঙ্কাবতী, বা আলি-ভুলিরা।

'গোয়েন্দা গণ্ডালু'/ নলিনী দাশ

সুখলতা রাও-এর 'আলি-ভুলির দেশে'র পর আমরা তাঁরই প্রিয় ভাইঝি নলিনী দাশের লেখা 'গোয়েন্দা গণ্ডালু' নিয়ে আলোচনা করব। বাংলা সাহিত্যে নলিনী দাশের পরিচিতি মূলত এই রচনাসমূহকে কেন্দ্র করেই। 'সন্দেশ' পত্রিকায় মোট ২৯-টি গণ্ডালু সিরিজের গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। লেখিকার সুযোগ্য পুত্র ও 'গোয়েন্দা গণ্ডালু'র প্রকাশক অমিতানন্দ দাশ 'গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র' (১)-এর ভূমিকায় বলেছেন, "১৯৬৩ সালে 'সন্দেশ'এর দপ্তর চলে আসে আমাদের রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে, আর তখন থেকেই আমার মা (লেখিকা) সন্দেশের সম্পাদনার দৈনন্দিন কাজের ভার নেন। তারপর থেকে নিয়মিত গণ্ডালু রহস্য লিখতে শুরু করেন তিনি।"[৪৪] রচনা ও পত্রিকা প্রকাশ পর্ব হিসেবে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত নির্দেশ করা হয়ে থাকে; গ্রন্থাকারে সমগ্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে; 'গল্প ও উপন্যাস সমগ্র' নামে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে; লেখিকার প্রয়াণের পর।

'গণ্ডালু'র প্রথম আবির্ভাব 'গোয়েন্দা গণ্ডালু' গল্পে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের 'সন্দেশ', শ্রাবণ সংখ্যায়। এই 'গণ্ডালু' কারা? পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সীমানার কাছাকাছি কোনো এক কাল্পনিক অঞ্চলে অবস্থিত একটি মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলের চার সহপাঠী — কালু (কাকলি চক্রবর্তী), মালু (মালবিকা মজুমদার), টুলু (টুলু বোস) ও বুলু (বুলবুলি সেন)। টুলু গল্পগুলির কথক। এরা স্কুলে

একই ক্লাসে পড়ে, বোর্ডিং-এ একই ঘরে থাকে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে যতই পার্থক্য থাক, এরা সকলেই রহস্য সমাধান করতে ভালোবাসে এবং অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বেরিয়ে পড়তে চায়। কালু অসমসাহসী, বুলু খেলোয়াড় হয়েও ভীতু আর মালু কল্পনাপ্রবণ। স্কুলের ছাত্রীদের এরকম রহস্য উদ্ঘাটন ও অভিযানের শখ বাংলা সাহিত্যে এর আগে খুব একটা চোখে পড়েনি। সেদিক দিয়ে এই সিরিজ যথেষ্ট অভিনবত্বের দাবীদার। গৌতম নিয়োগীর 'গোয়েন্দা গণ্ডালু : স্রষ্টা ও সৃষ্টি' প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে উমা সেন, জ্যোৎস্না রায়, অন্নপূর্ণ সেন ও নলিনী চক্রবর্তী — এই চার বন্ধুর দল 'অ্যাডি' শুরু করেছিল পত্রিকায় সাহিত্যচর্চা। সিলেবাস-বহির্ভূত নানা মজাদার কাজে ছিল তাদের উৎসাহ। রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার অনুপস্থিত থাকলেও সম্ভবত সেই সময় থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে লেখিকার মনে দানা বেঁধেছিল কিশোরী-অভিযানের কাহিনি।[৪৫] এছাড়া, অমিতানন্দ দাশের উল্লেখ থেকেও জানা যায়, নলিনী ও কল্যাণী দুই বোনই ছোটবেলা থেকে ব্রিটেনের কিছু পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন, যেখানে 'চোরাকুঠুরি, গুপ্ত সুড়ঙ্গ, সাংকেতিক-ভাষা সহ খুদে গোয়েন্দাদের গল্প' থাকত, হয়তো ছোটবেলা থেকেই তাই 'খুদে গোয়েন্দাদের' কাহিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তিনি।

এরকম অনেক ধরনের সম্ভাবনার প্রকাশ 'গোয়েন্দা গণ্ডালু'। এনিড ব্লাইটনের 'Secret Seven' বা 'Famous Five' –ও নলিনী দাশকে উৎসাহিত করেছিল এই কাহিনি লিখতে। ফেলুদা, কাকাবাবু বা ব্যোমকেশ—কারোর মতই পেশাদারী গোয়েন্দা নয় এরা, প্রশিক্ষণ নেই রহস্য উদ্ধারের। শুধুমাত্র দুঃসাহস আর অভিযানের নেশায় ভর করে এরা জট ছাড়িয়ে ফেলে জটিল থেকে জটিলতর সমস্যার। কখনো এরা পারিবারিক ঘটনা সংশ্লিষ্ট রহস্যের সমাধান করে, উদ্ধার করে মণিমুক্তো, হীরে, দলিল, হারানো ভাই-বোন। কখনো বা মারাত্মক অপরাধীদের সঙ্গে ধরে ফেলে; সোনা পাচারকারী বা ভেজাল ওষুধের কারবারীদের হাতেনাতে পাকড়াও করে। মূলত বুদ্ধিবলেই রহস্য উদ্ঘাটন করে এরা; মারপিট বা খুন জখম নেই গল্পগুলিতে। গোয়েন্দাগিরিতে প্রশিক্ষণহীন কিশোরীদের পরিচিত গণ্ডির বাইরে শখের

অ্যাডভেঞ্চারে মেতে ওঠা এবং সেখানে ঘটনাচক্রে স্বেচ্ছায় রহস্যে জড়িয়ে কাটিয়ে ওঠার যে উত্তেজনাময় কাহিনি — বাংলা সাহিত্যে তা বিরল।

উক্ত অধ্যায়ে আমরা আমাদের বক্তব্য শুরু করেছিলাম অচেনা পথে অ্যাডভেঞ্চার প্রসঙ্গে। কিন্তু 'গোয়েন্দা-গণ্ডালু' এমন এক সিরিজ, যেখানে অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে ওতপ্রোত মিশ্রণ গোয়েন্দাগিরির প্রসঙ্গের। দলের মধ্যে সবচেয়ে কল্পনাপ্রবণ মালু রোমাঞ্চকর গল্প সম্বন্ধে উৎসাহী এবং "সে ঠিক করেছে যে সে বড় হয়ে লেখিকা হবে আর নানারকম অ্যাডভেঞ্চার গল্প লিখবে।" অসমসাহসী কালু আবার ঘরে বসে গল্প না লিখে অ্যাডভেঞ্চার করতে আগ্রহী।[৪৬] দলের সবচেয়ে ভীতু সদস্য বুলু যখন অচেনা রাস্তায় বেরোতে ভয় পায়, তখন মালু তাকে সাহস যোগায় — "চল্, তুই আমাদের সঙ্গেই যাবি — মনে করবি যেন একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে চলেছিস। কি জানি এই গুহার মধ্যে সত্যি হয়তো কোনও রহস্য — কোনও গুপ্তধন আছে।"[৪৭] কখনো আবার টুলুর ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়ার ভয় কাটিয়ে দিতে বলে, "তাহলে একটা বেশ নতুন অ্যাডভেঞ্চার হবে — আমরা হয়তো একটা নতুন দেশই আবিষ্কার করে ফেলব, যেখানে কেউ আগে যায়নি —।"[৪৮] এরকম অসংখ্য উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যায়, যার দ্বারা বোঝানো যেতে পারে যে, ভয়, দুশ্চিন্তাকে উপেক্ষা করে এই চার কিশোরী প্রাথমিক পর্বে পাড়ি দেয় অভিযানে, পরে সেখানে যুক্ত হয় গোয়েন্দাগিরি।

'রাণী রূপমতীর রহস্য' কাহিনিতে কথক টুলু বলে, "আমরা প্রায় প্রত্যেক ছুটির কিছুটা অংশ এইভাবে নানা দেশে কাটিয়ে বেড়াই। একটা বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমরা যেমন রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসি, তেমনি রোমাঞ্চকর ঘটনা যেন আমাদের পিছু পিছু তাড়া করে বেড়ায়। যখনই যেখানে যাই, কোনো না কোণো রহস্যের সন্ধান পাই এবং তার সমাধান না করে ছাড়ি না।"[৪৯] এই উক্তি স্পষ্ট করে দেয় যে, আর পাঁচজন কিশোরীর মতো এদেরও ভালো লাগা ও ভালোবাসার বিষয় হল অচেনা দেশে বেড়ানো তথা অ্যাডভেঞ্চার। কিশোর বয়সের শখ, কিন্তু তা মোটেও ফ্যালনা নয়। 'টাওয়ার হিলের রহস্য' কাহিনিতে টুলুর বর্ণনা —

"আজকের অভিযানের জন্য কালু যা তোড়জোড় করছে, মনে হচ্ছে আমরা যেন কোন এক অজ্ঞাত, রহস্যময় দেশ আবিষ্কার করতে বেরিয়েছি। আমাদের সঙ্গে দড়ি, লাঠি, ছুরি, কম্পাস, হুইস্‌ল্‌, টর্চ, কাগজ-পেনসিল, সামান্য ওষুধপত্র — কি নেই? আর প্রচুর খাবার দাবার ও জল তো আছেই।"[৫০] এই প্রস্তুতি অজানা অভিযানের জন্য তো বটেই, তবে এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গোয়েন্দাগিরির প্রস্তুতিও। কালুর বক্তব্যেও থাকে তার প্রতিধ্বনি। শোনা যায় পাকা গোয়েন্দাদের মতো সাংকেতিক ভাষা প্রয়োগ করতেও। এবং এইভাবেই, অভিযানের নেশায় গোয়েন্দাগিরিতে হাত পাকিয়ে ফেলে চার কিশোরী।

নলিনী দাশ অভিযানের সীমারেখা টানেননি কোনো। ঝাড়খণ্ড-পশ্চিমবঙ্গের সীমানা থেকে শুরু করে কুলু-মানালি, সিমলা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরবঙ্গ — সর্বত্রই গণ্ডালুদের নিয়ে গিয়েছেন। অভিযানের কাহিনিতে ভৌগোলিক ক্ষেত্রপরিচিতি বা প্রাকৃতিক বর্ণনা একান্ত প্রয়োজন। লেখিকাও তা এড়িয়ে না গিয়ে বরং অত্যন্ত যত্নসহকারে সেই বর্ণনা দিয়েছে প্রায় প্রতিটি কাহিনিতে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক — "নর্মদা নদীর দুটি শাখা দুদিকে মাণ্ডুর উত্তরে সাঁড়াশীর মতন ডবল খাদের সৃষ্টি করেছে। ফলে বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিম-ঘেঁসা এই পাহাড়-ঘেরা মালভূমিটুকু যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মালভূমির দক্ষিণ প্রান্তে সুলতান রাজবাহাদুরের প্রাসাদের পরেই খাড়া পাহাড়ের গা নেমে গেছে নিচের সমতলভূমি পর্যন্ত। সবুজ সুন্দর উপত্যকার মধ্য দিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায় নর্মদা নদী এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। মনে হচ্ছে যেন আমরা বর্তমান কাল ছেড়ে চলে গেছি কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে।"[৫১] এমনকি, কোনো কোনো কাহিনিতে মানচিত্রও রয়েছে। এসমস্ত দিক থেকে নলিনী দাশ কাহিনিগুলিতে যথাযথভাবে অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা কাহিনির উপাদানের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন।

'গোয়েন্দা গণ্ডালু' এভাবেই অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা কাহিনির চমৎকার মিশেল। কিন্তু মেয়েদের এভাবে বারমুখো হতে এর আগে বাংলা সাহিত্য বিশেষ দেখেনি। যেটুকু তাদের

গতায়াত করতে দেখা গেছে, তার সবটাই স্বপ্নরাজ্য বা কল্পলোকে। বাস্তব জগতে মেয়েদের, তাও আবার স্কুলের গণ্ডী না পেরোনো মেয়েদের বাবা-মায়েরা কিছুতেই কোলছাড়া করতে দিতে চান না। এই পরিচিত চাহিদা বারবার ঘুরে ঘুরে আসে গণ্ডালুদের মুখে — "আর কোনদিন আমাদের চারজনকে একলা-একলা বেরোতে দেওয়া হবে না —"[৫২] মেয়েরা হীনবল; তাই চারজন মেয়ে একসঙ্গে বেরোলেও তা একা বেরোনোর শামিল — সে কথাই যেন আলগোছে বলে ফেলেন নলিনী। কিন্তু এই চারটি মেয়েকে তো তিনি আঁকতে চেয়েছিলেন চেনা ছকের বাইরে। তাই 'টাওয়ার হিলের রহস্য' গল্পে তারা চারটি মেয়ে অন্ধকারে এক হাঁটু জলে বহুক্ষণ এগোনর পর যখন নিজেদের আবিষ্কার করে, তখন তারা কৈশোরসুলভ চাপল্যে মেতে ওঠে; টাওয়ারের মধ্যে ঢুকে একটু 'ভদ্র' হওয়ার অভিনয় করে। জন্মাবধি মেয়েদের যে ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠবার পাঠ দেওয়া হয়, এই মেয়েগুলি যেন তা তোয়াক্কা করে না। 'ভদ্রতা' তাদের কাছে অতিরিক্ত 'সজ্জা' বিশেষ। আরও একটি ধারণা প্রায় প্রতি গল্পেই ঘুরে ফিরে আসে। ধ্রুবপদের মতো মেয়েরা বলে যায়—"দরকার নেই বাবা, তার চেয়ে কদিন লক্ষ্মী মেয়ে সেজে থাকা যাক,"[৫৩] অথবা "তাই আমরা স্থির করেছি যে এই ছুটিতে আর কোনো এডভেঞ্চার করা হবে না। লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকব আর বাবা-মার সব কথা মেনে চলব। সত্যিই আমরা 'লক্ষী' হয়ে থাকতে চেষ্টা করছি।"[৫৪] এর থেকে বোঝা যায়, বাবা-মা বা সমাজের অভিভাবক শ্রেণি মেয়েদের লক্ষ্মীমন্ত রূপটিই পছন্দ করে। উনিশ শতকেও এই রূপটিই তৈরি করেছিল 'গৃহলক্ষ্মী'র ধারণা, মেয়েরা পায়ে শিকল বেঁধে গৃহ-ঘেরাটোপে নিজেদের বন্দী করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিল। তাই মেয়েদের স্থানিক অতিক্রমণ বা সরণ প্রাথমিকভাবে ঘটেছিল কল্পলোকে। তারপরে মেয়েদের বাস্তব জগতে ঘরে ভেঙে বাইরে পা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। আর তারও অনেক পরে মেয়েরা সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির জোরে রহস্যভেদে উৎসাহী হতে পারে। গণ্ডালু দলের কালু সম্পর্কে টুলুকে বলতে শোনা যায়, "কি দুঃসাহসী মেয়ে আমাদের কালু! আমি তার হাত দুটো শক্ত করে ধরে না রাখলে সে বোধ হয় একাই, শুধু হাতে, ঐ অচেনা

মেয়েটিকে গুণ্ডার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য অন্ধকার গুহার ভিতর ছুটে যেত! ওরা কতজন আছে কে জানে, হয়তো বা অস্ত্রশস্ত্রও থাকবে ওদের সঙ্গে। সত্যিই যদি ওরা গুণ্ডা থাকে, তাহলে আমরা কটি স্কুলের মেয়ে শুধু হাতে ওদের সঙ্গে কি করে এঁটে উঠতে পারব?"[৫৫] কালুর এই দুঃসাহস বা টুলুর এহেন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমাদের সমাজের 'লক্ষ্মী' মেয়েদের সারিতে তাদের বসতে দেয় না। চিহ্নিত করে 'অপর' বা অন্যরকম মেয়ে হিসেবে। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে এই অন্য মেয়েদের সংখ্যা নেহাৎ কম বলে যে কয়জনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, তাদের নিয়েই আমাদের বক্তব্য বিষয় সীমায়িত করা হল।

'কৃষ্ণা সিরিজ' / প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

গণ্ডালুদের বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্যভেদের কাহিনি বেশ উন্মাদনাপূর্ণ হলেও বাংলার প্রথম মেয়ে গোয়েন্দা কিন্তু তারা কেউই নয়। এই তকমা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী-কৃত চরিত্র কৃষ্ণা চৌধুরীর প্রাপ্য। তাই এবারে কৃষ্ণার আলোচনায় আসা যাক্।

প্রভাবতী দেবী বাংলা সাহিত্যে প্রায় বিস্মৃত একটি নাম। তাঁর লেখার সংখ্যা প্রায় তিনশো হলেও বর্তমানে তাঁর লেখা বিশেষ আলোচনায় আসে না, যা সত্যিই বিস্ময়কর। প্রভাবতী দেবীর জন্ম ১৯০৫ সালের ৫ মার্চ, উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙার খাটুরাতে। প্রথাগত স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ করা হয়নি তাঁর। ভাই সত্যসাধনের খাতাপত্রে নিজের উদ্যোগেই লেখাপড়া শুরু করেন তিনি। মাত্র ন' বছর বয়সে সামাজিক নিয়ম অনুসারে বিয়ে হয়ে যায় তাঁর গৈপুর গ্রামের বিভূতিভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা সহ্য না করে তিনি ফিরে আসেন পিত্রালয়ে; চিরকালের জন্যই। প্রভাবতীর বাবা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আইন ব্যবসার কাজে বারবার যাতায়াত করেছেন দিনাজপুর, বহরমপুর, আসামের লামডিং-এ। প্রভাবতীও তাই স্থান-পরিবর্তনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১১ বছর বয়সে কবিতা লেখার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ। সেই শুরু। মাঝে পিতার মৃত্যু তাঁদের সকলকেই এক অনিশ্চিত

ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু দৃঢ়চেতা স্বাবলম্বী প্রভাবতী নিজ উদ্যোগে লেখাপড়া চালিয়ে যান। ১৯২৯ সালে ব্রাহ্ম গার্লস ট্রেনিং কলেজ থেকে টিচার্স ত্রেনিং সার্টিফিকেট পেয়ে সেই স্কুলেই পড়াতে শুরু করেন তিনি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী রমা দেবীর সঙ্গে বাগবাজারে সাবিত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন; নিজগ্রাম খাতুরায় গিয়ে পুনরুজ্জীবিত করেছেন বঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়কে; সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শাখায় যুক্ত হয়ে সমাজসেবার কাজ করেছেন। সেই সঙ্গে লিখেও চলেছেন তিনি। নবদ্বীপ-এর গবেষক সমিতি তাঁকে ভূষিত করেছে 'সরস্বতী' উপাধিতে, ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে লাভ করেছেন 'লীলা পুরস্কার'।

প্রভাবতী দেবীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এতগুলি কথা বলার কারণ হল তাঁর নির্মিত কৃষ্ণা চরিত্রটি অজান্তেই তাঁর চরিত্রের অনেক দিক যে ধারণ করে থাকে — সেই স্বারূপ্য অনুধাবন করা।

প্রভাবতীর সমকালে তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল গার্হস্থ্য, পারিবারিক, সামাজিক ছকে বাঁধা জীবনের গল্পকথন; পুরুষের তৈরি সাহিত্য-ঘরানাতেই কাহিনি বুনন, সমাজ যেভাবে মেয়েদের নির্মাণ করে, সেই নির্মিতির অনুসরণ। হয়তো বা তাঁর দ্রুত বিলুপ্তির কারণ-ও এইগুলিই। কিন্তু নিজের হারিয়ে যাওয়া শৈশব বিষয়ে তাঁর আক্ষেপ কম ছিল না। 'পল্লীসখা' পত্রিকায় তিনি বলেছিলেন — "মেয়েদের শাসন আমাদের দেশে বড়ই কড়া। তাহাদের অতি শিশুকাল হইতেই কঠোর শাসনের তলে থাকিতে হয়। যে সময়টা বিকাশের, সে সময়টা তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ...অন্য দেশে যে সময়টা বালিকাকাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, আমাদের দেশের মেয়েরা সেই সময়ে গৃহের বধূ, অনেক সময়ে সন্তানের মা।" মেয়েদের যন্ত্রণায় তিনি দগ্ধ হতে থাকলেও প্রতিবাদের পরিবর্তে প্রার্থনার পথ নির্বাচন করেছিলেন তিনি — "ভগবানকে জানাই আবার যদি জন্ম দাও, বাংলার মেয়ে করে যেন আমাদের পাঠিয়ো না, ...ঘৃণিত এই বিষ্ঠার কীট করো — সেও ভালো; তবু বাংলার মেয়ে হয়ে

যেন আর না জন্মাই।” আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, বাংলার মেয়েদের এই যে গড় জীবন, যেখানে হতাশা, যন্ত্রণা, অপ্রাপ্তিই মূল বিষয়, সেই বাস্তব ছবিটা বদলে দিতেই তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন ‘কৃষ্ণা’ নামক চরিত্রটিকে; যে এই প্রচলিত ছাঁচ বা প্যাটার্নের বাইরে অবস্থান করে। আর সেই চরিত্রে অজান্তেই মিশে গিয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গ — স্থান থেকে স্থানান্তরিত হয়েও মানসিক স্থিতিশীলতা, পিতৃবিয়োগের পরেও জীবনযুদ্ধে লড়াকু মানসিকতা বা দেশের-দশের ভালো করার আকাঙ্ক্ষা।[৫৬]

বিশ শতকের চারের দশকে দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশনা সংস্থা ‘প্রহেলিকা সিরিজ’, ‘কুমারিকা সিরিজ’, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ’, ‘বিশ্বচক্র সিরিজ’ প্রকাশ করেছিল। এদের মধ্যে ‘প্রহেলিকা সিরিজ’ ও ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ’-এ প্রভাবতী দেবী কৃষ্ণাকে নিয়ে মোট চারটি উপন্যাস লিখেছিলেন, যেগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তখন, কেবমাত্র কৃষ্ণাকে নিয়ে একটি সিরিজ প্রকাশে আগ্রহী হয় প্রকাশকেরা। এর থেকেই জন্মলাভ করে ‘কৃষ্ণা সিরিজ’। এখানে কৃষ্ণাকে নিয়ে সাতটি উপন্যাস লেখা হয়। অর্থাৎ, প্রভাবতী দেবী কৃষ্ণাকে নিয়ে মোট এগারোটি উপন্যাস লেখেন। কৃষ্ণা ছাড়া অগ্নিশিখা বা শিখা নামের আর একজন মেয়ে গোয়েন্দাও তৈরি করেছিলেন প্রভাবতী দেবী, যে গল্পগুলি ‘কুমারিকা সিরিজে’র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তবে ঐ বইটি দুর্লভ বলে কাহিনি বিশ্লেষণের সুযোগ ঘটেনি। আমাদের গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে কৃষ্ণার রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের তিনটি উপন্যাস- ‘গ্রহের ফের’, ‘গুপ্ত ঘাতক’ ও ‘হত্যার প্রতিশোধ’।

ছাত্রীদের জন্য এক আদর্শ চরিত্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণাকে তৈরি করেছিলেন তিনি। ‘সত্যান্বেষী, মেধাবী, বিচক্ষণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মপ্রত্যয়ী’। সে নির্ভীক, ব্যায়াম করে সুগঠিত চেহারার অধিকারী, মাতৃভাষা ছাড়া আরও পাঁচটি ভাষায় পটু, ঘোড়ায় চড়তে, মোটর চালাতে, বন্দুক ছুঁড়তেও দক্ষ। বাবা-মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কৃষ্ণার বাবা মি. সত্যেন্দ্র চৌধুরী বিখ্যাত পুলিশ অফিসার; কৃষ্ণার জন্ম ও বড় হওয়া রেঙ্গুনে। পরে বাবার

সঙ্গে কলকাতায় ফেরত আসা। গল্পগুলি যে সময়ে লেখা হয়েছে, সেই সময়ে কৃষ্ণা কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী।

কলকাতা ও রেঙ্গুন — এই দুই জায়গায় কৃষ্ণার কীর্তি-কাহিনি ছড়িয়ে রেখেছেন প্রভাবতী। কখনও কৃষ্ণা পিতা-মাতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে ভয়ঙ্কর দস্যু ইউউইনের মুখোমুখো হয়েছে, কখনও বা পারিবারিক বন্ধু অতুল মিত্রের একমাত্র সন্তান দেবুকে সে মুক্ত করেছে দস্যু হস্ত থেকে। রোমহর্ষক তার অভিযানে সঙ্গী হিসেবে সে কখনো পেয়েছে তার মামা প্রণবেশ বা পুলিশ অফিসার ব্যোমকেশকে। কিন্তু এই একরত্তি মেয়ে কৃষ্ণার উপর সেইরকম আস্থা তৈরি হয়েছে তাদের বহু দেরীতে। প্রণবেশকে বলতে শোনা গেছে, “কাল রাত তখন এগারোটা হবে, পাগলি মেয়ে বজরাখানার কথা একজনের কাছে শুনেই লাফিয়ে উঠল সেখানে যাওয়ার জন্য। আরে মশাই, ছেলের মতো বুদ্ধি আর সাহস থাকলেও তুই মেয়ে — তোর কি ওই রাত্রে সেই বিদ্যাধরী নদীর ধারে একটা জংলা গ্রামে যাওয়া উচিত?”[৫৭] খবরের কাগজে কৃষ্ণার গোয়েন্দাগিরির খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেও পুলিশকর্তা ব্যোমকেশ কৃষ্ণার উপর বিরক্ত হ’ন, রাগত হন। “একে ছেলেমানুষ, তার উপর সে স্ত্রীলোক; এসব ব্যাপারে হাত দেওয়ার তার কোনো দরকার ছিল না।”[৫৮] আসলে সমস্যা, ‘স্ত্রীলোক’-এর ক্ষেত্রে ‘দরকার’ নেই বলে নয়, সমাজের শাসক ব্যোমকেশের মানসিকতায় এসব কাজে ‘স্ত্রীলোক’-এর অধিকারই নেই। এস.ডি.ও সাহেবের ছেলে অপহরণের মত শক্ত কেস-এ চূড়ান্ত কিছু করার অধিকার তো শুধু পুরুষমানুষেরই। ‘গ্রহের ফের’ গল্পটির সংস্থান কলকাতা ও গৌহাটির মধ্যে যাওয়া-আসা করেছে। সকলেই যখন এস.ডি.ও মি. মিত্রের ছেলে দেবুর অপহরণ বিষয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে, তখন রাত এগারোটা নাগাদ কৃষ্ণা সকলকে চমকে দেবুকে ভয়ানক দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করে থানার ইন্সপেক্টর সুরঞ্জনবাবুর কাছে পৌঁছায়। তখন তিনি তাঁকে ডেকে নেন একটি সাধারণ ধারণার বশবর্তী হয়েই — “এত রাত্রে একা একটি মেয়ে দেখা করতে চায় — নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্তা হয়ে এসেছে।”[৫৯] সুতরাং নারী যতই দৈবীসত্ত্বায় বাঙালির বিপত্তারিণী হন না কেন, বাস্তব চোখে যে ‘বিপদগ্রস্তা’ — এ তার স্বাভাবিক পরিচয়।

অন্য আরেকটি গল্পে, সদ্য পিতৃহারা কৃষ্ণার সাহসে ব্যোমকেশ বিস্মিত হন; কৃষ্ণা বাড়িতে একলা থাকতে চাইলে সেখানে বাহ্যিক দিক দিয়ে তাকে সাহায্য করলেও মনোবল প্রসারে ব্যোমকেশের অক্ষমতাই প্রকাশ পায় বরং, তিনি বলেন, "পাছে তুমি ভয় পাও, সেই জন্যই আমি বলছি কৃষ্ণা, তুমি ছেলেমানুষ, তাতে মেয়ে; বাড়িতে পনেরো দিনের মধ্যে দুটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, তুমি সাহস করে এখানে থাকতে পারবে না বলেই আমি মনে করি।"[৬০] কৃষ্ণার সাহস ব্যোমকেশকে শুধু বিচলিতই করে না, আঁতে ঘা-ও দেয়। প্রায় একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে 'হত্যার প্রতিশোধ' গল্পে। কাহিনিকার কোনো একটি রহস্যভেদের সূত্র প্রাপ্তিতে কৃষ্ণার 'সোল্লাসে' বক্তব্য প্রকাশের উল্টোপিঠে 'উদাসভাবে' ব্যোমকেশের যুক্তি বসিয়েছেন। লেখিকা বলেছেন, "কৃষ্ণার তীক্ষ্মবুদ্ধি তাঁহাকে আহত করিয়াছে। তিনি মনে মনে একটু জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন।"[৬১] এইভাবে বোঝা যায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের চিরকাল অন্তরালবর্তিনী, লজ্জাশীলা, করুণার পাত্রী হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত — তাই শিক্ষিত ব্যোমকেশও কৃষ্ণাকে ঈর্ষা করেন। বাংলা সাহিত্যের অভ্যস্ত পাঠকের কাছেও তাই কৃষ্ণা অন্য একটি মানদণ্ড, সম্পূর্ণ অন্য ধারণার 'মেয়েবেলা' তৈরি করে — যেখানে সমাজ-নির্মিত নারীত্বের ধারণাগুলি লুপ্ত।

প্রচলিত মেয়েদের ছকের বাইরে অবস্থানকারী এই কৃষ্ণার পরিচিতি আগেই দেওয়া হয়েছে। দেখে নেব, কীভাবে এই নির্মিতি সম্ভব হয়েছিল। কৃষ্ণার বাবা মি. চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষা ছিল বিদেশের মাটিতে বাঙালির যশ, খ্যাতি ও সম্মান প্রাপ্তির। তিনি নিজে সেই চেষ্টায় বাংলা থেকে সরে গিয়েছিলেন বর্মায়। কৃষ্ণার মা ছিলেন 'অতিরিক্ত ভীরু; অতিরিক্ত কোমল ও দুর্বল' পল্লীবালা। পিতা চাননি কৃষ্ণা তার মায়ের মত হয়ে বেড়ে উঠুক। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমার ছেলে নেই, তুমি মেয়ে হলেও তোমায় গড়ে তুলেছি ছেলের মতো — আমি আশাও করি আমার যা কিছু অসমাপ্ত কাজ তুমি শেষ করবে, আমার মুখ তুমি উজ্জ্বল রাখবে"[৬২]। এই আকাঙ্ক্ষা একই সঙ্গে কৃষ্ণাকে মেয়ে হয়ে জন্মানোর চিরপরিচিত গ্লানিবোধ থেকে মুক্তি দেয়

এবং তাকে বিশ্বের দরবারে জাতিগৌরব প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়। তাই ষোল-সতেরো বছর বয়সে বাঙালি মেয়েদের মতো কৃষ্ণা 'ভীরু নম্র বা শান্ত' হয়ে বেড়ে ওঠেনি — নিজের শক্তিতে কৃষ্ণা হয়ে উঠেছে আস্থাভাজন, বাবাকে সে সহস জুগিয়ে বলতে পেরেছে — "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবা, আপনার মেয়ে আত্মরক্ষা করতে জানে, সহজে কেউ তার অনিষ্ট করতে পারবে না।"[৬৩]

এহেন কৃষ্ণা তার বীরত্বের মাধ্যমে অপরের কাছে নিজের অজান্তেই হয়ে ওঠে পরিত্রাতা। 'গ্রহের ফের' গল্পে এস.ডি.ও সাহেবের ছেলে দেবু কৃষ্ণাকে আবিষ্কার করেছিল প্রায় 'Super Hero' হিসেবে। "সাধারণত সে যেসব মেয়েকে চারদিকে দেখতে পায়, কৃষ্ণা তাদের অন্তর্গত ছিল না এবং এইখানেই ছিল কৃষ্ণার বৈশিষ্ট্য।"[৬৪] কৃষ্ণার 'অ্যাডভেঞ্চারময় জীবন' দেবুকে বিস্মিত করে। বিদেশী গোয়েন্দার বই বিদেশী ছিলেদের বীরত্বের কাহিনি ফলাও করে লিখলে দেবু ভাবে, "মেয়ে হয়ে সে যতখানি শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে, বাংলার কয়জন ছেলে তা পারে?"[৬৫] মেয়ে হয়েও পুরুষের মতো অসীম শক্তি ও সাহসের অধিকারিনী হওয়ার ফলে দেবু কৃষ্ণাকে নিয়ে গর্ববোধ করে। এমনকি, সে অপহৃত হলেও তার মনে হয় ডিটেকটিভ কৃষ্ণাদি-ই তাকে উদ্ধার করবে নিশ্চয়ই। এতকাল যেকোনো সমস্যার সমাধান প্রকল্পে পুরুষদেরই এগিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল। এই প্রথম কোনো কিশোরীর একক অভিযান ও রহস্যভেদ বাংলা সাহিত্যে তুলে ধরা হয়। সে অর্থে কৃষ্ণাই বাংলার প্রথম 'Super Hero' — যার বাড়তি অলৌকিক কোনো হাতিয়ার নেই, আছে অপরিসীম মনোবল ও সাহস।

অন্যধারার মেয়ে 'হয়ে-ওঠা'কে কুর্ণিশ জানিয়েছিল সংবাদ পত্র — লেখিকা এমন উল্লেখ করেছেন বেশ কয়েকবার। 'গ্রহের ফের' গল্পে দেবু অপহরণের তদন্ত ভার কৃষ্ণা নেওয়ায় সংবাদপত্র লেখে — "বিখ্যাত বার্মিজ দস্যু ইউউইনের চক্রান্ত যে মেয়েটির অসামান্য চাতুর্যের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে সেই অসীম সাহসিকা ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী কৃষ্ণা চৌধুরী এই তদন্তের ভার নিজের হাতে লইয়াছেন"[৬৬]। শুধু সংবাদপত্র নয়, কৃষ্ণার বিরোধী পক্ষ-ও কৃষ্ণার

এই আচরণকে একটু পৃথকভাবেই গণ্য করেছে — দস্যু খাঁজাহান 'মেয়ে গোয়েন্দা' সম্বোধন করে তাকে বলেছে, "তোমার বাহাদুরি আছে বটে, সে জন্যে তোমার প্রশংসা না করে পারিনে। পুরুষ যা করতে ভয় পায়, মেয়ে হয়ে তুমি তাই করতে এসেছ।"[৬৭] তাকে বন্দী করে সে আবার বলেছে, "মেয়েটা বড় শয়তান। ওর কাছে যে রিভলভার ছিল, তা আগে দেখা হয়নি। গায়ে জোরও আছে, বাঙালি মেয়েদের মতো দুর্বল নয়। ...মেয়েটাকে খুব সাবধান, যেন কেউটের বাচ্চা।"[৬৮] সুতরাং, শারীরিকভাবে হীনবল, সামাজিকভাবে অবলা — বাঙালি মেয়েদের যে নেতিবাচক পরিচিতিকে চিরকাল পুরুষশাসিত সমাজ 'glorify' করে এসেছে, বালক দেবু বা ধুরন্ধর দস্যু — এদের প্রেক্ষণবিন্দুতে কৃষ্ণা অবস্থান করেছে উক্ত পরিচিতির সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে। ব্যোমকেশও তা অনুধাবন করেছেন, কিন্তু 'Male ego' তাতে আহত হওয়ায় তিনি বাকিদের মতো তা স্বীকার করতে পারেননি। তাই 'গুপ্ত ঘাতক' গল্পে ইউউইন 'স্ত্রীলোক'-এর উপর 'অত্যাচার' করতে চায় না বললে বা তাকে 'করুণার চোখে' দেখে বললে কৃষ্ণা 'ক্রোধে লাল হয়ে ওঠে।' বোঝা যায়, ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে, বাবার ডায়েরি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষ্ণার মধ্যে যে লড়াকু মানসিকতা তৈরি হয়েছে, তা নারীজাতির প্রতি অপরের করুণাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। ভয়ংকর দস্যু ইউউইন 'হত্যার প্রতিশোধ' গল্পে যেভাবে কৃষ্ণাকে দেখেছে, কৃষ্ণা একেবারেই সেরকম। ইউউইন বন্দিনী কৃষ্ণার প্রসঙ্গে পার্শ্বচর মহীদলকে সাবধান করে বলে — "মেয়েটা বড় চালাক... তাছাড়া সাধারণ মেয়েদের চেয়েও ঢের বেশি শক্তি আছে তার।" মহীদল অবাক হয়ে ভাবে দুর্দান্ত দস্যু ইউউইন-এর ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে ঐ মেয়েটি! জবাবে ইউউইন বলে — "জাত সাপের বাচ্চা, জাত সাপই হয়ে থাকে মহীদল... ওইটুকু মেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে — আমাকে সে যে কোনোরকমে ধরিয়ে দেবে, যাতে চরম শাস্তি পাই তা করবে।"[৬৯] এই বক্তব্যের সূত্রে বোঝা যায় কৃষ্ণা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দুর্বার এবং বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে ঠিক পথেই অগ্রসরমান।

গোয়েন্দা হিসেবে কৃষ্ণা অপ্রতিরোধ্য। একটি মাত্র রিভলভারকে সঙ্গী করে সে মেতে ওঠে প্রতিটি রহস্য ভেদে। ব্যোমকেশ তাকে পুলিশ বাহিনীর যোগান দিয়ে সাহায্য করলেও রণক্ষেত্রে সে একাই। কখনো পুরুষের, কখনো বা ইউরোপীয় মহিলার ছদ্মবেশে পৃথক পৃথক রণকৌশল অবলম্বন করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবাকে বাঁচাতে কখনো সে বলবান বন্দুকধারী আততায়ীকে কিল ঘুষি মারে; দেবুকে উদ্ধার করতে গিয়ে বার্মিজ দস্যুর চাকর সীতারামের "...গলা দুই হাতে চেপে ধরল এবং এমন একটা পেষণ কণ্ঠনালীতে দিল যে, সীতারাম হাত দিয়ে তাকে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত শিথিল হয়ে পড়ল এবং দমবন্ধ অবস্থায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল"[৭০] এবং 'হত্যার প্রতিশোধ' গল্পে দস্যু ল্যাং-কে ধরাশায়ী করে কৃষ্ণাকে বলতে শোনা যায়, "নিজের মুক্তির জন্য যদি তোমায় হত্যাও করতে হয়, আমি তাও করব"[৭১]। 'বাঙালি', 'রিক্তহস্ত', 'বন্দিনী', 'সুবোধ বালিকা' শাড়ি-পরিহিতা কৃষ্ণার প্রতি সকলেরই প্রাথমিক পর্বে জেগেছিল অসীম করুণা — যে ভুল পরমুহূর্তেই সে ভাঙিয়ে দিয়েছে। কোমলস্বভাবা বাঙালি মেয়েদের কাজে কর্মে এরকম 'action' বিরল। শুধু ক্ষিপ্রগতিতে দৈহিক শক্তি দিয়েই কৃষ্ণা বাজিমাত করেনি — তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির কারণেই তাকে বলতে শোনা গিয়েছে — "আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, দেবুকে আমি ফিরিয়ে এনে দেব, জীবন্ত এনে দেব। আপনি আমায় এতটুকু বিশ্বাস করুন দেখি!"[৭২] উক্ত আত্মপ্রত্যয় তার সহজাত। তাই সে বোঝে ব্যোমকেশ-এর পুরস্কার লাভের আকাঙ্ক্ষা, নির্দোষ ব্যক্তিকে ইউউইন বলে নির্দেশ — এসব অপ্রয়োজনীয়। প্রণবেশের অকারণ কান্নাকে সে প্রশমিত করে। সে অনেক অপরিণত বয়সেই "পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া সে শপথ করিয়াছে, যেমন করিয়াই হোক, পিতা ও মাতার হত্যার প্রতিশোধ সে লইবেই, সে শপথ সে রক্ষা করিবেই।"[৭৩] এই দার্ঢ্য ও প্রতিজ্ঞা প্রতি কাহিনিতেই পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। এমনকি, সে একাই রেঙ্গুন যেতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে — হত্যাকারী ইউউইনকে বন্দী করার প্রকল্পে। তাই ব্যোমকেশ যখন বলেন, "তুমি মেয়ে — তার ওপর তোমার বয়স নেহাৎ কম, তুমি তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ কি করে নেবে? সংসারের

কতটুকুই বা তুমি জানো, বল?"[৭৪] তখন মনে হয় ব্যোমকেশ কৃষ্ণার দার্ঢ্য অনুধাবন করতে না পেরে তাকে 'সাধারণ বালিকা'র পর্যায়ে ফেলেছে।

সিরিজ শেষে কৃষ্ণা ইউইউনকে চিহ্নিত করে, নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ধরিয়ে দেয় তাকে। কিন্তু ইউইউন আত্মহত্যা করে। মৃত ইউইউনকে দেখে কৃষ্ণা 'সজল' নয়নে ভাবে, "আজন্ম ব্রহ্মচারী জ্ঞানী ইউইউন – সংসর্গ দোষে সে বীর ইউইউনের কি শোচনীয় পরিণামই ঘটিল" ।[৭৫] বোঝা যায়, কাঠিন্যের পরেও অনুভূতিপ্রবণ একটি সুন্দর মনের অধিকারী কৃষ্ণা। ইউইউনের বীরত্বকে সে শ্রদ্ধা জানায় আর পরিণামে তার প্রতি করুণা জাগে।

অকুতোভয়, প্রত্যুৎপন্নমতি, দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী কৃষ্ণা রেঙ্গুনের বাড়ি বিক্রি করে বার্মার পাট চুকিয়ে কলকাতায় ফিরলে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু সে জানিয়ে দেয়, "সে এমনই কোনো কাজ লইতে চায়, যাহাতে সাধারণের উপকার হইবে এবং নিজেও আনন্দ লাভ করিবে"[৭৬]।

কৃষ্ণার আলোচনা শেষ করার আগে 'মায়াবী কৃষ্ণা'র বিজ্ঞাপনটি উল্লেখ করা একান্ত জরুরি। সেখানে বলা হয়েছিল "মাঝে মাঝে পুলিশের সাহায্য নিতে হলেও কৃষ্ণার বাহাদুরি আছে। ভদ্র ঘরের চরিত্রবতী এই মেয়েটি নিজের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে প্রয়োজনবোধে ছদ্মবেশে, অভিনেত্রীর মন নিয়ে অসাধ্যসাধন করেছে ... স্বৈরাচারী দুর্বৃত্ত নরপশুদের কবল থেকে রক্ষা করেছে ...।"[৭৭] মল্লিকা সেনগুপ্ত তার বইয়ে সমাজ নির্মিত লিঙ্গভেদ অনুযায়ী ভারতীয় নারীর যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- বাধ্য, আবেগপ্রবণ, নিষ্ক্রিয়, অযৌক্তিক, উচ্চাশাহীন, শক্তিহীন, স্বাধীনচেতা না হওয়া, আক্রমণাত্মক না হওয়া এবং সতীত্ব-পবিত্রতার ধারণা সম্পর্কে সচেতনতা।[৭৮] এই দুটি বক্তব্যকে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় কৃষ্ণার কাহিনি পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য থেকে বেরোবার কথা বলতে চাইলেও মেয়েদের সমাজিক লিঙ্গ পরিচিতি সেই উদ্দেশ্য পূরণে দ্বান্দ্বিক অবস্থান তৈরি করে। বিজ্ঞাপনের

বয়ান পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যকেই প্রতষ্ঠা করে। এ কারণেই সম্ভবত সেই সময়ে মেয়ে-গোয়েন্দা তৈরি হওয়া এতোটা সহজসাধ্য ছিল না।

এর পরেও কৃষ্ণা চরিত্রের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। প্রভাবতী দেবী কৃষ্ণাকে কোমলে-কঠিনে সঞ্জীবিত একটি চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালি মেয়েদের করুণাঘন মনটিকে জনকল্যাণের জন্য কাজে লাগাতে। গৃহবাসী বাঙালির অপবাদ ঘোচাতে চেয়েছিলেন বলে কৃষ্ণাকে অবলীলায় রেঙ্গুন-কলকাতায় অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। সর্বোপরি, চেয়েছিলেন কিশোরী, বাঙালি মেয়ের উপরেও সমাজ নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে শিখুক — এই আদর্শায়নের প্রচেষ্টা থেকেই কৃষ্ণার নির্মাণ। সদ্য স্বাধীন দেশে মেয়েদের আত্মরক্ষায় স্বনির্ভর হওয়ার ডাক দিয়েছিল কৃষ্ণা। এখানেই তার 'মেয়েবেলা'র সার্থকতা।

কলাবতী সিরিজ/ মতি নন্দী

বাংলা সাহিত্যজগতে মতি নন্দী একটি অতি জনপ্রিয় নাম। বড়দের-ছোটদের — সকলের জন্য তিনি সমান তালে লিখেছেন। ছোটদের জন্য তাঁর যে সমস্ত লেখা রয়েছে, তার মধ্যে 'কলাবতী সিরিজ' আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই সিরিজে মোট সাতটি গল্প রয়েছে। প্রতিটি গল্পেরই কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে কলাবতী। এই অধ্যায়ে যেহেতু আমরা অ্যাডভেঞ্চার-গোয়েন্দাগিরির মিশেলে ছোটদের বইয়ে এক অন্যরকম 'মেয়েবেলা'র গল্প বিশ্লেষণ করছি, সেহেতু আমরা নির্বাচন করেছি কলাবতীকেও। কলাবতীর গল্পে অ্যাডভেঞ্চার আছে, রহস্যভেদ বা গোয়েন্দাগিরি প্রায় নেই। কিন্তু কলাবতীর এমন একটি নেশা বা আকাঙ্ক্ষার কথা গল্পগুলিতে ফিরে ফিরে আসে বা কলাবতীর চরিত্রটি এমনভাবে তৈরি করেন লেখক, যে, সেই চরিত্রটি তার সমবয়সী আর পাঁচটি মেয়ের থেকে 'অন্য' বা 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত হয়।

মতি নন্দীর এই গল্পগুলিকে একত্র করে 'কলাবতী সমগ্র' প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। মতি নন্দী নিজে পেশাগত দিক দিয়ে ক্রীড়া সাংবাদিক (আনন্দবাজার পত্রিকা) হওয়ার সুবাদে

বিভিন্ন খেলা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আগ্রহী ছিলেন। লক্ষণীয়, তাঁর এই ভালোবাসা দিয়ে তিনি তৈরি করলেন এমন একটি মেয়ে-চরিত্র, যে ভালো ক্রিকেট খেলে এবং যে ভবিষ্যতে ক্রীড়া-সাংবাদিক হতে চায়। 'কলাবতীর দেখা শোনা' কাহিনিটি শুরুই হয় এই বক্তব্যের মাধ্যমে — "কলাবতীর অনেকদিনেরই বাসনা সে খবরের কাগজের খেলার রিপোর্টার হবে"[৭৯]। কলাবতীর পরিচিতি সূত্রে জানানো হয় যে, হুগলির আটঘরার প্রাক্তন জমিদার রাজশেখর সিংহের আদরের নাতনী কলাবতী, যে ঠাকুর্দা ও কাকা সত্যশেখরদের তত্ত্বাবধানেই বড় হয় কলকাতার বাসায়; সে মাতৃহীনা ও পিতা সংসারত্যাগী বলে পিতৃস্নেহবঞ্চিতা; কাঁকুড়গাছি স্কুলের ছাত্রী, স্কুলের অধ্যক্ষা মলয়া মুখার্জীর প্রিয়পাত্রী এবং "সে ভালো ক্রিকেট খেলে। বাংলা দলের হয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছে।"[৮০] পেশা নির্বাচনে কলাবতীর খেলোয়াড় সত্ত্বা তাকে যতই সাহায্য করুক না কেন, সামাজিক কাঠামো এখনো পেশার জগৎকে পুরুষালি ও মেয়েলি এই দুইভাবে প্রচ্ছন্নভাবে যে ভেঙে রেখেছে, তা স্পষ্ট হয় অধ্যক্ষা মলয়া মুখার্জীর বক্তব্যে — "স্পোর্টস জার্নালিজম তো পুরুষদের একচেটিয়া; ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, কলকাতায় যত পপুলার খেলা সেখানে তো পুরুষদেরই প্রাধান্য, মেয়েদের নামই তো কাগজে দেখি না। প্লেয়াররা পুরুষ তাই রিপোর্টাররাও সব পুরুষ, তুমি কি তাদের সঙ্গে সেখানে কাজ করতে পারবে?"[৮১] দেশের প্রসঙ্গ টেনে কলাবতীর দাদু রাজশেখরও বলতে চান — "এদেশের মেয়েরা স্পোর্টস রিপোর্টার হয় না। জলসার হয়, রাজনীতির হয়, সিনেমা, ফ্যাশন, ছবির একজিবিশন, ধর্মসভা, সাহিত্যসভা সবকিছুরই মেয়ে রিপোর্টার হয়, কিন্তু খেলার হয় না।"[৮২] প্রশ্ন তৈরি হয়, খেলার প্রতি মেয়েদের যে স্বাভাবিক গড়পরতা অনাগ্রহ, তা-ই কি তাদের খেলার খবর তৈরির কাজে এগিয়ে আসতে বাধা দেয় — এবং এই খেদ থেকেই কি 'কলাবতী'র নির্মাণ? আবার সামাজিক গড়ন অনুযায়ী ক্রীড়া সাংবাদিকতার মতো পুরুষালি একচেটিয়া আধিপত্যের ক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে এলে তাদের কি নানাভাবে একপেশে করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে না? সেই

বিষয়টি খুব সত্য করে বুঝেছিলেন বলেই কি মতি নন্দী একটি সপাট জবাব তৈরি করতে চেয়েছিলেন কলাবতীর মাধ্যমে?

পরিসংখ্যান বলছে, ১৯০১ সালে কলকাতার মহিলা ফোটোগ্রাফার ছিলেন ৫ জন। ১৮৯৮ সালে ফোটোগ্রাফিকে প্রথম পেশা হিসেবে গ্রহণ করে সরোজিনী ঘোষ।[৮৩] ভারতবর্ষেও প্রথম যিনি ক্রীড়া সাংবাদিকতায় এগিয়ে আসেন, তিনিও ছিলেন মূলত চিত্র সাংবাদিক। বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি এই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই পেশায় উৎসাহী মহিলাদের সংখ্যা বেশ কম। দেশের মোট কর্মরতা মহিলাদের ৩% এই পেশায় আসেন — সমীক্ষা বলছে, পুরুষালি দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের প্রতি অসহযোগী মনোভাব ও তাদের নান বিষয়ে উত্যক্ত করে, মানসিক চাপ তৈরিই এর মূল কারণ। এতটা গভীরভাবে না হলেও কলাবতীকে আমরা প্রায় এর সবক'টি ধাপই পেরোতে দেখি।

স্কুলের ছাত্রী কলাবতী শুধুমাত্র আগ্রহের খাতিরেই 'বঙ্গবাসী' কাগজে খেলার সাংবাদিকতার ট্রেইনি হিসেবে যোগ দিতে চাইলে সম্পাদক সদানন্দ বাবু সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, "তুমি এখানে কী কাজ শিখবে, তাও আবার স্পোর্টস। ওখানে তো পুরুষদের রাজত্ব।"[৮৪] যদিও এর আগে কলাবতী খেলা-বিষয়ক বহু আলোচনা করেছে এবং নিজের খেলোয়াড় পরিচিতিও লুকিয়ে রাখেনি। তবু সে মেয়ে — অফিসে সে এসেছিল নিত্যদিনের সঙ্গী জিন্‌স-শার্ট ছেড়ে, শাড়ি পরে — পুরোদস্তুর 'মেয়ে সেজে' — ভাবটা এই — "আমি একটা মেয়ে। তোমাদের কাগজে কাজ করতে বা শিখতে চাই। দিতে হয় দাও, নয়তো চলে যাও।"[৮৫] বোঝা যায়, কলাবতী কিশোরী হলেও সে দৃঢ়চেতা — 'মহিলা-পরিচিতি'কে সম্বল করেই সে এগিয়ে যেতে চায় লক্ষ্যে, ভাঙতে চায় প্রচলিত ধারণা।

এই কাহিনিতে কলাবতী ক্রীড়া-সাংবাদিকের ভূমিকায়, দুটি অন্যরকম কাজ করে। বড়দির দাদা-বৌদির একমাত্র মেয়ে ঝুপুকে টেনিস সর্বস্ব জীবনে গুঁজে দিয়ে তাকে নিয়ে

ফিচার লিখতে বললে সাবলীল কলাবতী তা অস্বীকার করে। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৮-এর অলিম্পিক ট্রায়ালে লং জাম্প-এ যে ভুল তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, তার সূত্র আবিষ্কার করে তা নিয়ে লেখে। লক্ষণীয়, এতদিনের পুরুষ ক্রীড়া সাংবাদিকেরা ম্যাচ-গড়াপেটার খবর যেভাবে চেপে যাচ্ছিলেন, তা ফাঁস করে কলাবতী আবার এই পেশার সংবেদনশীল কোণগুলিও চোখের সামনে স্পষ্ট করে তোলে। সিরিজ-শেষে দেখানো হয় না যে, কলাবতী আদৌ তার লক্ষ্য পূরণে সফল হয়েছে কিনা, কিন্তু তার এই অপ্রচলিত আকাঙ্ক্ষা বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যে মেয়েদের সমান্তরাল একটি স্থান তৈরি করে দেয়।

উক্ত কাহিনিটি যেখানে কলাবতীর অন্যরকম পেশাপ্রীতির চিহ্ন, তেমনই ‘কলাবতী ও মিলেনিয়াম ম্যাচ’ গল্পটি পুরোটাই খেলোয়াড় সত্ত্বার প্রতীকী। একটি খেলায় কলাবতীর প্রকৃত ভূমিকা এ গল্পে বিশদে দেখানো হয়। ‘কলাবতী ও খয়েরি’ গল্পে যদিও কলাবতীর পশুপ্রীতি অনেকটাই জায়গা করে নেয়, তবুও গল্পের প্রথমদিকে বারবার ঘুরে আসে পাড়ার ক্রিকেট টিম তৈরির প্রসঙ্গ, তাতে কলাবতীর যোগদান, উইকেট কিপিং-এ কলাবতীর প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গ ইত্যাদি। কলাবতীর সবক’টি গল্পেই কমবেশি ফিরে আসে এই খেলার কথা। কলাবতীর বয়সী একটি মেয়ের কৈশোরকাল যেভাবে কাটে, কলাবতী সেখানে অন্য এক স্বপ্নে মশগুল। আসলে, মেয়েদের খেলার জগতে আসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, কখনো আবার বাধা দেন অভিভাবকেরা। কলাবতীর বন্ধু রাধারানীর ইচ্ছে তাই অপূর্ণ থেকে যায়, ভালো রেজাল্ট করাটাই কৃতিত্বের স্মারক হয়ে ওঠে — ভালোবাসা চাপা পড়ে যায়। মেয়েদের ক্রিকেটে যে ‘খ্যাতি’ ও ‘টাকা’ — দুটোই কম আসে — এ সত্যও প্রকাশিত হয়। এরই মাঝখানে কলাবতীর অদম্য উৎসাহ ও ইচ্ছে তাকে ক্রিকেটার করে তোলে — খেলোয়াড়ের মানসিকতা তার নতুন সত্ত্বা তৈরি করে। মতি নন্দী সম্ভবত কলাবতীর মাধ্যমে আরও অনেক কিশোরীর অন্যরকম স্বপ্ন তৈরি করেন।

অ্যাডভেঞ্চার-কেন্দ্রিক আলোচনাই এই অধ্যায়টির মূল বিষয়, তাই কলাবতীর অ্যাডভেঞ্চারও এখানে উল্লেখ্য। 'ভূতের বাসায় কলাবতী' কাহিনিতে অকুতোভয় কলাবতী বন্ধু সুস্মিতার সাহায্যে ভূতের রহস্য উদ্ধার করতে গিয়ে এক ফুটবলারের উপর হতে থাকা অত্যাচার থেকে তাকে উদ্ধার করে। নানা দুঃসাহসী অভিযানে লিপ্ত হয়। উক্ত অঞ্চলের জনমানস থেকে ভূতের ভয় ভাঙিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনে এবং উজ্জ্বল খেলাধুলোর পরিবেশ তৈরি করে দেয়। বোঝা যায়, কলাবতীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে ক্রীড়াপ্রীতি — অ্যাডভেঞ্চার প্রীতি তার পরিধি বিশেষ।

বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যে মেয়েদের অভিযান কাহিনি যে খুব একটা লেখা হয়নি, তা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনার শুরুতেই বলে নিয়েছিলাম। তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছিল সেখানে। J. Doyne Farmer বলছেন, "...we mean by adventure fiction, an adventure involves an unusual experience or course of events marked by excitement or suspense. It is something out of the ordinary, and often involves an unusual challenge"।[৮৬] সাহিত্যে বহু যুগ থেকেই অজানাকে জানার আকর্ষণ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেই সূত্রে বলা যেতেই পারে যে, প্রাচীন সাহিত্য সংরূপগুলির মধ্যে এই ধারা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল। আধুনিক সাহিত্যে যখন অভিযান কাহিনি লেখা হ'ল, (আমরা ব্যাপক অর্থে এই পরিভাষা ব্যবহার করতে চাইছি, কারণ, অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা, রহস্য—সব কটি শাখাই এখানে অন্তর্ভুক্ত করা চলে), তখন সময় ও সংস্থান অনুযায়ী তার প্রকারভেদ তৈরি হতে থাকল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকল যে ক'টি উপাদান, সেগুলি হ'ল—বয়স, লিঙ্গপরিচিতি, জাতিসত্তা, সামাজিক পরিচিতিসূত্র ইত্যাদি। কাহিনির 'নায়ক' চরিত্র নির্বাচন ও নির্মাণে, বিশেষ করে অভিযান কাহিনির ক্ষেত্রে, এই আঙ্গিকগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরো একটি উপাদান—স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ। যে সমাজ দীর্ঘকাল ধরে মেনে চলে, "পথে নারী

বিবর্জিতা” বা আট বছরের কন্যা বিবাহযোগ্যা, সেই সমাজ যে মেয়েদের অভিযানে বেরোতে দিতে স্বচ্ছন্দ হবে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে এই একই বিষয় পাশ্চাত্যের সাহিত্যেও খুব একটা কম ঘটেনি। Margery Hourihan বলেছেন,

> “As Ursula Le Guin points out (Le Guin 1993a:8) heroes are traditionally male and the hero myth inscribes male dominance and the primacy of male enterprises. Stories about female warriors such as Boadicea and Joan of Arc may appear to be exceptions but in most retellings of their exploits, they are little more than honorary men who undertake male enterprises in a male context and display ‘male’ qualities: courage, single-minded devotion to a goal, stoicism, selfconfidence, certitude, extroversion, aggression. Heroism is gendered.”[৮৭]

কিন্তু, এর সঙ্গে এই বক্তব্যও উঠে আসে যে,

> “The difficulty of being a hero, that is of being conventionally masculine, is one of the issues raised in Michael Ende’s internationally popular metafictive children’s story, *The Neverending Story* [1979]. This tale uses a number of devices to subvert the traditional image.”[৮৮]

বাংলা সাহিত্যেও এই বিনির্মাণ ঘটেছিল ধীরে ধীরে। মেয়েরা হয়ে উঠছিল অভিযানের ‘নায়ক’, বিশেষ কোনো পুরুষালি বৈশিষ্ট্য ছাড়াই। যেসব উপন্যাসে মেয়েরা মূল ভূমিকায় আসতে পারেনি, তারা এসেছে অভিযানের বা রহস্য উদ্ধারের বা গোয়েন্দাগিরিতে সহকারীর ভূমিকায়। বাংলা সাহিত্যে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন ‘বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি’ আর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন ‘ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি’। তবে এঁরা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক গোয়েন্দা। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মহিলা গোয়েন্দা হৈমন্তী আর বিশাখাও সমগোত্রীয়। নব্বইয়ের দশকে এসেছিলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্যের প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জী, ওরফে মিতিন মাসি।[৮৯] এদের পাশে আমরা উল্লেখ করতে পারি এক ঝাঁক কিশোরীকে, যারা অভিযানের সহকারী। এই ধারায় প্রথমেই উল্লেখ্য হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘সোনার পাহাড়ের যাত্রী’র মৃণু । কিশোরী

হয়েও শিশুর মত সরল-ছটফটে মৃণু মেয়েদের অ্যাডভেঞ্চার প্রসঙ্গে বলে, " মেয়ে হলেই যে আলমারির সাজানো পুতুল হতে হবে, এ কথা আমি মানব না....মেয়ে হলেই ভীরু হতে হবে? তুমি তো জানো বিমলদা আমিও বন্দুক-ছোরা ধরতে পারি!"[৯০] এইরকমই নির্ভীক মিতিন মাসির সহকারী টুপুর। সৈয়দ মুজতবা সিরাজের কিশোর গোয়েন্দা নীলুর গোয়েন্দাগিরিতে সাহায্য করে 'দ্বাদশবর্ষীয়া' বুবু, ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় মনুর বিধান। লীলা মজুমদারের 'হলদে পাখির পালক'-এ দাদা বোগির যাবতীয় অভিযানের সঙ্গী হয় বোন রুমু, 'বাতাসবাড়ি'-তে ঠুলি-পম্পা, 'হাওয়ার দাঁড়ি'তে মুংরি-চম্পা-টেমি ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে বিচিত্র কান্ড ঘটায়। ওঁর লেখা 'মাকু' উপন্যাসে সোনা-টিয়া দুই বোন পাড়ি দেয় অজানাপথে, বনের ভিতরে, 'মাকু'র জগতে — আধো স্বপ্ন-আধো জাগরণ স্তরে যাওয়া-আসা করে দুই বোনের অভিযান-রহস্য-ভেদ এবং আজব কীর্তির পরিসর। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ববির বন্ধু' গল্পে মিনি দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে জেদের বশেই অভিযানে সঙ্গ নেয়, আবার 'হাওয়াগাড়ি গাড়ি হাওয়া' গল্পের মূল চরিত্রে যে মেয়েটি, সে অক্লেশে কাচি দিয়ে নিজের লম্বা চুল কেটে ফেলে, কখনো ইলেক্‌ট্রিকের আলো সারাতে বসে পড়ে, কখনো বা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে—একপ্রকার নিজের মর্জির মালিক সে—এই 'ধাড়ি মেয়ে'গিরি পরিবার তথা সমাজের চক্ষুশূল হলেও মেয়েটি তাকে তোয়াক্কাও করে না।

এইরকম অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে বাংলা শিশুকিশোর-সাহিত্যে, যারা স্বপ্নলোক হোক, বা বাস্তবভূমি, সর্বত্র একা বা সহযোগী হয়ে থেকেও নিজের ইচ্ছেয় বিচরণ করে চলে। এই চলন অবিরাম। এই সরণ একক কোনো চরিত্রের নয়, এ আসলে রক্ষণশীল মানসিকতার সরণ। এভাবেই পরিসমাপ্ত করা যাক বাংলা শিশুকিশোর-সাহিত্যে মেয়েদের অন্যরকম পরিচিতির গল্প। ব্রাত্য বা প্রান্তিক হলেও তারা দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী — সমাজ-পরিবর্তনের দিশারী।

তথ্যসূত্র ::

১। Collins Cobuild, *Essential English Dictionary*, London, William Collins Sons & Co Ltd, 1988, p. 16

২। https://en.wikipedia.org/wiki/Adventure_fiction on 13.01.2021, at 10.56 am

৩। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, "সাদা মানুষের দায়' ও কালো মানুষের দায়িত্ব", 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব: সমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা সাহিত্য", কলকাতা, প্যাপিরাস, পৃ. ২৫৩

৪। তদেব, পৃ. ২৮০

৫। তদেব, পৃ. ২৮১

৬। তদেব, পৃ. ২৮১

৭। তদেব, পৃ. ২৮২

৮। তদেব, পৃ. ২৯২

৯। তদেব, পৃ. ২৭৭-৭৮

১০। সোহিনী সিনহা, 'চাকুরীজীবী বাঙালিনী: প্রয়োজন ও পরম্পরা--উনিশ থেকে বিশ শতক', কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৬৬

১১। সেলিনা হোসেন, "গীতা ও নায়রিন", মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, 'জেন্ডার বিশ্বকোষ', ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশন, ২০০৬, পৃ. ৭২৩

১২। Sudhir Kakar and Katharina Kakar, 'Portrait of a People', Penguin, 2007, p. 3

১৩। প্রদীপ বসু, "পরিবারে ধর্ম", 'অনুষ্টুপ', সপ্তত্রিংশ বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭

১৪। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, 'অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা', কলকাতা, স্ত্রী, ১৯৯৫, পৃ. ১৬১

১৫। সোহিনী সিনহা, 'চাকুরীজীবী বাঙালিনী: প্রয়োজন ও পরম্পরা উনিশ থেকে বিশ শতক', কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৬৯

১৬। সংকলন ও সম্পাদনা ভারতী রায়, "নারী ও পরিবার", 'বামাবোধিনী পত্রিকা', কলকাতা, আনন্দ, ২০০২, পৃ. ৩৬

১৭। তদেব, পৃ.৬৯

১৮। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, 'অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা', কলকাতা, স্ত্রী, ১৯৯৫, পৃ. ১৭১

১৯। সোহিনী সিনহা, 'চাকুরীজীবী বাঙালিনী: প্রয়োজন ও পরম্পরা উনিশ থেকে বিশ শতক', কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৯-১৬

২০। Tanika Sarkar, *Hindu Wife Hindu Nation: Community, Religion and Cultural Nationalism,* Permanent Black, 2001, p. 230

২১। Ellen Kenedy and Susan Mendus, *Women in Western Political Philosophy,* Palgrave Macmillan, 1987, p. 2

২২। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, 'অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা', কলকাতা, স্ত্রী, ১৯৯৫, পৃ. ১৭২

২৩। তদেব, পৃ. ১৬৯

২৪। সোহিনী সিনহা, 'চাকুরীজীবী বাঙালিনী: প্রয়োজন ও পরম্পরা উনিশ থেকে বিশ শতক', কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ১২

২৫। Bharati Roy, 'Women in Calcutta The Years of Change in Calcutta', Ed. by Sukanta Chaudhury, *The Living City- Vol.2*, Calcutta, Oxford, p. 34-41

২৬। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ৫৩

২৭। সোহিনী সিনহা, 'চাকুরীজীবী বাঙালিনী: প্রয়োজন ও পরম্পরা উনিশ থেকে বিশ শতক', কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৪৩

২৮। নারায়ণ সান্যাল, "বাঙলাভাষায় কিশোরী-সাহিত্য", 'কিশোরী সমগ্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫-১৬

২৯। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কঙ্কাবতী, পৃ. ৯৯

৩০। তদেব, পৃ. ১০০

৩১। তদেব, পৃ. ১৬৮

৩২। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা অনুবাদ টীকা, 'মনুসংহিতা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ-১৬৩-১৬৪,

৩৩। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কঙ্কাবতী, পৃ. ১৯৬

৩৪। তদেব, পৃ. ২১৬

৩৫। তদেব, পৃ. ২৫৬৩৬। জয়িতা বাগচী সম্পাদিত, 'সুখলতা রাও রচনা সংগ্রহ-২', কলকাতা, থীমা, ২০০০, পৃ. ৪৫

৩৭। তদেব, পৃ. ১০২

৩৮। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, " 'সাদা মানুষের দায়' ও কালো মানুষের দায়িত্ব", 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, প্যাপিরাস, পৃ. ৩৭

৩৯। জয়িতা বাগচী সম্পাদিত, 'সুখলতা রাও রচনা সংগ্রহ-২', কলকাতা, থীমা, ২০০০, পৃ. ৪৬

৪০। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, " 'সাদা মানুষের দায়' ও কালো মানুষের দায়িত্ব", 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, প্যাপিরাস, পৃ. ৪০

৪১। তদেব, পৃ. ৪৪

৪২। তদেব, পৃ. ৪৫

৪৩। তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, 'লীলা মজুমদার', কলকাতা, কোরক, ২০০৭, পৃ. ১৬০

৪৪। অমিতানন্দ দাশ, "ভূমিকা", নলিনী দাশ, 'গোয়েন্দা গন্ডালু সমগ্র(প্রথম খন্ড)', কলকাতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১৩

৪৫। গৌতম নিয়োগী, 'গোয়েন্দা গণ্ডালু : স্রষ্টা ও সৃষ্টি'

৪৬। নলিনী দাশ, 'গোয়েন্দা গন্ডালু সমগ্র (প্রথম খন্ড)', কলকাতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১৩, পৃ. ২৫

৪৭। তদেব, পৃ. ৫২

৪৮। তদেব, পৃ. ৫৩

৪৯। তদেব, পৃ. ৮৫

৫০। তদেব, পৃ. ১৩১

৫১। তদেব, পৃ. ৭৫

৫২। তদেব, পৃ. ৭৬

৫৩। নলিনী দাশ, 'গোয়েন্দা গন্ডালু সমগ্র (প্রথম খন্ড)', কলকাতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১৩, পৃ. ১৩৪

৫৪। তদেব, পৃ. ১৪২

৫৫। নলিনী দাশ, 'গোয়েন্দা গন্ডালু সমগ্র (প্রথম খন্ড)', কলকাতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১৩, পৃ.৫৭

৫৬। প্রভাবতীর জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত আবাহন দত্তের ১৭ অগস্ট, ২০১৯-এর 'বিস্মৃত এক সরস্বতী' নিবন্ধ থেকে।

৫৭। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গ্রহের ফের', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ২৪

৫৮। তদেব, পৃ. ৩৬

৫৯। তদেব, পৃ. ৪৯

৬০। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গুপ্ত ঘাতক', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ৩৫

৬১। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'হত্যার প্রতিশোধ', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ১৬

৬২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গুপ্ত ঘাতক', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ৬

৬৩। তদেব, পৃ. ১৩

৬৪। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গ্রহের ফের', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ১

৬৫। তদেব, পৃ. ৭

৬৬। তদেব, পৃ. ২১

৬৭। তদেব, পৃ. ৩৯

৬৮। তদেব, পৃ. ৪২

৬৯। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'হত্যার প্রতিশোধ', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ৩৮

৭০। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গ্রহের ফের', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ৪৭

৭১। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'হত্যার প্রতিশোধ', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ৪৪

৭২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গ্রহের ফের', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ২৩

৭৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গুপ্ত ঘাতক', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ২৮

৭৪। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'হত্যার প্রতিশোধ', কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, পৃ. ৩

৭৫। তদেব, পৃ. ৪৭

৭৬। তদেব, পৃ. ৪৮

৭৭। শুকতারা, বৈশাখ, ১৩৫৯ সংখ্যা

৭৮। মল্লিকা সেনগুপ্ত, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৫৩-৫৪

৭৯। মতি নন্দী, "কলাবতীর দেখা শোনা", 'কলাবতী সমগ্র', কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ৩

৮০। তদেব, পৃ. ৩

৮১। তদেব, পৃ. ৪

৮২। তদেব, পৃ. ১১

৮৩। সোহিনী সিনহা, 'চাকুরীজীবী বাঙালিনী: প্রয়োজন ও পরম্পরা উনিশ থেকে বিশ শতক', কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ.. ৩০-৩১

৮৪। মতি নন্দী, "কলাবতীর দেখা শোনা", 'কলাবতী সমগ্র', কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ১৯

৮৫। তদেব, পৃ. ১৯

৮৬। http://tuvalu.santafe.edu/~jdf/papers/adventure4.pdf on 16.06.2020 at 1.30 pm

৮৭। Hourihan Margery, *Deconstructing The Hero*, London and New York, Routledge, 2005, p. 67-68

৮৮। Ibid, p.69-70

৮৯। নির্মাল্য কুমার ঘোষ, 'বাংলা শিশু সাহিত্য পাঠের ভূমিকা', কলকাতা, ছোঁয়া, ২০২০, পৃ. ৫১

৯০। তদেব, পৃ. ১৫১

উপসংহার

আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য শিশু-কিশোর সাহিত্যে কীভাবে উল্লেখ বা অনুল্লেখের দ্বারা উপস্থাপন বা বর্জনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপটি নির্মিত হয়েছে। গবেষণার শুরুতেই আমি শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিস্তৃত পরিধি থেকে এই গবেষণার পক্ষে উপযোগী নির্দিষ্ট কয়েকটি সংরূপ নির্বাচন করে নিয়েছিলাম। শিশু-কিশোর সাহিত্য সংরূপটির বিষয়ে সম্যক আলোচনার পর সমাজ ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ ও বিশ শতকে বাংলা ভাষায় রচিত শিশু-কিশোর সাহিত্যে কীভাবে মেয়েরা প্রতিগৃহীত হয়েছে, তার বিস্তারিত আলোচনা আমি করেছি।

দার্শনিকদের চেতনায় 'শিশু'র পরিচিতি মূলত ছিল লিঙ্গনিরপেক্ষ। কিন্তু ফ্রয়েডীয় চিন্তা চেতনার (ইডিপাস কমপ্লেক্স) সূত্রে 'শিশু'র ধারণায় যুক্ত হ'ল যৌনতার ধারণা। বিশ শতকের সূচনা থেকে তাই শিশুর জৈবিক লিঙ্গপরিচিতি গুরুত্ব পেয়েছে। 'কৈশোর'-এর সংজ্ঞা নির্মাণে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক মাত্রা। বিশ শতকের চারের দশক থেকে আবার 'Gender Stereotype' অতিক্রম করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। সুতরাং, মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপ নির্মাণ বিষয়টি সময়-সমাজ-সংস্কৃতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত হয়েছে এবং তার প্রভাবে শিশু-কিশোর সাহিত্যের সংরূপগুলির মধ্যে প্রধান চরিত্র হিসেবে মেয়েদের প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। এই বিষয়টি আমার প্রথম অধ্যায়ের শেষ পর্বে আলোচিত হয়েছে।

উনিশ শতকের ছোট মেয়েদের 'শৈশব' বা 'বালিকাদশা' থাকলেও সামাজিক রীতি-নীতির কারণে তাদের 'কৈশোর' বলে পৃথক কোনো 'পরিসর' ছিল না। তাই ঐ সময়ে রচিত শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েরা আলোকপ্রাপ্ত নয়। আমরা দেখেছি, মেয়েদের উদ্দেশ্যে রচিত 'উপদেশমূলক সাহিত্যে' তাদের নৈতিকতার পাঠ দেওয়া হয়েছে এবং সামাজিক অনুশাসনের নিরিখেই নির্ণীত হয়েছে তাদের 'মেয়েবেলা'।

বিশ শতকে পরিবর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী শিশু-কিশোর সাহিত্যের স্বরূপ বদলে যায়। দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, ঔপনিবেশিক শাসন-তর্জনের যন্ত্রণা, স্বাধীনতা আন্দোলন, ইত্যাদির ফলে মূল্যবোধের সংকট তৈরি হয়। তাত্ত্বিক জগতে নারীবাদী আন্দোলন মেয়েদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিকোণের সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটায় ও এর প্রতিক্রিয়ায় এমন অনেক রচনা পাওয়া যায়, যেখানে মেয়েরাই মূল চরিত্রে আসীন। সামাজিক লিঙ্গবৈষম্যের যে তীব্রতা, তা অনেকটাই প্রশমিত হয়। এমনকি, বিশ শতকের শিশু-কিশোর সাহিত্য ছেলে ও মেয়ে—উভয়ের সমানাধিকারের প্রশ্ন তোলে। ফলত, গবেষণার শেষে নারীবাদী তত্ত্বের সূত্রে এই সময়ের লেখাগুলির নতুন পাঠ সম্ভাবনা লক্ষ করেছি আমি।

বাংলার লৌকিক 'ছড়া' এবং পরবর্তীকালে রচিত মৌলিক ছড়া—উভয়ক্ষেত্রেই মেয়েদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তফাৎ একটাই, মূলত সমাজের নারী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে মৌখিক পরম্পরায় বাহিত ছড়াগুলিতে যেখানে মেয়েদের দিনযাপনের যন্ত্রণাই পরিস্ফুট হ'ত, সেখানে পরবর্তীকালের ছড়াকারেরা মেয়েদের অন্তর্লোক উন্মোচিত করলেন, তাদের স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা করলেন। দুই শতকের ছড়ার পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণে আমি তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখিয়েছি যে, বিশ শতকের ছড়ায় ধরা পড়েছে শ্রেণিসংগ্রাম, বাৎসল্য, ভাই-বোন সম্পর্কের নতুন বিন্যাস, রূপকথার বাস্তবসম্পৃক্তি – এর সবটাই ঘটেছে মেয়েদের নতুন আত্মপরিচিতি নির্মাণের ফলে।

রূপকথা আদ্যন্ত পুরুষকেন্দ্রিক গল্প বলেই সমাদৃত ছিল বহুকাল, কারণ তার মূল চরিত্রে ছিল সবসময়েই কোনো রাজপুত্র। সংগৃহীত রূপকথাগুলিতে মেয়েদের নিজস্ব স্বর বারেবারেই চাপা পড়ে থেকেছে রাজপুত্রের বীরত্বের গরিমায় বা মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সতীত্বের তথা সার্থক নারীত্বের বিচিত্র শর্ত আরোপে। বিশ শতকের পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে রূপকথার অবয়বে যেমন বদল এলো, তেমনি পুরুষ-কর্তৃত্ব খর্ব করে মেয়েরাই হয়ে উঠলো চালিকাশক্তি। সুতরাং, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, নারীর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, স্ত্রী-

পুরুষের মধ্যে সমমনস্কতার বোধ সমাজ-সংস্কৃতির সূক্ষ্ম স্তরে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে আধুনিক রূপকথাকে আমরা চিহ্নিত করলাম মেয়েদের অভিযান বা মেয়েদের স্বপ্নপূরণের গল্প হিসেবে।

'পথে নারী বিবর্জিতা' এই শাস্ত্রনির্দেশকে অলংঘ্য মনে করায় জনমানসে দীর্ঘদিন মেয়েদের অভিযান নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হ'ত। ফলত, বালিকা বা কিশোরীর গন্ডিবদ্ধ জীবনের ছক-ভাঙ্গা অভিযান সম্ভবপর করা হ'ত স্বপ্নলোকে। বিশ শতকে বাঙালি জীবনের প্রচলিত ছবির বদল ঘটে। পুরুষেরা অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে, ফলে গৃহবন্দি মহিলাদের এবারে সংসার পরিচালনার জন্যও বহির্মুখী হতে হয়। বহির্জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা থেকে মেয়েদের অভিযান-বাসনার জন্ম হয়। আত্মরক্ষায় পরনির্ভরশীলতাকে কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজন হয় স্বাধীনতার প্রাক্কালে। ধীরে ধীরে তৈরি হয় মেয়ে গোয়েন্দারা। আপাতভাবে 'পুরুষের অধিকার ক্ষেত্র' বলে চিহ্নিত ক্রীড়াজগতেও মেয়েরা নিজেদের পরিচিতি তৈরি করে। তাই মূলত বিশ শতকের অভিযান, গোয়েন্দা, রহস্য বা খেলার গল্পে আনুপাতিক হারে মেয়েদের উপস্থিতি ছেলেদের তুলনায় নগণ্য হলেও এই গল্পে বিধৃত হয়েছে মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গ নির্মাণের সাধারণ নীতির সমান্তরাল এক নির্মাণ। মেয়েদের 'গৃহলক্ষ্মী' ইমেজ এখানে বদলে যায়, নারীদের 'ভূষণ' যে 'লজ্জা', তার প্রয়োজনীয় অংশটুকু বজায় রেখে আলংকারিক অংশ বাদ পড়ে, সমাজ-শোধনে মেয়েরা এগিয়ে আসে—বিশ শতকের অন্যধারার গল্পগুলি এভাবে বহুমাত্রিক সামাজিক লিঙ্গপরিচিতির স্মারক হয়ে ওঠে।

শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের পুনর্বিন্যাস বিষয়ে নারীবাদী সমালোচক Mitzi Myer এর উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, "…maternal pedagogies, disorder, wildness, pro-creation and multiplicity: a large cultural shift in a short space of time" । আমরা দেখেছি —

ক) শিশু-কিশোর সাহিত্যের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য নানান মত উল্লেখ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বোঝা গেছে, এটি একটি জায়মান প্রক্রিয়া এবং বিবিধ ধারণার সমাহার। পাঠক হিসেবে শিশু বা কিশোরের সংযুক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন এই সংরূপ নির্মিতির ক্ষেত্রে।

খ) দুই শতাব্দীর লেখা শিশু-কিশোর সাহিত্যে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তিকরণের বিন্যাস দ্বিবিধ।

গ) এক্ষেত্রে কারণ হিসেবে আমরা নির্দেশ করেছি পরিবর্তনশীল সমাজকে।

ঘ) মেয়েদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার চাহিদাকে শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ বা চিহ্ন হিসেবে নির্দেশ করা সম্ভবপর হয়েছে — এই বিষয়টি পুনরাবৃত্ত মোটিফ হিসেবে কাজ করেছে।

তবে এর পরেও আমাদের আলোচনার যথেষ্ট সীমিতি রয়েছে। তার একটি কারণ উপাদানের সীমিতি। 'ভূতের গল্প' বা 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প'তে মেয়েদের বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্তি এখনো চোখে পড়েনি। কার্টুন বা কমিকস্-এও মেয়েরা প্রধান ভূমিকায় আসেনি (ব্যতিক্রম — 'গাবলু আর গুণ্ডাহাতি'র মুমু চরিত্র) । মেয়েদের নবনির্মিত সামাজিক লিঙ্গরূপ অনুযায়ী শিশু-কিশোর সাহিত্য নতুন নতুন রূপে নিরন্তর নির্মিত হতে থাকলে তবেই এই ধরণের গবেষণা পূর্ণতা পাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

অভিধান ও কোষগ্রন্থ

বাংলা

- আকাদেমি বানান উপসমিতি সম্পাদিত। 'আকাদেমি বানান অভিধান'। কলকাতা, পশ্চিমবং বাংলা আকাদেমি, ২০১১।
- হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড)'। নতুন দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৪।
- শিশিরকুমার দাশ সম্পাদিত। 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী'। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০০৩।

ইংরেজি

- Cobuild, Collins. *Essential English Dictionary*, London, William Collins Sons & Co Ltd, 1988
- Mee, Arthur. Children's Encyclopedia. Great Britain
- Wilson, John, Rowan. The Mind (Life Science Library), Netherland, Time-Life International N.V, 1968

আকর গ্রন্থ

- অন্নদাশঙ্কর রায়। 'ছড়া সমগ্র'। কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৩।
- 'অপরূপা'। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৮৪ ।
- অরুণা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'সখা, সখা ও সাথী-১'। কলকাতা, কল্লোল, ২০০২।
- অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত। 'কিশোর সাহিত্য': অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০১১।
- অসিতাভ দাশ সম্পাদিত। 'সেরা মুকুল (সংকলন)'। কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, ১৯৯৯।
- 'আরাধনা'। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৮৪।
- গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কিশোর রচনাসম্ভার-২'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫।
- জয়িতা বাগচী সম্পাদিত। 'সুখলতা রাও রচনা সংগ্রহ-২'। কলকাতা, থীমা, ২০০০।
- জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত। 'বালক': গ্রন্থাকারে একত্র দে'জ সংকলন। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৭।
- ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। 'কঙ্কাবতী'।
- দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। 'ঠাকুমার ঝুলি: বাঙ্গালার রূপকথা'। পঞ্চচত্বারিংশৎ সংস্করণ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১২।

- দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি': বঙ্গোপন্যাস। চতুর্দ্দশ সংস্করণ। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি ., কলকাতা ,১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।
- দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার মিত্র, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'শিশু কিশোর সাহিত্য সংগ্রহ (১ম খণ্ড)'। কলকাতা, শিশু কিশোর আকাদেমি, ২০১৩।
- দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার মিত্র, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'শিশু কিশোর সাহিত্য সংগ্রহ (২য় খণ্ড)'। কলকাতা, শিশু কিশোর আকাদেমি, ২০১৪।
- দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার মিত্র, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'শিশু কিশোর সাহিত্য সংগ্রহ (৩য় খণ্ড)'। কলকাতা, শিশু কিশোর আকাদেমি, ২০১৫ ।
- ধীরেন্দ্রলাল ধর সম্পাদিত। 'আহরণী'। কলকাতা, শিশু সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৬।
- নলিনী দাশ। 'গোয়েন্দা গন্ডালু সমগ্র (প্রথম খন্ড)'। কলকাতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১৩।
- নবনীতা দেবসেন। 'ইচ্ছামতী'। কলকাতা, আনন্দ, ২০১০।
- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সরল দে ও এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ সম্পাদিত। 'পাঁচশ বছরের কিশোর কবিতা'। কলকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউস।
- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত। 'শতাব্দীর সেরা শিশুসাহিত্য-২ খণ্ড'। কলকাতা, পুনশ্চ।
- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শৈলেন ঘোষ, সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।'আলোর ফুলকি'। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭।
- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্র সরকার সম্পাদিত। 'বাংলার রূপকথা'। কলকাতা, পুনশ্চ, ২০১৪।
- পূর্ণশশী মুখোপাধ্যায়। 'ৎতুলো ফুড়কি ফুরু'। কলকাতা ,মাইন্ডস্কেপ, ২০০৮।
- প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। 'গ্রহের ফের'। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির।
- প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। 'গুপ্ত ঘাতক'। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির।
- প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। 'হত্যার প্রতিশোধ'। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির।
- বাণী বসু ও রোহিণী ধর্মপাল সম্পাদিত । 'রচনাসমগ্র-১': গৌরী ধর্মপাল। কলকাতা, লালমাটি, ২০১৭।
- মতি নন্দী। 'কলাবতী সমগ্র'। কলকাতা, আনন্দ, ২০১২।
- মনোজিৎ বসু। 'গল্পের মণিমেলা'। কলকাতা, আরতি এজেন্সি, ১৩৫০।
- যোগীন্দ্রনাথ সরকার। 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী'। কলকাতা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ১৯৯৩।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'লোকসাহিত্য': রবীন্দ্র রচনাবলী: দ্বিতীয়খণ্ড। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'শিশু': রবীন্দ্র রচনাবলী: দ্বিতীয়খণ্ড। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'গল্পসল্প': "রবীন্দ্র-রচনাবলী: খণ্ড ২৬। কলকাতা, বিশ্বভারতী।
- রাজেশ বসু। 'পরির দুঃখ'। কলকাতা, পারুল, ২০১০।
- লীলা মজুমদার সম্পাদিত। 'হরেকরকমবা'। কলকাতা, বসাক বুক স্টোর, ১৯৯৫।
- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। 'কত গান তো হোলো গাওয়া'। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৭৬।
- সীতা দেবী ও শান্তা দেবী। 'হিন্দুস্থানী উপকথা'। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
- সৈয়দ মুজতবা সিরাজ। 'কিশোর রহস্য সম্ভার'। কলকাতা। সূর্য পাব্লিকেশন্স, ১৯৯৯।
- সুবিমল মিশ্র সম্পাদিত। 'মধুসূদন মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-২ খণ্ড'। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১২।
- হাননান আহ্সান ও প্রণব সেন সম্পাদিত। 'খুশির খেয়া'। কলকাতা, ডেল্টা ফার্মা।
- হেমন্তবালা দেবী। 'নতুন রূপকথা'। কলকাতা, এবং মুশায়েরা, ২০১১।

সহায়ক গ্রন্থ:

ইংরেজি

- Aries, Philippe. *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life*. Robert Baldick Translated, New York, Alfred A Knopf, 1962.
- Bagchi, Jasodhara Ed. *Indian Women Myth and Reality*. Hyderabad, Sangam Books, 2008
- Chattopadhyay, Gautam Ed., *Bengal:`Early Nineteenth Century*. Calcutta, Reseaerch India Publications,1978
- Chaudhury, Sukanta Ed. *The Living City- Vol.2*, Calcutta, Oxford University Press
- Coulmas, Florian. *Identity--A very short introduction*. Oxford university press,United Kingdom,2019
- Darton, F. J Harvey. *Children's Books in England: Five Centuries of Social Life*, Cambridge, Cambridge University Press, 1982
- Dharwadker, Vinay Ed. *The Collected essays of A. K Ramanujan.*, New Delhi, Oxford University Press, 1999
- Erich, Fromm. *Introduction to the understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths*. New York, Grove Press, 1957.
- Haviland, V. Ed. *Essay in Children and Literature: Views and Reviews, London,* Bodley Head 1973

- Huck, Charlotte. *Children's Literature in Elementary School*, New York, Rinehart and Winston, 1976
- Hunt, Peter Ed. *Understanding Children's Literature*, London and New york, Routledge, 1999
- Kakar, Sudhir and Kakar, Katharina. *Portrait of a People*, Penguin, 2007
- Kakar, Sudhir, *The Inner World*, New Delhi, Oxford University Press, 2012
- Kenedy, Ellen and Mendus, Susan. *Women in Western Political Philosophy*, Palgrave Macmillan, 1987
- Lerner, Gerda. *The Creation of Feminist Consciousness*. New York, Oxford University Press, 1993
- Margery, Hourihan. *Deconstructing the Hero*, London and New York, Routledge, 2005
- Mookerjee, K. K. *Some Great Educators of the World*, Kolkata, Das Gupta and Co. Pvt. Ltd., 1972
- Mazumdar, Rinita. *A short introduction to Feminist Theory*. Kolkata, Anushtup, 2010
- Mukhopadhyay, Arpita. *Feminisms*. Hyderabad, Orient BlackSwan, 2016
- Reynolds, Kimberley. *Children's Literature: A very short Introduction*, New york, Oxford University Press, 2011
- Ridley, Matt. *The Agile Gene*, Great Britain, Harper Collins, 2012
- Ruth Nanda Anshen. *The Family: Its function and Destiny*. New York, Harper and Brothers, 1949
- Sarkar, Tanika. *Hindu Wife Hindu Nation: Community, Religion and Cultural Nationalism*, Permanent Black, 2001
- Sale, Roger. *Fairy Tales and after*. Cambridge, Harvard University Press, 1978
- Walters, Margaret. *Feminism: A very short introduction*. 2005, Oxford University Press, New York

বাংলা

- অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব': কালীপ্রসন্ন ঘোষ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
- আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত। 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)'। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬।
- আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য' ।
- আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত। 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)'। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬।
- কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ধর্ম সংস্কার ও কুসংস্কার'। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭।

- কালিদাস ভদ্র সম্পাদিত। 'প্রসঙ্গ অন্নদাশঙ্কর'। কলকাতা, রেসন্‌স, ২০০০।
- কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত 'মহাভারত'। সারানুবাদ রাজশেখর বসু। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।
- খগেন্দ্রনাথ মিত্র। 'রবীন্দ্র-শিশুসাহিত্য পরিক্রমা'। কলকাতা, লালমাটি, ২০১৬।
- খগেন্দ্রনাথ মিত্র। 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য'। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯।
- গোলাম মুরশিদ। 'নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী'। কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০১।
- গোলাম মুরশিদ। 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি'। ঢাকা, অবসর, ২০০৬।
- গৌতম নিয়োগী, 'গোয়েন্দা গণ্ডালু : স্রষ্টা ও সৃষ্টি' ।
- ড. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত। 'বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ'। কলকাতা, আকাদেমি অব ফোকলোর, পুস্তক বিপণি, ২০০৪।
- নবেন্দু সেন। 'বাংলা শিশুসাহিত্য তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ'। কলকাতা, পুথিপত্র, ২০০০।
- নারায়ণ সান্যাল। 'কিশোরী সমগ্র'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪।
- নির্মাল্য কুমার ঘোষ। 'বাংলা শিশু সাহিত্য পাঠের ভূমিকা'। কলকাতা, ছোঁয়া, ২০২০।
- পল্লব সেনগুপ্ত। 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ'। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০২।
- প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 'বাংলায় নারী-জাগরণ'। কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৩৫২।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ঈশ্বরগুচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতা সংগ্রহ: প্রথম খণ্ড'। কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৮৮৫।
- বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'ছোটদের রবীন্দ্রনাথ'। কলকাতা, সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।
- বিনয় ঘোষ। 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'। কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান।
- বুদ্ধদেব বসু। 'সাহিত্যচর্চা'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫।
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা-২'। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।
- ভারতী রায় সংকলিত ও সম্পাদিত । 'বামাবোধিনী পত্রিকা'। কলকাতা, আনন্দ, ২০০২।
- মনুসংহিতা। ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।
- মল্লিকা সেনগুপ্ত। 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ'। কলকাতা, আনন্দ, ২০১২।
- মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় ও অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'নহি সামান্যা নারী'। কলকাতা,সেতু, ২০১৮।

- মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রনাথ: শিশুসাহিত্য'। কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০০।
- মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত। 'জেন্ডার বিশ্বকোষ'। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশন, ২০০৬।
- যশোধরা বাগচী। নারীর অধিকার ও নারীর সমস্যা। কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১২।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'চিঠিপত্র': নবম খন্ড। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সাহিত্যের পথে': 'রবীন্দ্র-রচনাবলী: দ্বাদশ খণ্ড'। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।
- লুই হেনরী মর্গ্যান। 'এন্সিয়েন্ট সোসাইটি (প্রাচীন সমাজ, প্রথম পর্ব)'। সম্পাদনা অসীম চট্টোপাধ্যায়। ভাষান্তর- অসিত চৌধুরী, অসীম চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা, দীপায়ন, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।
- শঙ্খ ঘোষ।'দেখার দৃষ্টি'। কলকাতা, তালপাতা, ২০১৪।
- শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব: সমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা সাহিত্য'। কলকাতা, প্যাপিরাস।
- শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আবার শিশুশিক্ষা'। কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০০৫।
- শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোট মেয়েরা'। কলকাতা, গাংচিল, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।
- শিবনাথ শাস্ত্রী। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা.লি, ২০০৭।
- শেফালি মৈত্র। 'নৈতিকতা ও নারীবাদ: দার্শনিক প্রেক্ষিতে নানান মাত্রা'। কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা.লি, ২০০৩।
- শ্রীহরি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণী'। কলিকাতা, যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি, ১৯৫৪।
- সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী। 'অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা'। কলকাতা, স্ত্রী, ১৯৯৫।
- সুকুমারী ভট্টাচার্য। 'প্রবন্ধ সংগ্রহ-১'। কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৪।
- সুকুমারী ভট্টাচার্য। 'এয়োতি এবং'। কলকাতা, ক্যাম্প, ২০০৪।
- সুকুমারী ভট্টাচার্য। 'বিবাহ প্রসঙ্গে'। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা, ক্যাম্প, ২০১৫।
- সুতপা ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত। 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য: উনিশ শতক'। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৪।
- সোহিনী সিন্‌হা। 'চাকুরিজীবী বাঙালিনী: প্রয়োজন ও পরম্পরা, উনিশ থেকে বিশশতক'। কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫।
- স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত। 'উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি'। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৫।
- স্বপন বসু সম্পাদিত। 'অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ: ১ম খণ্ড'। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮।

- স্বপন বসু ও গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত। 'পুরোনো বাংলা বই'। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৬।
- স্বপন বসু সম্পাদিত। 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা'। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।
- স্বপন বসু ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত। 'দুই শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র'। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৫।
- হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রথম খণ্ড'। কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ২০১০।
- হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায় সম্পাদিত। 'সাহিত্য-প্রবন্ধ প্রবন্ধ-সাহিত্য'। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

- অশোক রায়চৌধুরী। "প্রসঙ্গ: শিশুসাহিত্য"। 'লালপরি নীলপরি, বর্ষ-১৮, সংখ্যা ১৬, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৮
- আবাহন দত্ত। "বিস্মৃত এক সরস্বতী"। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৭ অগস্ট, ২০১৯
- নবনীতা দেবসেন। "রূপকথা না কুরূপকথা"। 'রোববার প্রতিদিন', ১৯ জুলাই, ২০১৪, পৃ. ১৫-১৭
- প্রদীপ বসু। "পরিবারে ধর্ম"। 'অনুষ্টুপ', সপ্তত্রিংশ বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। "খুকুমণির ছড়ার ভূমিকা"। 'পাতাবাহার' (বাংলা শিশুসাহিত্য ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংখ্যা), তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ২০১৬, পৃ.৯৬
- লীলা মজুমদার। "কেন ছোটদের জন্য লিখি"। 'কোরক' (বইমেলা) ২০০৭, পৃ. ২৩০
- সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী। "উনিশ শতকে মেয়েদের লেখা বাংলা বই"। বলাকা, বর্ষ-২০, সংখ্যা-৩০, ডিসেম্বর, ২০১১, পৃ. ২৩৬-২৪০

বৈদ্যুতিন উৎস

- http://plato.stanford.edu
- http://tuvalu.santafe.edu/~jdf/papers/adventure4.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/Adventure_fiction
- https://en.wikipedia.org/wiki/Children
- https://en.wikipedia.org/wiki/Sibling_rivalry
- https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/the-origins-of-childrens
- https://www.britannica.com/art/childrens-literature
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956653/